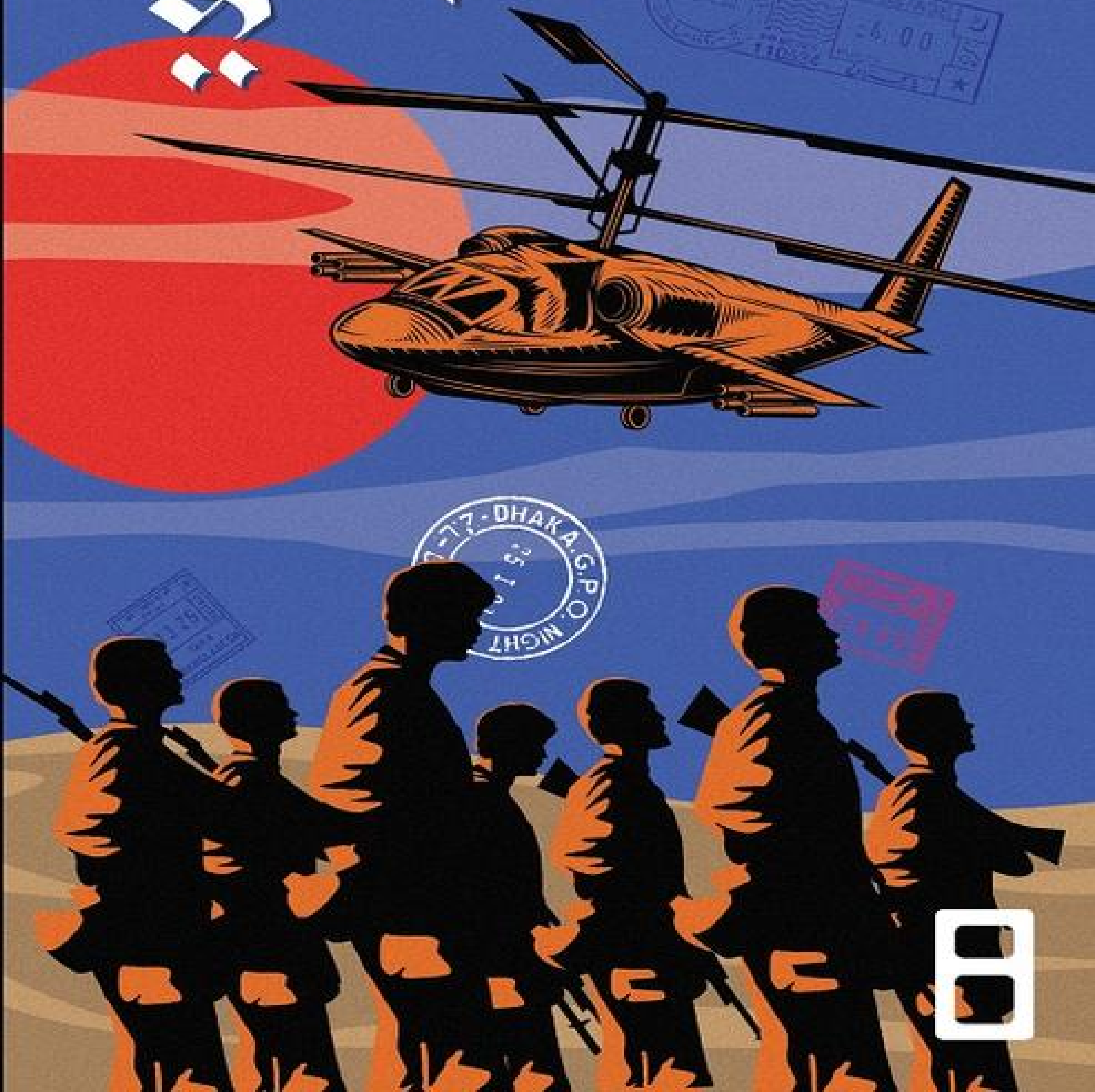
অভীক দত্ত



ব্লু ফ্লাওয়ার ৪

অভীক দত্ত

আদরের নৌকা

ব্লু ফ্লাওয়ার ৪

প্রচ্ছদ- সুবিনয় দাস

https ://iwrite.app

যারা জীর্ণ জাতির বুকে জাগালো আশা
মৌন মলিনমুখে ফোটালো ভাষা...

১

বেনারস।

ভিড় গিজগিজ করছে দয়াসাগরবাবার নতুন আশ্রমে। ঝাঁ চকচকে আশ্রম।

দয়াসাগরবাবা এসেছেন শোনামাত্র তাঁকে ঘিরে উত্তেজনা চরমে পৌঁছল। বাবার প্রসন্ন মুখ। যে ভক্তরা বাবার কাছে পৌঁছতে পারছে, পা ধরে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। বাবা কাউকে ফুল ছুঁড়ছেন, কারো মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। ভিড় ক্রমশ বাড়ছে।

হঠাৎ এক হতদরিদ্র মহিলা একটা ছোট ছেলেকে বাবার কোলে দিয়ে কেঁদে পড়ল, "বাবা। বাঁচান"।

দয়াসাগর ভরাট গলায় বললেন, "কী সমস্যা তোমার কন্যা?"

মহিলা বলল, "আমার বর মাতাল। বাচ্চার খাবারের জন্য টাকা না দিয়ে সব টাকা দিয়ে মদ খেয়ে ফেরে। আমার ছেলে আমার কাছে থাকলে বেঁচে থাকবে না। ওকে আপনি নিয়ে যান বাবা। আপনার আশ্রমে থাকলে ও মানুষ হবে"।

দয়াসাগর স্মিত হাসলেন। বললেন, "তথাস্তু। আজ থেকে ওর নাম বলরাম। ও আমার কাছে থাকবে"।

মহিলাটি আনন্দে আত্মহারা হয়ে বাবার নামে জয়ধ্বনি দিতে শুরু করল।

দয়াসাগর তার এক শিষ্যাকে ডেকে তার হাতে শিশুটিকে অর্পণ করে বললেন, "আজ থেকে বলরাম আমাদের সঙ্গে থাকবে"।

সবাই জয়ধ্বনি দিতে লাগল। দয়াসাগর সবাইকে আশীর্বাদ দিতে শুরু করলেন।

২

মেয়েটা হাঁটছে ঢাকার শাঁখারিবাজার এলাকা দিয়ে। গলি, বাজারের মধ্যে দিয়ে মেয়েটা হেঁটে চলেছে। ছোট একটা গুমটি পানের দোকানের সামনে এসে মেয়েটা দাঁড়াল। বোরখা সরিয়ে বলল, "রমজান চাচা আছে?"

দোকানদার পান সাজাতে সাজাতে বলল, "চার নম্বর ঘর"।

মেয়েটা আবার হাঁটতে শুরু করল। মন্দিরের পাশের গলি দিয়ে ঢুকে পড়ল। দোতলা একটা বাড়ির নাম "শকুন্তলা"।

মেয়েটা দরজায় গিয়ে কলিং বেল টিপল। এক হিন্দু মহিলা দরজা খুলল। মেয়েটা বলল, "চার নাম্বার ঘর"।

দরজা ছেড়ে দাঁড়াল মহিলা। মেয়েটা ঘরের ভিতরে ঢুকতে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। মেয়েটা বলল, "চার নম্বর ঘর কোথায়?"

মহিলা খাটের উপর বসে পড়ে বলল, "ভিতরে যাও। রান্নাঘরের বাঁ দিকের ঘরটা"।

মেয়েটা পর্দা সরিয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল। রান্না ঘরে প্রেশার কুকারে একটা সিটি দিয়ে উঠল। মেয়েটা দেখল রান্নাঘরের পাশের একটা ঘরে দরজা খোলা। সে ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, "এটাই চার নাম্বার ঘর?"

ঘরের ভেতর থেকে পুরুষ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "এসো। চিনে এসেছো তাহলে? ভেতরে এসে দরজা বন্ধ করে বসো"।

মেয়েটা দরজা বন্ধ করে ঘরের ভিতর ভাল করে তাকাল। একটা ছোট ঘর। একপাশে চেয়ার টেবিল। টেবিলের ওপর একটা কম্পিউটর। চেয়ার টেবিল লাগোয়া একটা সিঙ্গল খাট। মেয়েটা খাটের উপর বসল। পুরুষ কণ্ঠস্বরের অধিকারী যুবক চশমা পরিহিত। রিভলভিং চেয়ারে বসে কম্পিউটারের মনিটরে মন দিয়ে কিছু দেখছে। মিনিট পাঁচেক পর বলল, "আমি আতর। তুমি আমার নাম শুনেছো?"

মেয়েটা মাথা নাড়ল। আতর বলল, "তোমার নাম সুমাইমা। তুমি টাঙ্গাইলে থাকো। তাই তো?"

মেয়েটা বলল, "জি"।

আতর বলল, "সুমাইমা, তুমি কি জানো আমরা এখন কী রকম সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি?"

সুমাইমা অস্বস্তির সঙ্গে মাথা নাড়ল, “জি জানি”।
আতর বলল, “আশা করি তুমি এটাও জানো, এখন যদি আমরা সর্বস্ব দিয়ে এদের আটকাতে না পারি, তবে আমাদের দেশটাকে খুব শিগগিরি ইন্ডিয়া গ্রাস করে নেবে?”
সুমাইমা বলল, “আমি এসব জানি। এসব আমাকে বলার কোন দরকার নেই। আমাকে কাজ দিন। কী করতে হবে বলুন”।
আতর চেয়ার ঘুরিয়ে সুমাইমার মুখোমুখি হল, বলল, “কাজ আসবে। তোমার কাজের মত কাজ আসবে। আপাতত তোমার একটাই কাজ। ওদের বিশ্বাসভাজন হওয়া। ওদের লোকেদের সঙ্গে মিশে যাওয়া। পারবে না?”
সুমাইমা মাথা নাড়ল, “জি পারব”।
আতর বলল, “ফ্রেশ হয়ে নাও”।
সুমাইমা বাথরুমে ঢুকে গেল। আতর ফোন বের করে কিছু একটা ভেবে একটা নাম্বারে ফোন করল। ও প্রান্ত ফোন রিসিভ করতেই আতর বলল, “ঘর ফাঁকা না থাকলে ফোন করে লাভ নেই”।
ও প্রান্ত থেকে ভারি কণ্ঠস্বর ভেসে এল, “শুনছি”।
আতর বলল, “সুমাইমা এসেছে। ওকে টায়ার্ড লাগছে। কী করব?”
“নাটকের দলটায় জুড়ে দে। ওই ছেলেটা... শুভ... ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে বল। প্রেম পিরিত না। বন্ধুত্ব”।
“জি ভাই”।
সুমাইমা কিছুক্ষণ পরে ঘরে ঢুকে বলল, “খেয়ে নিয়েছি”।
আতর বলল, “ঠিক আছে। এবার এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেখবে বাইরে একটা রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে। ওটায় উঠে যাবে। ও তোমাকে একটা হোস্টেলে নিয়ে যাবে। লেডিস হোস্টেল। আজ রাতটা ওখানেই থাকবে। কাল তোমাকে ওদের জায়গাটা দেখিয়ে দেবো”।
সুমাইমা বলল, “রেস্ট করতে হবে? কেন? আমায় কাজ দিন”।
আতর বলল, “তাড়া নেই তো। ঠিক সময়ে ঠিক কাজ তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে”।
সুমাইমা বলল, “আমি তৈরি। যে কোন কাজের জন্য। যে কোন রকম মানে সব রকম”। আতর একটু বিস্মিত হয়ে বলল, “তুমি পারবে?”
সুমাইমার চোখ দুটো জ্বলে উঠল, “কাজ দিয়ে দেখুন”।
আতর বলল, “তুমি হোস্টেলে যাও। ভেবো না। তোমার জন্য উপযুক্ত কাজই থাকবে”।
সুমাইমা বেরিয়ে যেতেই আতর আবার আগের নাম্বারে ফোন করল। অপর প্রান্ত বিরক্ত গলায় বলল, “আবার কী হল?”
আতর বলল, “ও যে কোন রকমের কাজ করতে পারবে বলছে। মানে সব”।
অপরপ্রান্ত বলল, “ঠিক আছে। এখনই এত আনন্দ করার কিছু নেই। এখন আপাতত গাছ পোঁতার কাজ চলছে। সেটা চলতে দে। পরে দেখা যাবে”।
আতর বলল, “ঠিক আছে”।
ফোন কেটে গেল।

৩

রাজা মার্কেট।
রাওয়ালপিণ্ডি, পাকিস্তান। রাত এগারোটা।
এখনো ভিড় আছে। তবে কমের দিকে। বড় বড় স্টকিস্টরা এখানে জিনিস কিনতে আসে।

ইমান শেখের দোকান। দোকান বন্ধ করা যাচ্ছে না এত ভিড়। ইমান শেখ ঠিক করেছে সাড়ে এগারোটায় সবাইকে বের করে দোকান বন্ধ করে দেবে। মাঝে মাঝেই হুমকি দিচ্ছে।

চাহিদা হবে নাই বা কেন? বিরাট কাপড়ের দোকান ইমান শেখের। রাতে পাঁচ ছ ঘণ্টা ঘুমোতে পারে। ভোর থেকেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা ভিড় করতে শুরু করে। এমনিতেই ভিড় থাকে, তার উপর সামনে ঈদ। দেশের সব থেকে বড় উৎসব। ব্যবসায়ীরা কমদামে জিনিস কিনতে আর যাবেই বা কোথায়? ইমান শেখ ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ী।

হিসেব মেলাতে বসেছে ইমানের ভাই রজ্জাক। জাবদা খাতায় তার হিসেবের পালা চলছে। ইমান দোকানের ভিড় দেখে চিৎকার করল, "আমি আর বেশিক্ষণ দোকান খোলা রাখব না। এক কাজ কর, কাল ভোরে চলে এসো। এখন আর কিছু বিক্রি করা যাবে না"।

কারো কোন হেলদোল নেই। ইমান ঠিক করল যারা দোকানে আছে তারা থাকুক, আর কাউকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। সে বাইরের কোলাপসিবল গেট বন্ধ করতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। একজন সাড়ে ছ'ফুট লম্বা লোক ঠিক গেটের বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে। ইমানের মুখ হাঁ হয়ে গেল। সে বিস্মিত গলায় বলল, "জামিল ভাইজান?"

জামিল অত্যন্ত সুপুরুষ। ইমানকে জড়িয়ে ধরে বলল, "চিনতে পেরেছোঁ তাহলে?"

ইমান বলল, "চিনতে পারব না মানে? আপনাকে কে চিনতে পারবে না? আপনি এত দিন কোথায় ছিলেন ভাইজান?"

জামিল বলল, "এখানে কথা বলা যাবে না। তোমার খাস কামরায় চল"।

ইমান বলল, "আসুন আসুন"।

দোকানের পাশের একটা ছোট গলি দিয়ে ইমান জামিলকে দোকানের পিছনের একটা ছোট ঘরে নিয়ে এল। এসি চালিয়ে দিয়ে বলল, "বসুন ভাইজান"।

জামিল বসল। বলল, "আমি সৌদি থেকে ফিরলাম"।

ইমান বলল, "মাশাল্লাহ ভাইজান। আজকেই ফিরলেন?"

জামিল বলল, "হ্যাঁ"।

ইমান বলল, "আমি কী করতে পারি আপনার জন্য?"

জামিল বলল, "অনন্তনাগে আমাদের এক যোদ্ধা নিউজ চ্যানেল শুরু করেছে। ওর জন্য সামান পৌঁছে দিতে হবে বর্ডার পেরিয়ে অনন্তনাগে। সম্ভব?"

ইমান বলল, "বেশক। কবে পৌঁছতে হবে?"

জামিল বলল, "কাল দুপুরের মধ্যে"।

ইমান বলল, "পরশু রাত হলে অসুবিধে হবে ভাইজান? ইন্ডিয়ান আর্মির নজর এড়িয়ে পৌঁছতে হবে। বুঝতেই পারছেন কী সমস্যা হতে পারে"।

জামিল বলল, "মৌলানা সাহেব বলেছেন আমাকে কালকের মধ্যে পৌছতে হবে। এবার তুমি বুঝতেই পারছো ওর কাছে পৌঁছনো কতটা কঠিন। উনি অনেক আশা করে আমাকে কাজটা দিয়েছেন। তুমি ছাড়া আর কারো নাম তো মনে পড়ে নি আমার"।

ইমান খুশি হল, "কোন অসুবিধে নেই ভাইজান। আমি ব্যবস্থা করছি। সামান কোথায় আছে?"

জামিল বলল, "আমার গাড়িতে আছে"।

ইমান বলল, "ঠিক আছে। আমি আজকেই ব্যবস্থা করছি"।

জামিল বলল, "আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি না তুমি কাজটা কীভাবে করবে। তবে একটা কথা মনে রেখো, এই সামান যেন কোন ইন্ডিয়ান আর্মির হাতে না পড়ে। বাকিটা তুমি কীভাবে করবে, নিজে ঠিক কর"।

ইমান বলল, "ধরা পড়বে না জনাব। আমাকে সামান দিন"।
জামিল বলল, "এসো"।
জামিল ঘরটা উঠল। ইমান জামিলের পিছন পিছন হাঁটতে শুরু করল। গলি থেকে বড় রাস্তায় এসে জামিল তার গাড়ির কাছে এসে বলল, "গাড়িতে ওঠো"।
ইমান অবাক হয়ে বলল, "জি? গাড়িতে উঠতে হবে?"
জামিল বলল, "হ্যাঁ। ওঠো"।
ইমান গাড়িতে উঠল। জামিল ড্রাইভারের সিটে বসে গাড়ি স্টার্ট দিল।
ইমান বলল, "সামান গাড়িতে নেই জনাব?"
জামিল বলল, "এখানে দেওয়া যাবে না"।
ইমান শ্বাস ছাড়ল। কিছু বলল না।
মিনিট পনেরো গাড়ি চালিয়ে ইসলামাবাদ হাইওয়েতে গাড়ি দাঁড় করাল জামিল। পকেট থেকে রিভলভার বের করে ইমানের দিকে তাক করে বলল, "মৌলানা সাহেবের খাস নির্দেশ আছে তোকে যেন আমি নিজের হাতে মারি। গদ্দার! লজ্জা লাগে না তুই নিজের মানুষদের সঙ্গে গদ্দারি করিস?"
ইমান গাড়ির দরজা খুলতে গেল। পারল না। জামিল ইমানের মাথায় গুলি করল। রক্ত ছিটকে এসে জামিলের মুখে এসে লাগল। তাতে জামিল ভ্রুক্ষেপ করল না। গাড়ির দরজা খুলে রাস্তার পাশের মাঠে ইমানের বডিটা টান মেরে ফেলে দিয়ে গাড়িতে বসে ফোন বের করল।
ইমানের লাশের ছবি তুলে গাড়ি স্টার্ট করল জামিল।

৪

তুষার বাড়ি ফিরেছেন রাত বারোটা নাগাদ। ইরাবতী ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তুষারের কাছে চাবি থাকে। বাড়ির ভেতর ঢুকে তাঁর ব্ল্যাক কফি খেতে ইচ্ছে হল। তুষার ইলেকট্রিক কেটলে গরম জল বসিয়ে টিভির সামনে বসলেন। মাথা ধরে যাচ্ছে। সব জায়গা উপদ্রুত হয়ে যাচ্ছে যেন। এত কিছু মাথায় নেওয়া যাচ্ছে না।
তাঁর ফোন বেজে উঠল, স্ক্রিণে "প্রাইভেট নাম্বার" লেখা দেখে সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা রিসিভ করে বললেন, "হ্যাঁ। বলছি"।
"স্যার, বাজে খবর আছে", সায়কের গলা ভেসে এল।
তুষার বললেন, "কী হল আবার?"
সায়ক বলল, "ইমান শেখ খুন হয়েছে কিছুক্ষণ আগে"।
তুষার চিন্তিত গলায় বললেন, "জেনে গেল কী করে?"
সায়ক বলল, "জানি না স্যার। খোঁজ নিচ্ছি"।
তুষার বললেন, "এবার কী হবে?"
সায়ক বলল, "নো আইডিয়া স্যার। ইমান শেখ না থাকা মানে একটা বড় লিঙ্ক চলে যাওয়া"।
তুষার বললেন, "তুমি ইসলামাবাদেই আছো এখন?"
সায়ক বলল, "হ্যাঁ"।
তুষার বললেন, "ওরা তারমানে তোমাকেও খুঁজতে শুরু করবে। ইমানের সঙ্গে তোমার লিংক হয় ওরা বের করে ফেলেছে, নয়ত বের করে ফেলবে। প্ল্যান বল"।
সায়ক বলল, "আস্তানা ছেড়ে দিয়েছি। আজ রাতে বাসস্ট্যান্ডে শোবো"। তুষার বললেন, "সকালে কোথায় যাবে"?
সায়ক বলল, "হাতে দুটো অপশন আছে স্যার। মুজফফরাবাদ আর কোয়েটা"।
তুষার বললেন, "মুজফফরাবাদে তোমার প্রবল ঝুঁকি আছে। ওরা তোমাকে চিনে নেবে। কোন দরকার নেই। ওখানে যেও না। কোয়েটা চলে যাও"।

সায়ক বলল, “যেখানে ঝুঁকি আছে, সেখানে গেলেই সুবিধা স্যার। আরেকটা ভাল আইডিয়া আছে স্যার। আমি এখানেই থাকবো”।
তুষার বললেন, “কেন থাকতে চাইছো ওখানে”?
সায়ক বলল, “বেশ কিছু লিড আছে স্যার। এখন আমি এখান থেকে দূরে গেলে সেগুলো মিস হয়ে যাবে। পাকিস্তান আর্মির বেশ কয়েকজন উচ্চস্তরের অফিসার আবার নড়চড় শুরু করেছে। নেতারাও ব্যস্ত”।
তুষার চিন্তিত গলায় বললেন, “বুঝেছি”।
সায়ক বলল, “জানি স্যার। চিন্তা করবেন না। আমি দেখছি কী করা যায়”।
তুষার বললেন, “চিন্তাটা অন্য কারণে বড়াল। তুমি ওখানে একবারে একা হয়ে যাচ্ছো। বীরেনকে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে”।
সায়ক বলল, “ওর ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং হয়ে গেছে?”
তুষার বললেন, “চলছে। শেষের দিকে”।
সায়ক বলল, “পাঠিয়ে দিন তাহলে”।
তুষার বললেন, “ঠিক আছে। তুমি আছো, মনে হয় না বীরেনের কোন অসুবিধে হবে”।
সায়ক বলল, “হবে না। পাঠিয়ে দিন। আমি দেখে নেব”।
ফোন রেখে তুষার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে ফোনে একটা মেসেজ লিখে রাখলেন, “বি। কলকাতা- ঢাকা- ইসলামাবাদ”।
#
উত্তরা, ঢাকা।
সকাল ৯টা।
“বীরেন”।
বীরেন চুপ করে বসেছিল। তার সামনে বসে আছেন তারেক হুসেন। বীরেন যেদিন ঢাকায় এসেছিল সেদিন তারেক হুসেন তার উত্তরার ফ্ল্যাটে লুঙ্গি পরে বসে বিড়ি খাচ্ছিলেন। দরজা খুলেছিলেন তার স্ত্রী সাদিয়া। বীরেন এখানে প্রায় পনেরো দিন ধরে আছে। নির্দেশ ছিল যতদিন কোন ফোন না আসবে তাকে এখানেই থাকতে হবে।
এই ফ্ল্যাটে তাকে একটা ঘর দেওয়া হয়েছে। সারাদিন টিভি চলে। তারেকের দুই ছেলে রুবায়েত আর শুভ। একজনের বয়স নয়, আরেকজন পাঁচ। দুজনেই চরম বিচ্ছু। কিন্তু তাকে ভারি পছন্দ করে। সারাক্ষণ চাচু চাচু করে কানের পোকা নাড়িয়ে দিচ্ছে। সাদিয়াভাবির রান্নার হাত চমৎকার। কিন্তু তাও বীরেনের ভাল লাগে না গৃহবন্ধী হয়ে থাকতে।
ব্যাপারটা সামান্য পাল্টাল আজকে। ঘুম থেকে উঠতে দেখল তারেক তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে তাকে ডাকছেন।
তারেকের ডাকে সাড়া দিল সে। বলল “হ্যাঁ, বলুন”।
তারেক বললেন “তোমাকে কাল বাদ দিয়ে পরশু সৌদি পাঠানো হচ্ছে। পাসপোর্টের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সৌদিতে কামাল থাকবে। ও তোমাকে ইসলামাবাদ নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে। বুঝেছো?”
তারেক এতদিন তার সঙ্গে ঢাকাইয়া বাঙাল ভাষায় কথা বলতেন। এই কথাগুলো একেবারে সুন্দর শান্তিপুরী বাংলায় বললেন। বীরেন ঘাবড়াল খানিকটা। বলল “আপনি তো এরকম করে কথা বলতেন না তারেক ভাই”।
তারেক হেসে বললেন “আমি অনেক ভাষাতে সব রকম ভাবেই কথা বলতে পারি। তুমি কি আমাকে বাংলাদেশী ভেবেছিলে? তোমার বাবা যেমন দিনের পর দিন ভারতে ছিলেন একজন পাকিস্তানী হয়েও, আমিও তেমনি একজন ভারতীয় হয়ে শুরু থেকে বাংলাদেশে আছি। ভেবেছিলাম তুষার স্যার আমার

সম্পর্কে তোমায় সামান্য হলেও ইন্ট্রো দেবেন। দেন নি জেনে খারাপ লাগল। উনি আমাকে আর ভালবাসেন না বুঝলে? সব ভালোবাসা ওই ব্যাটা সায়ককে বাসেন"।

দুঃখিত মুখে মাথা নাড়লেন তারেক।

বীরেন মজা পেল। বলল "সায়ককে বাসেন, আপনাকে বাসেন না কী করে বুঝলেন?"

তারেক বললেন "ও আমি বুঝি। খবরই নেন না সাহেব। তবে কী জানো তো, পাকিস্তানে কাজ করাও কঠিন। বাংলাদেশ তো বন্ধুরাষ্ট্র। কেস খেলে আমরা এখান থেকেও ম্যানেজ করে নিতে পারি। ও দেশে খেলে তো আর দেখতে হবে না। সাহেবকে বলেছি সায়কের কাছে তুমি পৌঁছে গেলে অন্তত আমায় যেন খবর দেওয়া হয়। নইলে ভারি চিন্তায় থাকব"।

বীরেন ইতস্তত করে বলল "আচ্ছা ভাবি কি ইন্ডিয়ার?"

তারেক বললেন "না, মীরপুরের। এখানকার। উনি কিছুই জানেন না। জানবেনও না। তোমার মায়ের মতই। অবশ্য আমি তো আর ওকে ঠকাবো না। পুরোদস্তুর সংসার করে যাবো। ছেলে দুটো দেখেছো না? বিচ্ছুর একশেষ। বাংলাদেশ এমনিতে খুবই ভাল দেশ, বন্ধু রাষ্ট্র, যতদিন এই সরকার আছে আমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। সমস্যা হল কিছু প্রান্তিক জায়গা আছে, যেখানে একশ্রেণীর মৌলবাদী সংগঠন মাথাচাড়া দিচ্ছে। এরা শুধু ভারত বিরোধী কাজ করছে বললে ভুল বলা হবে, বাংলাদেশের মধ্যে সমস্যা তৈরীতেও এদের হাত আছে। এই দেশটা আবেগী মানুষের দেশ। সিংহ হৃদয় মানুষের দেশ। ভুলে গেলে চলবে না, একটা গোটা রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছিল ধর্ম নয়, ভাষার ভিত্তিতে। সেই জায়গাটা থেকে দেশটা এগোচ্ছে না পিছোচ্ছে সেটা দেখা আমাদের কর্তব্য। বাংলাদেশকে আমি পরের দেশ মনে করি না বীরেন। এখানে দারিদ্র আছে, কিন্তু এ দেশের মত আন্তরিকতা কোথাও পাওয়া যাবে না"।

বীরেন বলল "আচ্ছা আমি একটু বেরোতে পারি না? সারাদিন ঘরে বসে বসে অস্বস্তি লাগে খুব"।

তারেক জোরে জোরে মাথা নাড়লেন "না। এ দেশে পাকিস্তানি এজেন্ট গিজগিজ করছে। কোন ভাবেই তোমাকে বেরনোর কথা আমি বলতে পারব না। সরি"।

বীরেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল।

৫

মাঝরাত।

একজন মানুষ হেঁটে চলেছেন কলকাতার প্রিন্স আনোয়ার শা রোড ধরে ।

বয়স সত্তর পয়ষট্টি থেকে সত্তরের মধ্যে। পরনে কালো স্যুট। সাদা কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা। একটু ব্যাকডেটেড ফ্যাশন ভদ্রলোকের।

তবে হাঁটার ভঙ্গি অভিজাত।

হাঁটার গতি খুব বেশি নয়। ধীরই বলা চলে।

ভদ্রলোক রাস্তার ধার দিয়ে হাঁটছেন। কোন দিকে দৃষ্টি নেই তার। মাথা নিচু, পকেটে হাত।

মানুষটি হেঁটে চলেছেন।

রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। রাত বলে ট্রাফিক সিগনাল মানার ঝামেলা নেই। গাড়িগুলোর গতিও তাই কখনো কখনো লাগামছাড়া হয়ে যাচ্ছে। বেশিরভাগই বড়লোকের বখাটে ছেলে, কোন নাইট ক্লাব থেকে বেরিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে।

এ ভদ্রলোকের কিন্তু সেদিকে নজর নেই। তিনি চুপচাপ হেঁটে চলেছেন।

সাউথ সিটির সামনের রাস্তাটায় একটা পুলিশের গাড়ির নজরে পড়লেন তিনি।

টহলদারিতে বেরিয়েছিল গাড়িটি।

ভদ্রলোকের সামনে গাড়িটি দাঁড়াল। একজন কনস্টেবল জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন "ট্যাক্সি পাচ্ছেন না?"

ভদ্রলোক কনস্টেবলের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললেন “নেহী চাহিয়ে। এমনিই ওয়াক করছি”।
কনস্টেবলটি গাড়ির ভেতরে তাকিয়ে বাকিদের বললেন “বোঝো কান্ড। উনি নাকি ওয়াক করছেন। রাত দেড়টার সময় উনি ওয়াক করছেন নাকি!”
গাড়ির ভিতরে একজন উচ্চপদস্থ অফিসার বসে ছিলেন। তার নির্দেশ এল আই কার্ড দেখার। কনস্টেবলটি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন “আই কার্ড দিন”।
ভদ্রলোক শান্ত গলায় বললেন “নেহী হ্যায়”।
কন্সটেবল গাড়ির ভিতর তাকিয়ে বললেন “নেই বলছে স্যার”।
গাড়ির ভেতরের অফিসার বললেন “ছেড়ে দাও, কোন উচ্চমানের পাগল হবে”।
কনস্টেবলটি ভদ্রলোককে বললেন “ঠিক আছে, যান। সাবধানে চলাফেরা করুন। রাতের বেলা অনেক ক্রিমিনাল ঘুরে বেড়ায়”।
ভদ্রলোক কনস্টেবলের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন “শুক্রিয়া”।
ভদ্রলোক আবার হাঁটতে শুরু করলেন।
একইভাবে। তার চোখ কোন দিকে যাচ্ছে না।
মিনিট পনেরো হাঁটার পর ভদ্রলোক দেখলেন রাস্তার বা দিকে একটা অডি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।
তাকে দেখামাত্র গাড়িটার দরজা খুলে গেল।
একজন সুন্দরী মহিলা গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে দাঁড়ালেন।
ভদ্রলোক গাড়িতে উঠে বসতে ভদ্রমহিলা গাড়ির দরজা বন্ধ করে তার পাশে বসলেন। গাড়ি চলতে শুরু করল।
ভদ্রলোক বললেন “পাপা কেমন আছে তবসসুম?”
তবসসুম ক্লান্ত গলায় বললেন “ভাল না রফিক চাচা। শরীর খুব খারাপ যাচ্ছে ক’দিন ধরে”।
রফিক চোখ বন্ধ করলেন। বললেন “তুমি আমাকে চাচা বলবে না। অনেকবার বলেছি তোমায়। রাতের কলকাতা শহরে হাঁটার মজাই আলাদা। তোমার পাপা আর আমি কত হাঁটতাম জানো?”
তবসসুম হাসলেন “সেসব গল্প অনেক শুনেছি। তবে আপনার এভাবে হাঁটা রিস্কি হতে পারে”।
রফিক বললেন “কত রিস্ক কাটিয়েছি জীবনে। দেশের জন্য সার্ভ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কী হবে আর?”
তবসসুম বললেন “তবু। আপনার কিমত ক’জন জানে বলুন?”
রফিক হেসে গম্ভীর হয়ে গেলেন।
গাড়ি বেশ ভাল গতিতেই চলছিল। কিছুক্ষণ পর নিউ আলিপুরের এক অ্যাপার্টমেন্টের তলায় গাড়ি দাঁড়াল।
তবসসুম গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে বললেন “আসুন... রফিক”।
রফিক নামলেন। তববসুম বললেন “আসুন”।
তবসসুমকে দেখে বিল্ডিং এর সিকিউরিটি স্যালুট করল।
তবসসুম এগিয়ে গিয়ে লিফটের বোতাম টিপলেন। লিফট খুলে যেতে তবসসুম রফিকের দিকে তাকিয়ে সসম্ভ্রমে বললেন “আসুন”।
লিফট দাঁড়াল বিল্ডিং এর আট তলায়। তবসসুম ফ্ল্যাটের কলিং বেল টিপতেই একজন বোরখা পরা মহিলা দরজা খুলল। তবসসুম বললেন “পাপা শুয়ে পড়েছে?”
মহিলা মাথা নেড়ে না বলল।
রফিক কোন দিকে না তাকিয়ে জুতো খুলে ফ্ল্যাটের একটা ঘরে প্রবেশ করলেন।

সাদা ধবধবে খাটে একজন বয়স্ক মানুষ শুয়ে আছেন চোখ খুলে। ষাট পেরিয়েছে মানুষটির। গায়ের রং অত্যধিক ফর্সা। অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন এককালে দেখে বোঝা যায়।
রফিককে দেখামাত্র তার চোখ উজ্জ্বল হল "এত কিছু করে এলে?"
রফিক ভদ্রলোকের খাটের পাশের চেয়ারে বসে ভদ্রলোকের হাত ধরে বললেন "তোমার এই অবস্থা আর আমি না এসে পারি? আসতে আমাকে হতই। রাস্তা দিয়ে একটু হাঁটাও হল। তাড়াতাড়ি সুস্থ হও আনোয়ার"।
আনোয়ার মাথা নেড়ে বললেন "আমি মনে হয় আর সুস্থ হব না। আমি বুঝতে পারি আমার দিন ফুরিয়েছে। তুমি যে লাহোর থেকে এত দূর আসতে পারবে আমি ভাবতেও পারি নি রফিক"।
রফিক কয়েক সেকেন্ড আনোয়ারের দিকে তাকিয়ে চোখ ছোট ছোট করে বললেন "পাসপোর্টটা দাও। আমার বেশি সময় নেই। আজ রাতেই বাংলাদেশ বর্ডার পেরোতে হবে আমাকে"।
আনোয়ার রফিকের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন "আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে! তুমি আসবে আমি ভাবতেই পারি নি। এখনই দিচ্ছি"।

৬

নতুন দিল্লি। দুপুর বারোটা।
অফিসে কাজ করছিলেন আশরফ। তুষার তার চেম্বারে ঢুকে বললেন, "কী করছো আশরফ, আসল খবরই মিস করে গেলে?"
আশরফ অবাক হয়ে বললেন, "কোন খবর স্যার?"
তুষার তার মোবাইলটা আশরফের দিকে এগিয়ে দিলেন, "চিনতে পারছো?"
আশরফ বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠলেন, "মাই গড! এতো রফিক!"
তুষার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বললেন, "হু। আর পাশে মেয়েটা?"
আশরফ বললেন, "ওকে তো চিনি না"।
তুষার বললেন, "বেশ। সো, দ্য ব্রেকিং নিউজ ইজ আশরফ, রফিক ইন্ডিয়ায় এসেছিল"।
আশরফ চিন্তিত গলায় বললেন, "আবার কোন মিশন অ্যাক্টিভেট করতে চাইছে নাকি?"
তুষার মাথা নাড়লেন, "নো আইডিয়া। নিয়াজির এগেইন্সটে এরা এখন এক হচ্ছে। নিজেদের কার্যকারিতা প্রমাণ করতে হয়ত খুব শিগগিরি এ দেশে কিছু করে বসবে। দিস ইজ ভেরি অ্যালার্মিং। কলকাতা থেকে ঢাকা গেছে। শেরাটনে আছে আপাতত। চেক ইনে মেয়েটির নাম আছে তবসসুম নূর। ইন্ডিয়াতে মেয়েটির কোন ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই এখনও। কথা হল মেয়েটি কে?"
আশরফ বললেন, "কলকাতা অফিসে ফোন করে দিচ্ছি স্যার। ভোটার লিস্ট সার্চ করা হোক আগে। রফিক কোন নামে ঢুকেছিল, এত সহজে বেরিয়েই বা গেল কী করে? আমরা কিছুই করতে পারলাম না"! আশরফের গলা হতাশ শোনাল।
তুষার বললেন, "এসেছিল, বেরিয়ে গেছে, বেরিয়ে যাক। আমি সেসব দিয়ে চিন্তিত নই আশরফ। আমি চিন্তিত এখন কোথায় ওরা কী প্ল্যান করছে, তা নিয়ে। প্ল্যানটা লং টার্ম, না শর্ট টার্ম সেটাও ভাবতে হবে"।
আশরফ বললেন, "লং টার্ম বলতে?"
তুষার বললেন, "রফিক বাংলাদেশে আছে মানে ও এখন বাংলাদেশ বর্ডারে নতুন কোন ঘাঁটি তৈরী করার জন্য গেছে। সেখানে কী কাজ করবে সেটাই তো জানতে হবে। বি এস এফকে আমি বলে দিয়েছি। ঢাকায় আমাদের উইংকেও বলেছি"।
আশরফ বললেন, "স্যার রফিককে ঢাকায় আটকে দেওয়া যাবে না?"
তুষার বললেন, "না। বরং ও ঢাকায় কেন গেছে, কী করছে সেটা জানা বেশি দরকারি"।

আশরফ বললেন, “আমি শেরাটনে চলে যাই স্যার। অসহ্য লাগছে আমার। আমাদের নাকের সামনে দিয়ে জানোয়ারটা এই দেশে এসে চলে গেল, আমি মানতে পারছি না।”
তুষার বললেন, “তুমি যাবে? গিয়ে মাথা গরম করে কিছু করে বসবে না তো?”
আশরফ হাসলেন, “কী যে বলেন স্যার, আমি কি বাচ্চা ছেলে নাকি? আমি শেরাটনে আজ রাতেই চেক ইন করে যাই”।
তুষার বললেন, “বেশ তো, আর সঙ্গে কাকে নেবে?”
আশরফ বললেন, “ঢাকায় সোহরাব আছে তো। আমি ওকে ফোন করে নিচ্ছি”।
তুষার জোর জোরে মাথা নাড়লেন, “না, তোমাদের দুজনেরই মাথা গরম। আমি এই কাজে সোহরাবকে দেবো না। তুমি মাথুরকে নিয়ে যাও”।
আশরফ বললেন, “মাথুর সবে শ্রীনগর থেকে এল স্যার। রেস্ট করছে। ওকে বিরক্ত করা ঠিক হবে?”
তুষার ফোন বের করলেন, “বিরক্তর কী আছে? তোমরা দুজন হলে এই কাজে অটোমেটিক চয়েস। এই তো ফোন পেয়েছি, হ্যালো, মাথুর? হ্যাঁ, ঢাকা যেতে হবে। বাক্সপ্যাটরা বেঁধে এয়ারপোর্ট চলে যাও। আশরফ যাবে। ও তোমাকে ব্রিফ করে দেবে। হ্যাঁ। ওকে”।
ফোন রেখে তুষার হাসলেন, “দেখলে? অ্যাস সিম্পল অ্যাস দ্যাট। কিন্তু মনে রেখো, তোমরা কিন্তু রফিককে ধরতে যাচ্ছো না। ওর গতিবিধি নজর রাখতে যাচ্ছো। আর গোটা ব্যাপারটা আমি মিনিস্ট্রিতে এখন কাউকে জানাবো না। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?”
আশরফ ঘাড় নাড়লেন, “লাউড এন্ড ক্লিয়ার স্যার”।
তুষার বললেন, “আর্মস ঢাকায় পাবে শুভর কাছে। কিন্তু ইউজ করবে না কোনভাবেই। কোনরকম কোন ঝামেলায় জড়াবে না। রফিককে দেখবে, কাচ্চি বিরিয়ানি খাবে, ইলিশ মাছ খাবে, ঢাকার আতিথেয়তা ভোগ করবে, ভাল ছেলের মত দেশে ফিরে আসবে। ক্লিয়ার?”
আশরফ এবার হেসে ফেললেন, “লাউড এন্ড ক্লিয়ার স্যার”।

৭

সকাল দশটা দশ।
ঢাকা শেরাটন হোটেল।
একটা কনভয় এসে দাঁড়াল হোটেলের সামনে। নিরাপত্তা রক্ষীরা সচকিত হয়ে উঠল। গাড়ি থেকে নামলেন দেশের এক পরিচিত নেতা। সোজা হোটেলে ঢুকে লিফটে উঠলেন। তার সঙ্গে চারজন নিরাপত্তারক্ষী আছে। লিফট থেকে নেমে একটা ঘরের সামনে এসে ভদ্রলোক নিরাপত্তারক্ষীদের বাইরে থাকতে বললেন। কলিং বেল টিপতে তবসসুম দরজা খুলল।
বলল, “জাহির সাব?”
জাহির মাথা নাড়ালেন, “জি”।
তবসসুম বলল, “আসুন”।
জাহির ভিতরে ঢুকলেন। রফিক ল্যাপটপে কাজ করছিলেন। জাহির সালাম দিলেন।
রফিক বললেন, “বসুন”।
জাহির বসলেন। তববসুম ভেতরের ঘরে চলে গেল।
জাহির বললেন, “জনাব ইনি কি নতুন ভাবিজী?”
রফিক স্ক্রিণে চোখ রেখে বললেন, “না। তবে হবে হয়ত। আমার পছন্দ হয়েছে একে। বন্ধুর মেয়ে। বলুন, ইস্ট পাকিস্তানের খবর কী?”

জাহির হাত কচলালেন, “জনাব বোধ হয় ভুলে গেছেন, ইস্ট পাকিস্তান বলে এখন আর কিছু নেই”।
রফিকের চোয়াল শক্ত হয়েই মুহূর্তে স্বাভাবিক হল, “আমার কাছে এই জায়গাটা পাকিস্তান ছিল, আছে, থাকবে। বাই দ্য ওয়ে, আপনাদের ভারত প্রীতি বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। বিধর্মীদের বাঙালিরা এত পছন্দ করে কেন? আলাদা কিছু পান নাকি ওদের কাছে যেটা আমরা দিতে পারি না?”
জাহির বললেন, “জনাব সেটা বাংলাদেশ আওয়ামী পার্টি বলতে পারবে। আমরা তো বরাবর ইন্ডিয়া বিরোধী কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা পাকিস্তানের প্রতি সব ধরণের বশ্যতা স্বীকার করেই রয়েছি”।
রফিক গলায় বিদ্রুপ এনে বললেন,”তাই নাকি?”
জাহির বললেন, “জি অবশ্যই জনাব”।
রফিক বললেন, “তিস্তার পানি দেয় না ভারত, তা নিয়ে যে ঝামেলাটা করার কত ছিল সংসদে, করলেন না কেন?”
জাহির ঘাম মুছে বললেন, “জি জনাব, আমাদের ক্রিকেট টিম কাপ জিতল, আমরা সেটা সেলিব্রেশনে ব্যস্ত ছিলাম”।
রফিক বললেন, “ও। মানে সরকারি দল যেভাবে আপনাদের চালাবে, আপনারা সেভাবেই চলবেন। তাই তো?”
জাহির বললেন, “তা না জনাব। উই আর ট্রায়িং আওয়ার বেস্ট”।
রফিক বললেন, “নাহ। ইউ আর নট ট্রাইং জাহির সাব। আমাদের কাছে সব খবরই আছে। ইভেন আই এস আই এ দেশে একবারেই ফ্রি স্পেস পাচ্ছে না। দিস ইজ ভেরি ডিজাপয়েন্টিং”।
জাহির বললেন, “জি জনাব আমাদের সরকার এলে এত সমস্যা হবে না”।
রফিক জোরে হেসে উঠলেন, “এত এত টাকা গর‍্যান্ট নিয়ে কী করছেন তা আমরা জানি না ভাববেন না জাহির। আমরা আপনাদের নিয়ে একবারেই স্যাটিসফায়েড না। এভাবে চললে সমস্যা বাড়বে। যাই হোক, সিলেটে আমাদের একটা মাদ্রাসা চাই। কবে ব্যবস্থা করতে পারবেন?”
জাহির বললেন, “সিলেটে হবে না জনাব।”
রফিক বিরক্ত মুখে বললেন, “কেন হবে না? তাহলে কোথায় হবে?” জাহির বললেন, “কিছু সমস্যা আছে। আপনার বর্ডার এরিয়া চাই তো? যশোরে দিয়ে দিচ্ছি?”
জাহির ল্যাপটপে বাংলাদেশের ম্যাপ খুলে বললেন, “না, যশোর উইল নট সার্ভ আওয়ার পারপাস। আমার সিলেট চাই। ট্রাই ইওর বেস্ট। আদারওয়াইজ রোশান সাবের সাথে কথা বলতে হবে”।
জাহিরের মুখে টেনশনের ছাপ এল। ফোন বের করে কাউকে ফোন করে কয়েক মিনিট কথা বলে বললেন, “হয়ে যাবে জনাব। আপনি কীভাবে অপারেট করবেন আমাদের জানান।”
রফিক বললেন, “আপনি কি আমাদের সঙ্গে খেলছেন নাকি বলুন তো? আপনাকে রোশান সাবের নাম নিতে হবে তারপরে আপনি কথা বলবেন, নয়ত বলবেন না, মানে টা কী?”
জাহির বললেন, “না জনাব। ব্যাপারটা সেরকম না। সিলেট নিয়ে আমাদের মধ্যে সত্যি সত্যিই একটু সমস্যা আছে”।
রফিক বললেন, “ইস্ট পাকিস্তান আমাদের মদত দেবে না, ইন্ডিয়ার কথায় উঠবোস করবে, ইন্ডিয়া যা বলবে তাই করে চলবে, তা যদি হয়, তাহলে কিন্তু আই এস আইকেও তার মত করে স্টেপ নিতে হবে”।
জাহির মাথা নিচু করে বললেন, “সে ক্ষেত্রে আপনাকে আমি বলব আপনি সরকার পক্ষের সাথে কথা বলুন”।
রফিক বললেন, “আপনার সরকার সরাসরি ইন্ডয়ার মদতপুষ্ট। আমরা ভেবেছিলাম আপনারা অন্তত আপনার ধর্মের মানুষদের জন্য কিছু করতে আমাদের সাহায্য করবেন। দুঃখের সঙ্গে দেখলাম আপনারা জঘন্যভাবে ব্যর্থ। যাই হোক, আপনার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল। পরের বার এলে অবশ্যই চা খেয়ে যাবেন। বাই”।

জাহির উঠলেন না। রফিক বললেন, “হোয়াট?”
জাহির বললেন, “জি জনাব, সিলেটের জন্য কিছু ডলার...”
রফিক বললেন, “আপনি দেবেন”।
জাহির চমকে বললেন, “জি?”
রফিক বললেন, “অনেক ডলার নিয়েছেন। কোন কাজ করেন নি। এবার করুন। তারপর ভেবে দেখব। নাও লিভ”।
জাহির কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে অপমানটা হজম করলেন। তারপর বেরোলেন।
দরজাটা বন্ধ হতে রফিক চাপা গলায় বললেন, “ব্লাডি কোরাপ্টেড বাস্টার্ডস”!

৮
লক্ষ্ণৌ এয়ারপোর্টে জনা একশো মানুষ ভিড় করেছে।
বাবা দয়াসাগর এসছেন। বাবার পায়ে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রণাম করছে।
বাবার জন্য দামী গাড়ি এসেছে। বাবা তাতে চড়ে বসলেন।
সঙ্গে চলল বাবার সঙ্গী সাথীরা।
ইন্সপেক্টর তরুণ শর্মার উপরে দায়িত্ব পড়েছে বাবাকে তার আশ্রমে পৌঁছে দিতে হবে।
তরুণ তার গাড়িতে বসে ট্রাফিকের খোঁজ নিচ্ছিলেন।
তার অধঃস্তন বিজয় বলল, “স্যার, এই সব বাবারা বিশ্বস্ত হয়?”
তরুণ বিরক্ত মুখে বললেন, “আমি তুমি বিশ্বাস না করলে কী হবে,আমাদের সাহেবরা করে। এ নাকি ভি আই পি। কীসের ভি আই পি কে জানে! ভন্ড বাবা কোথাকার!”
বিজয় চানা খেতে খেতে বলল, “আমারও তাই মনে হয়। এই যে বাবার সঙ্গে বাবার ভক্ত মেয়েগুলো থাকে, এদের আমার কেমন যেন লাগছে”।
তরুণ হাসলেন।
দয়াসাগরের গাড়ি কিছুক্ষণ পর তার বাড়িতে ঢুকল।
তরুণদের জিপও ঢুকে গেল বাড়ির চত্বরে। শহরের মধ্যে অনেক জায়গা নিয়ে বাড়ি।
দয়াসাগর গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তবৃন্দ ছুটে এল। বাবার পা মাটিতে পড়ল না। তার আগেই ভক্তেরা হাত পেতে দিল।
তরুণ অবাক হয়ে দেখলেন বাবার বাড়ির উঠোন অবধি ভক্তরা বাবাকে মাটিতে পা রাখতেই দিল না।
তিনি হেড অফিসে ফোন করলেন, “স্যার, বাবাজী বাড়িতে পৌঁছে গেছেন। আমরা এবার বেরোচ্ছি”।
উত্তর এল, “ঠিক আছে। টহলদারি গাড়ি যেন বাবাজীর বাড়ির উপর নজর রাখে। বাবার উপর থ্রেট আছে”।
তরুণ ফোন রেখে থুতু ফেললেন।
বিজয় বলল, “কী হল স্যার?”
তরুণ বললেন, “এই লোককে কে থ্রেট দেবে বল তো?”
বিজর বলল, “সবই গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য করা হচ্ছে বুঝতে পারছেন না? চলুন স্যার”।
তরুণ গাড়িতে উঠলেন। বিজয় গাড়ি স্টার্ট দিতে যাবে, দেখল বাবা যে গাড়িতে করে এসেছিলেন, সে গাড়ির ডিকি খোলা হচ্ছে। তরুণ বিজয়ের হাত ধরে বললেন, “এক মিনিট”।
গাড়ির ডিকি থেকে একটা বড় ট্রাঙ্ক নামল।
তরুণ বললেন, “গাড়ি থামাও”।
বিজয় গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করল।
তরুণ নেমে গিয়ে ভক্তদের বললেন, “ট্রাঙ্ক খোলো”।

ভক্তদের মধ্যে শোরগোল পড়ে গেল।
তরুণ বললেন, “বাবাজীর জানের খতরা আছে। আমি বাবাজীর নিরাপত্তার দায়িত্বে আছি। এই ট্রাঙ্ক বাড়িতে ঢোকার আগে আমি দেখব ভিতরে কী আছে। তারপরে এটা বাড়ির ভিতরে ঢুকবে”।
খবর বাড়ির ভিতরে চলে গেল।
বাবা দয়াসাগর বাইরে বেরিয়ে এলেন।
বাবা বললেন, “ওহে বৎস, এই ট্রাঙ্কের ভিতরে আমার বস্ত্র ইত্যাদি আছে। ভয়ের কিছু নেই। নিরাপত্তা ক্ষেত্র পেরিয়ে এই ট্রাঙ্ক নিয়ে আসা হয়েছে। তুমি নিরাপদে প্রস্থান কর”।
তরুণ জেদ ধরে দাঁড়ালেন।
বাবা একজনকে ইশারা করলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে তরুণের কাছে উপরওয়ালার ফোন এল, “কী করছো ওখানে?”
তরুণ শান্ত গলায় বললেন, “ডিউটি করছি স্যার। ট্রাঙ্কের মধ্যে বোম থাকতে পারে। দেখতে চাই কী আছে”।
“দেখতে হবে না। বেরিয়ে যাও”।
“না স্যার। এটা না দেখে বেরোতে পারব না”।
“শো কজ করা হবে তোমায়। সাসপেন্ডও হতে পারো”।
“হোক স্যার। না দেখে যাবো না। এত বড় ট্রাঙ্কে কী আছে না দেখে আমি নড়ব না”।
ফোন কেটে গেল।
তরুণ ভক্তদের উদ্দেশ্যে বললেন, “তালা খুলুন। নইলে আমি এই ট্রাঙ্ক নিয়ে চলে যাব। আমার উপর বাবাজীর সিকিউরিটির দায়িত্ব আছে মানে আমাকে দেখতে হবে এর ভিতরে কী আছে। বাবাজীর জানের খতরা আছে। বোম থাকলে কে দেখবে”?
একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হল। ধর্মের উপর অনাবশ্যক আঘাত বলে ভক্তরা স্লোগান দিতে শুরু করল।
বাবাজী থমথমে মুখে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ট্রাঙ্ক খোলার অনুমতি দিলেন।
এক ভক্ত লনের উপর ট্রাঙ্ক খুলে দিল।
ট্রাঙ্ক ভর্তি পুজোর সামগ্রী।
বাবাজী হাসিমুখে বললেন, “এবার শান্তি?”
তরুণ একবার বাবাজীর দিকে তাকিয়ে সব সামগ্রী সরাতে শুরু করলেন।
মিনিট খানেক পরে ট্রাঙ্কের নিচ থেকে বেশ কয়েকটা রাইফেল উদ্ধার হল।
তরুণ বিস্মিত চোখে কয়েক সেকেন্ড সেদিকে তাকালেন।
তবে বেশি সময় পেলেন না।
ভক্তরা তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।
তরুণ কিছু বুঝে ওঠার আগেই একটা ছুরি তার পিঠে গেঁথে গেল।
বিজয়ও পালাতে পারলেন না।

৯

ইসলামাবাদ আই এস আই কন্ট্রোল রুম। আই এস আই চিফ সামশের আলি চেম্বারে বসে সিগারেট টানছে। আকবর খান চেম্বারের দরজা নক করল। সামশের ইশারায় আকবরকে প্রবেশ করতে বলল। আকবর চেম্বারে ঢুকে বলল, “জনাব, মুজফফরাবাদ থেকে ফোন এসেছিল”।
সামশের বলল, “আবার কিছু চাই?”
আকবর বসে বলল, “না। জানাবে”।
সামশের বলল, “তোমার কী মনে হয় আকবর? কাশ্মীরে এই বারে কতজনকে পাঠানো যাবে?”
আকবর বলল, “জনাব, যত বেশি লোক সম্ভব”।

সামশের বলল, “রাইট। কাশ্মীর নিয়ে ভাইজানেরা বড্ড বেশি সক্রিয় হয়ে উঠছে। ইন্ডিয়া ইজ এ প্রেটি বিগ কান্ট্রি। এত বড় দেশের আর্মি, ইন্টেলিজেন্স, সবাই শুধু কাশ্মীর নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলে কী করে হবে? হবে না। হওয়া উচিত না। আমি তো ইন্ডিয়াকে ভালোই বাসি। আমরা চাই, ওরা শুধু কাশ্মীর নিয়ে না ভেবে, গোটা দেশের সিকিউরিটি নিয়েই ভাবুক”।

আকবর হাসল, “জি জনাব”।

সামশের তার ল্যাপটপটা আকবরের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, “স্পটগুলো সম্পর্কে খোঁজ নাও। নেতাদের বড় র‍্যালি হবার খবর আছে। এই প্রতিটা জায়গা সম্পর্কে আমাকে ডিটেইলড রিপোর্ট পাঠাও”।

আকবর বলল, “জি জনাব, আমাকে মেইল করে দেবেন এই ম্যাপটা”?

সামশের বলল, “শিওর। আরেকটা কথা”।

আকবর বলল, “জি জনাব”।

সামশের বলল, “চাইনিজ ডেলিগেটস আসছে প্রেসিডেন্টস হাউজে। আমাকে যেতে হবে। তোমাকে কবুতর সামলাতে হবে। সেক্টর সিক্স, সেভেন্থ পয়েন্ট পেট্রোল পাম্প। ওকে?”

আকবর ইতস্তত করে বলল, “আমি যাব জনাব? উনি আপনাকে না দেখলে রেগে যেতে পারেন”।

সামশের বলল, “কেন তুমি যাবে না? তুমি রিকোয়ারমেন্টসগুলো জেনে নেবে”।

আকবর বলল, “কেউ জেনে গেলে?”

সামশের বলল, “তাহলে তুমি এই কাজ করছো কেন? অন্য কোন চাকরি কর। এত বছর ধরে এই অর্গানাইজেশনে আছো, এখনো যদি এসব কথা বল, তাহলে তো কিছু বলার নেই”।

আকবর কিছু বলল না। চুপ করে গেল।

সামশের অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠল।

প্রেসিডেন্ট হাউজের বাইরে সাংবাদিকরা দাঁড়িয়ে আছে। সামশের কাউকে পাত্তা না দিয়ে হাউজে প্রবেশ করল।

প্রেসিডেন্টের খাস খানসামা তাকে বিশেষ কক্ষে বসাল। টিভি চলছে। সামশের টিভির রিমোট নিয়ে চ্যানেল চেঞ্জ করতে শুরু করল।

প্রেসিডেন্ট নিয়াজি ঘরে প্রবেশ করে বললেন, “সব ঠিক আছে?”

সামশের উঠে দাঁড়িয়ে প্রেসিডেন্টকে অভিবাদন করে বলল, “জি জনাব”।

নিয়াজি সোফায় বসে সামশেরকে বসতে বলে বললেন, “মিটিঙটা আজকে হচ্ছে না মিস্টার আলি”।

সামশের বিস্মিত হয়ে বলল, “আমাকে তো কেউ জানায় নি”!

নিয়াজী বললেন, “আমিই বারণ করেছি। আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। ফোনে তো সে কথা বলা সম্ভব না, আপনিও আজকাল এই রাস্তাটা ভুলেই গেছেন, অগত্যা আপনার সঙ্গে কথা বলার এই সুযোগটা আমি ছাড়তে চাই নি”।

সামশের বলল, “শুনে খারাপ লাগল জনাব, এভাবে কি আমি এখানে আসতে পারি?”

নিয়াজী বললেন, “আপনাকে কিছুদিন আগেও এখানে আসার জন্য ফোন করা হয়েছিল, আপনি বলেছিলেন করাচী যাবেন, ফিরে এখানে আসবেন, আপনি আসেন নি। মনে আছে?”

সামশের বলল, “জি জনাব, বালোচরা ওখানে একটা ঝামেলা করছিল, আমি ওখানে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, আর সময় পাই নি”।

নিয়াজী কয়েক সেকেন্ড সামসেরের দিকে তাকিয়ে বললেন, “ঠিক আছে, আশা করব এর পরে আপনার এখানে আসার জন্য সময় থাকবে”।

সামশের মাথা নাড়ল, “নিশ্চয়ই জনাব। আমি ক্ষমাপ্রার্থী”।

নিয়াজী বললেন, “সেটা হওয়াই ভাল। যাই হোক, আপনাকে ডাকার মূল কারণ হল, দেশে এখন একটা নির্বাচন হবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সেনাবাহিনী আর কতদিন দেশ চালাবে? আমি আপনার থেকে একটা ডিটেইলড রিপোর্ট চাই ফ্রম ইওর অরগানাইজেশনাল পারসপেকটিভ, উইদিন সেভেন ডেজ। ইজ ইট পসিবল?”

সামশের বলল, “নিশ্চয় জনাব”।

ঘরে একটা রোবো ভ্যাকুয়াম ক্লিনার সক্রিয় হল। নিয়াজী বললেন, “ওহ, আপনি এ জিনিস দেখেছেন? চিনা আবিষ্কার, এটা নিজে থেকেই ঘর মুছে দেয়। আমি নিজেই অপারেট করি। ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং”।

সামশের বলল, “জি জনাব, এটা এখন খুব চলছে”।

নিয়াজী বললেন, “এই জিনিসের মধ্যে ওরা স্পাই ক্যাম বসিয়ে দেশের বাজারে ছাড়ছে নাকি সে ব্যাপারেও আমাকে একটা রিপোর্ট দেবেন। ক্লিয়ার?”

সামশের কয়েক সেকেন্ড নিয়াজীর দিকে তাকিয়ে বলল, “জি জনাব”।

১০

দিল্লি এয়ারপোর্ট।

সন্ধ্যে সাতটা। এয়ারপোর্টে পৌঁছে মাথুরের সঙ্গে দেখা হল আশরফের।

কাগজপত্রের কাজ সেরে সিকিউরিটি সেরে অপেক্ষমান যাত্রীদের চেয়ারে বসে আশরফ হাসলেন, “ঘুমটা নষ্ট করলাম, নাকি?”

মাথুর প্রত্যুত্তরে হাসলেন, “একবারে না। যা একটা দিন যাচ্ছে। তবে আশা করছি শেষে গিয়ে খুব একটা খারাপ দিন কাটবে না”।

মাথুর বললেন, “রফিক তাহলে শেরাটনে উঠেছে?”

আশরফ বললেন, “হ্যাঁ। দ্যাট...”

আশরফ চুপ করে গেলেন।

মাথুর হাসলেন, “কবে থেকে ভদ্রলোক হয়ে গেলে তুমি?”

আশরফ চারদিকে তাকিয়ে বললেন, “কী দরকার? অন্য কথা আলোচনা কর”।

মাথুর বললেন, “ঠিক আছে, বুঝেছি”।

বোর্ডিং শুরু হল।

দুজনে প্লেনে তাদের সিটে গিয়ে বসলেন।

মাথুর বললেন, “ভারতীয় কেউ নেই নাকি? সবাই বাংলায় কথা বলছে দেখছি”।

আশরফ বললেন, “টুয়েলভ এ বি সি, নাইন্টিন ই এফ, টুয়েন্টি সিক্স এ সি ডি, ফরটি এ বিতে ইন্ডিয়ান আছে। দুজন ব্যবসায়ী, বাকিরা পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রোজেক্টের কাজে যাচ্ছেন। এনটিপিসির লোক”।

মাথুর অবাক হয়ে বললেন, “এগুলো কী করতে জানলে?”

আশরফ ফিসফিস করে বললেন, “রফিক অ্যাক্টিভেট হয়েছে যখন, তখন আমাদের চোখ কান খোলা রাখা শুরু করতে হবে মাথুর। লাস্ট টাইম রফিক অ্যাক্টিভেট হয়েছিল ২৬/১১ তে। দেরাদুনে থেকে সব কন্ট্যাক্ট রেখে জাস্ট ভ্যানিশ হয়ে গেছিল। এবারেও দেশে ঢুকে ঢাকা চলে গেল, আমরা কিছু করতে পারলাম না। বার বার এরকম ইন্টেলিজেন্স ফেইলিওর হচ্ছে, এটা আমাদের লজ্জা”।

মাথুর বললেন, "ধুস। দেড়শো কোটি হতে চলেছে যে দেশের জনবসতি, সেখানে তুমি রফিক কীভাবে আসছে সেসব নিয়ে চিন্তা করছ। ভেবো না। যাক গে, আমি ঘুমালাম। আমার ঘুম পাচ্ছে"।
আশরফ বললেন, "ওকে। শোও"।
প্লেন উড়ল সাড়ে আটটা নাগাদ। মাথুর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আশরফ কফি নিতেই মাথুর পাশ থেকে ঘুম চোখেই বলে উঠলেন, "আমার জন্যেও নেবে। সঙ্গে স্যান্ডউইচও"।
আশরফ হেসে ফেললেন।
মাথুর উঠে স্যান্ডউইচ চিবোতে চিবোতে বললেন, "শুভকে বলে দিয়েছো তো?"
আশরফ বললেন, "কী আর্মস আনতে?"
মাথুর বিরক্ত গলায় বললেন, "না, ধুস! পুরনো ঢাকার কাচ্চি আনতে। সব সময় অ্যাকশন ফিল্ম ভাল লাগে তোমার? আমি তো ওদের আতিথেয়তার কথা ভেবেই ঢাকা যাওয়ার নামে এক পায়ে খাড়া হয়ে গেলাম। প্রতিবার বাংলাদেশ থেকে এসে আমার ওজন বেড়ে যায়"।
আশরফ বললেন, "আজ তোমার জন্য শেরাটনে কন্টিনেন্টাল অপেক্ষা করে থাকবে। কাচ্চি কাল খেও"।
মাথুর ব্যাজার মুখে বললেন, "ধুস। মেজাজটাই মাটি হয়ে গেল"।
আশরফ কফিতে চুমুক দিয়ে ঘড়ি দেখে বললেন, "ল্যান্ডিং এর সময় হয়ে এল। আমাদের আজ কোন কাজ নেই। জাস্ট চেক ইন কর, আর ঘুমিয়ে পড়"।
মাথুর বললেন, "তুমি শিওর, তুমি তাই করবে?"
আশরফ বললেন, "আমার তো ইচ্ছা করছে রফিকের রুমে ঢুকে ওকে গুলি করে মারি। সেটা যদি করতে পারতাম সব থেকে ভাল হত। দুর্ভাগ্যবশত সেটা সম্ভব না। স্যারের কড়া অর্ডার আছে, ওনলি ডেটা কালেকশন এন্ড ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন"।
মাথুর বললেন, "হু, উই ক্যান মেক ইট লুক লাইক অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট"। আশরফ বললেন, "সারটেনলি"।
মাথুর বললেন, "আর কোন ইনফরমেশন"?
আশরফ চারদিকে একবার তাকিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, "রফিক একজন মেয়ের সঙ্গে ঘুরছে। অনেক ছোট। মেয়েটার বাবার নাম আনোয়ার। কলকাতায় থাকত। এই মেয়েটার কোন হিস্ট্রি নেই। রফিক হঠাৎ করে একে নিয়ে ঢাকা চলে গেল কেন বোঝা যাচ্ছে না"।
মাথুর বললেন, "বিয়ে করবে বা শোবে, আর কী?"
আশরফ বললেন, "নিয়ে বেরিয়েছে মানে খুব ভাল করে জানে এ ইন্ডিয়া ফিরবে না। তার মানে ওই বিয়েই করবে হয়ত। ভালই আছে এরা"।
মাথুর আর আশরফ একসঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেসে উঠলেন।

১১

রাত বারোটা।
তুষার কম্পিউটারে কাজ করছিলেন।
ইরাবতী এসে বললেন, "তুমি ঘুমোবে না? সারা রাতের প্ল্যান আছে আজকে?"
তুষার বললেন, "তুমিই বা জেগে আছো কেন এত রাত অবধি? তোমার তো এত রাত অবধি জেগে থাকা অ্যালাউড না"!
ইরাবতী বললেন, "ঘুম আসছে না। তুমি টেনশড কেন? আবার কিছু হল?"
তুষার বললেন, "মাথুর আর খান বাংলাদেশে। বীরেন পাকিস্তানে যাবে। টেনশন হবে না?"
ইরাবতী বললেন, "আর বাকিরা?"

তুষার বললেন, “তারা তাদের কাজ করছে। কিন্তু আমার খানকে নিয়ে খুব ভয় লাগে আজকাল। কাশ্মীরে আক্রান্ত হবার পর থেকে ওর মধ্যে একটা মরিয়া ব্যাপার দেখতে পারছি যেটা এ কাজের জন্য ঠিক না। ভাবছি খানকে অফিসে বসিয়ে দেব”।
ইরাবতী হাসলেন, “আশরফ নিজে বসতে চাইলে তো”!
তুষারের ফোন বাজতে শুরু হল।
তুষার কিছুক্ষণ কথা বলে ফোনটা রেখে বললেন, “উফ। এরা যদি একটু বিশ্রাম দেয়”।
ইরাবতী বললেন, “কী হল?”
তুষার ক্লান্ত গলায় বললেন, “পুঞ্চে দুটো ড্রোন ঢুকিয়েছিল। এই মাত্র গুলি করে নামিয়েছে জওয়ানেরা। সম্ভবত লঞ্চ প্যাডে আবার জঙ্গী জড়ো হচ্ছে”।
ইরাবতী শ্বাস ছেড়ে বললেন, “কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান কী করবে? এই কিছুক্ষণ আগেই পাকিস্তানের ইকোনমি নিয়ে পড়ছিলাম। ওরা একটা ভয়াবহ ফেজ দিয়ে যাচ্ছে। লোকে খেতে পারছে না, মাঝে মাঝেই পাওয়ার কাট হয়ে যাচ্ছে। অনেক ধার বেড়ে গেছে দেশটার। কাশ্মীর যদি ওরা পেয়েও যায়, তারপর কী করবে?”
তুষার বললেন, “কাশ্মীর হল পাকিস্তানের কাছে আলাউদ্দিন খিলজির পদ্মাবতী। পেয়ে গেলে কাশ্মীর নিয়ে কী করবে জানে না, কিন্তু চেষ্টা চালিয়েই যাবে”।
ইরাবতী বললেন, “দিন দিন আরো কঠিন পরিস্থিতি তৈরী হচ্ছে”।
তুষার বললেন, “কী করবে? কিছু করার আছে? কেউ জানে না কবে এসব মিটবে। রাজনীতির স্বার্থে দুই দেশের পলিটিশিয়ানরাই এই সমস্যাটাকে জিইয়ে রাখবে। যে সব দেশের বাজেটের বিরাট অংশ শুধু প্রতিরক্ষায় চলে যায়, সে দেশ কীভাবে উন্নতি করবে?”
ইরাবতী বললেন, “রিয়েলি? তাহলে তোমার স্যালারি হবে কী করে মিস্টার তুষার রঙ্গনাথন?”
তুষার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, আবার ফোন বেজে উঠল। ধরলেন। আশরফ ফোন করেছেন। তুষার বললেন, “বল। চেক ইন হল?”
আশরফ বললেন, “হ্যাঁ স্যার। এয়ারপোর্টে অনেকটা টাইম লেগে গেল। হোটেলে এসে অনেক চেষ্টা করেও রফিকের দেখা পাওয়া যায় নি”।
তুষার বললেন, “বেশি চেষ্টা করতে হবে না। আজকের রাতটা নিশ্চিন্তে ঘুমাও। বাকিটা আমি বলে দেব কী করতে হবে। তুমি কোন রকম অ্যাগ্রেসিভ ডিসিশন নেবে না। ক্লিয়ার?”
আশরফ হাসলেন, “স্যার আমাকে নিয়ে খুব ভয়ে থাকছেন দেখছি আজকাল?”
তুষার বললেন, “হ্যাঁ। তোমাদের ম্যাডামকেও সেটাই বলছিলাম। খান আজকাল পেগলে গেছে। তুমি ঘুমিয়ে পড়। আশা করা যায়, কাল ব্রেকফাস্ট টেবিলে রফিকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। অ্যাস পার আওয়ার ইনফরমেশন, ব্রেকফাস্ট রফিক রুমে নেয় না। সবার সঙ্গেই করে”।
আশরফ বললেন, “ওকে স্যার। পুঞ্চের নিউজটা পেলাম। আশা করব ওরা আর কোন ড্রোন পাঠাবে না”।
তুষার বললেন, “ঠিক আছে। তুমি রেস্ট কর। এসব নিয়ে চিন্তা না করে ঘুমাও। আমি দেখে নিচ্ছি”।
আশরফ বললেন, “ওকে স্যার। গুড নাইট”।
ফোন রাখলেন তুষার। ইরাবতী বললেন, “একটা হল। এবার সায়কের ফোনটা বাকি, তাই তো?”
তুষার বললেন, “আজ সায়ক ফোন করবে না। আমার অন্য কাজ আছে”।
ইরাবতী বললেন, “কী কাজ?”
তুষার বললেন, “আমি জাস্ট বাংলাদেশের ম্যাপটা দেখছিলাম ভাল করে। আই এস আই বাংলাদেশে সক্রিয় হয়ে ওঠা মানে আমাদের আবার ইস্ট করিডরে সিকিউরিটি বাড়িয়ে দিতে হবে। কোন দিকে যে যাব!”

ইরাবতী চোখ বন্ধ করে বসলেন। তুষার আরো কিছুক্ষণ কাজ করে পেছন ফিরে দেখলেন ইরাবতী সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে।
তুষার আবার কাজে মন দিলেন। এতটাই মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন বুঝে উঠতে পারেন নি রাত তিনটে বেজে গেছে।

১২
ঢাকা শেরাটন হোটেল।
ভোর ছ'টা। মাথুর ঘুমোচ্ছিলেন। পেটে খোঁচা খেলেন।
উঠে দেখলেন আশরাফ ট্র্যাক স্যুট পরে তৈরী হয়ে গেছেন।
মাথুর বিছানায় উঠে বসে বললেন, "রফিক বেরিয়েছে?"
আশরাফ বললেন, "রফিককেই বেরোতে হবে মর্নিং ওয়াকের জন্য? চল শহরটা টহল দিয়ে আসি। যতটা যাওয়া যায়"।
মাথুর বললেন, "পারলাম না। তুমি যাও আমি ঘুমাবো"।
আশরাফ বললেন, "দেখো মাথুর, তুমি না উঠলে পুরো এক বালতি জল ঢেলে দেবো আমি। উঠবে এবার?"
মাথুর বিরক্ত মুখে হেলতে দুলতে উঠে দাঁত মাজলেন। বাথরুম সেরে বেরিয়ে চেঞ্জ করতে করতে বললেন, "তোমায় এই জন্য আমার সহ্য হয় না। কোথায় এত জার্নি করে এসে একটু ঘুমোতে দেবে তা না, জ্বালাতন শুরু করে দিয়েছো"।
আশরফ বললেন, "চল বেরোই"।
দুজনে বেরোলেন।
মাথুর ফিসফিস করে বললেন, "এত বড় হোটেল, কোন ঘরে ঘুঘু ঢুকে বসে আছে, কে জানে"।
আশরফ বললেন, "সকাল সাতটা থেকে দশটা ব্রেকফাস্ট টাইম। প্রথম দেড় ঘন্টা আমি ব্রেকফাস্ট টেবিলে থাকবো, পরের দেড়ঘন্টা তুমি। রফিককে স্পট করা গেলে তখনই করা যাবে, যদি না..."
মাথুর বললেন, "কী যদি না?"
আশরফ বললেন, "যদি না ঘরে খাবার আনিয়ে খায়"।
মাথুর বললেন, "তুষার স্যার বলছেন রফিক ব্রেকফাস্ট টেবিলে থাকে। সো লেটস সি"।
দুজনে রাস্তায় বেরোলেন।
সকাল থেকেই ঢাকার গুলশান এলাকা সচল হয়ে গেছে। মানুষজন রাস্তায় নেমে পড়েছেন। আশরফ বললেন, "ঢাকা আমার খুব ভাল লাগে। প্রাণ আছে"।
মাথুর বললেন, "জ্যামও আছে। তবে আমারও দারুণ লাগে। এখানকার খাবার সুপার্ব"।
আশরফ বললেন, "তুমি লাস্ট কবে লিপিড প্রোফাইল করিয়েছিলে হে? দেখেছো কোলেস্টেরল লেভেল টেভেল ঠিক আছে?"
মাথুর জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, "ক্ষেপেছো? ওসব দেখা মানেই রেস্ট্রিকশন চলে আসবে। আমি দেখি না"।
আশরফের ফোন বাজছিল।
আশরফ ধরলেন, "হ্যাঁ শুভ। আমরা বেরিয়েছি। তুমি কোথায়? এসে গেছো? ওকে। হ্যাঁ এই তো"।
একটা ইনোভা এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। আশরফ গাড়িতে উঠে পড়ে বললেন, "উঠে পড়"।
মাথুর উঠে বললেন, "ওহ! এই তোমার মর্নিং ওয়াক?"
আশরফ হাসলেন, "যে আগে ঘুম থেকে উঠবে, সেই তো আগে খবর পাবে, তাই না?"
মাথুর শুভকে চিনলেন, "আরে, কেমন আছো?"

শুভ সালাম দিল হাসিমুখে। বলল, “আপনার কাচ্চি হবে আজ মাথুর ভাই”।
মাথুর খুশি হয়ে বললেন, “আর কী চাই?”
গাড়ি খুব কম গতিতে এগোতে শুরু করল। শুভ বলল, “রফিক এই এলাকায় আছে সেটা জানার পরে অনেক রাজাকারদেরই এলাকায় দেখা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে তারা রফিকের সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী। রফিক খুব একটা পাত্তা দিচ্ছে না। তার প্ল্যান অন্য”।
আশরফ বললেন, “কী প্ল্যান কিছু জানা গেল?”
শুভ বলল, “জানোয়ারটার আসার মানে হল দেশের কোন না কোন মাদ্রাসা দখল করে ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হবে। অনেক হুজুরই আছে যারা পাকিস্তানপন্থী। আপনারা আশা করি খুব ভাল করে জানেন, এ দেশের স্বাধীন হওয়া অনেকেই ভালভাবে নেয় নি। এদের মধ্যে একটা বড় অংশ জামাতের সমর্থক। পজিটিভ দিক হল বাংলাদেশের সরকারে জামাতের প্রভাব কম। বঙ্গবন্ধুকে হত্যাকারী একটার পর একটা রাজাকারকে এই সরকার ধরে ধরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিচ্ছে। দে ডু হ্যাভ গাটস। কোন রকম ছাড়াছাড়ির ব্যাপার নেই। যত বয়সই হোক, আশি, বিরাশী, ধরা পড়লেই তাদের ফাঁসি হয়ে যাচ্ছে”।
আশরফ মাথা নাড়লেন, “এই খবরটা জানি। বাংলাদেশ ইজ ডুইং ট্রিমেন্ডাসলি ওয়েল এগেইন্সট দ্য পাকিস্তানীজ”।
শুভ বলল, “সমস্যা হল রিমোট এরিয়াগুলোতে বাংলাদেশী সরকার অতটা অ্যাক্টিভ হতে পারছে না। নোয়াখালি, সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রামের মত এরিয়াগুলোতে ওদের হাতে বেশ কিছু মাদ্রাসা এসেছে যেখানে ওরা ওদের অ্যাক্টিভিটি চালাতে পারছে। জেহাদী কাজকর্ম, ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা করে মানুষকে মাদ্রাসায় দাখিল করা চলছে”।
মাথুর বললেন, “এ তো ইন্ডিয়াতেও চলতে পারে। সব কি উপর থেকে বোঝা যায়?”
শুভ মাথা নাড়ল, “উহু, ইন্ডিয়াতে ইন্টেলিজেন্স অনেক বেশি স্ট্রং। তবে ইচ্ছাশক্তিটা তো ম্যাটার করে। বাংলাদেশের এই সরকার যতদিন থাকবে, ইন্ডিয়ার বেশি অসুবিধা হবার কথা না। আপাতত রফিককে এক্সপোজ করাটা ফার্স্ট প্রায়োরিটি হতে হবে। আপনাদের কী কী আর্মস লাগবে?”
মাথুর আশরফের দিকে তাকালেন। আশরফ বললেন, “রফিকের রুমে হিডেন ক্যামেরা লাগানো যাবে?”
শুভ অবাক হয়ে আশরফের দিকে তাকিয়ে বলল, “শেরাটনে? ওরে বাবা”।
আশরফ হাসলেন, “এটা আগে করতে হবে। নয়ত হানি ট্র্যাপ। যদিও ও একটা মেয়েকে নিয়ে আছে, ওকে আরো লোভ দেখাতে হবে। কী করে দেখাতে হবে, সেটা আমি ভাবছি। তুমি আপাতত আমাদের হোটেলের সামনে নামিয়ে দাও। আমাদের এখন ব্রেকফাস্ট টেবিলে ডিউটি”।
শুভ বলল, “ওকে”।
তাদের দুজনকে শেরাটনের সামনে নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা বেরিয়ে গেল।

১৩

ছত্রপতি শিবাজি টারমিনাস থেকে দুজন মধ্যবয়স্ক লোক ট্যাক্সি নিল। ট্যাক্সি চালক জিজ্ঞেস করল, “কোথায় যাবেন?”
একজন বলল, “দয়াসাগর আশ্রমে”।
মিটার চালু হল।
ট্যাক্সি চালক বলল, “তাহলে আমি আপনাদের গুরুভাই। আমাদের পরিবারের সবাই বাবার ভক্ত”।
প্রথম জনই উত্তর দিল, “আচ্ছা”।
ট্যাক্সি চালক বলল, “কোথা থেকে এসেছেন আপনারা?”
দুজন দুজনের দিকে তাকাল।

দ্বিতীয় জন বলল, “দিল্লি থেকে”।
ট্যাক্সি চালক বলল, “আমারও তাই মনে হচ্ছিল। আপনাদের দেখে মুম্বইয়ের বলে মনে হচ্ছে না”।
দ্বিতীয় জন সতর্ক গলায় বলল, “কোথা থেকে এসেছি মনে হচ্ছে?”
ট্যাক্সি চালক বলল, “ওই দিল্লিই। দিল্লির লোকজনের ড্রেস আপনাদের মত”।
দুজনে আশ্বস্ত হল।
ট্যাক্সি চালক বলল, “তবে আপনারা টিকিট নিয়ে এসেছেন তো? বাবাজীর আশ্রমে টিকিট ছাড়া ঢুকতে পারবেন না কিন্তু! অনেক ঝামেলা আছে এখন। সিকিউরিটি খুব কড়া হয়ে গেছে। আগের মত চাইলেই এখন ঢুকতে পারি না”।
“আছে”।
“ঠিক আছে”।
বক বক করে যাচ্ছিল ট্যাক্সি চালক। প্রথম জন মোবাইল বের করে পকেট থেকে একটা সিম নিয়ে সে মোবাইলে ঢোকাল। নেটওয়ার্ক আসতে কয়েক সেকেন্ড লাগল। প্রথম জন একটা এস এম এস করে সিমটা আবার ফোন থেকে বের করে নষ্ট করে ফেলল।
দয়াসাগর আশ্রমের গেটের বাইরে দুজনকে নামিয়ে দিয়ে ট্যাক্সি চলে গেল। বিরাট বড় গেট। তার এক কোণে একটা ছোট গেট। একজন গেটের কাছে গিয়ে দুটো টিকিট বের করে দিল।
ছোট গেটটা খুলে গেল।
দুজনে আশ্রমে প্রবেশ করল। অনেকটা অঞ্চল নিয়ে বাগান। ঘাসের বাগিচার উপর সুদৃশ্য ফুল ফুটে আছে। এক প্রান্তে বাবার নাম কীর্তন চলছে। রাস্তার দু পাশে আশ্রমিকরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।
দুজন হেঁটে মূল আশ্রম বিল্ডিংএর কাছে গেল।
আশ্রমের নিরাপত্তারক্ষীরা তাদের আটকাল।
এবার দ্বিতীয়জন আরো দুটো টিকিট বের করে তাদের দিল।
নিরাপত্তারক্ষীরা কৌতূহলী চোখে তাদের দুজনকে দেখে নিয়ে তাদের আশ্রমের প্রধান দরজায় নিয়ে গেল।
দরজা খুলে গেল।
দোতলা বিল্ডিং।
সিঁড়ি দিয়ে দুজনে উপরে উঠে গেল।
দোতলায় একটাই বড় ঘর। তারা পৌঁছনো মাত্র দরজা খুলে গেল।
হল ঘরে দশটা এসি চলছে। ঠান্ডায় জমাট বেঁধে যাচ্ছে যেন। গোটা ঘরে একজনই বসে আছে সাদা ধুতি, খালি গায়ে।
দয়া সাগর।
দুজনে ঘরে প্রবেশ করলে যারা দরজা খুলেছিল, তারা দরজা বন্ধ করে দিল।
দুজন দয়াসাগরের কাছে গিয়ে বসল। দয়াসাগর চোখ বন্ধ করে ছিল।
একজন দয়াসাগরের গালে চড় কষাল। এবার দয়াসাগর লাফ দিয়ে উঠল, “ইয়া আল্লা, ইতনা জোরসে কিউ মার রহে হো রশিদ?”
রশিদ অর্থাৎ প্রথমজন উঠে দয়াসাগরের গলা টিপে ধরে বলল, “তোকে বলা হয়েছিল স্টেশনে গাড়ি পাঠাবি। পাঠাস নি কেন?”
দয়াসাগর চিঁচিঁ করে বলল, “গাড়ি ছিল না। আমেরিকা থেকে ভক্তরা আসছে। তাদের নিতে গেছে”।
রশিদ দয়াসাগরের পেটে একটা লাথি মেরে বলল, “তোকে এদেশে আমেরিকান মেয়েদের সঙ্গে শোবার জন্য পাঠানো হয়েছিল? তোকে ধর্মগুরু হিসেবে ফান্ডিং কারা করেছিল, সব ভুলে গেছিস?”

দয়াসাগর বলল, "ঠিক আছে। এবার ছাড়ো ইয়ার। দিব্যি ভাল ছিলাম কতগুলো বুরবকের বাবা হয়ে। তোমরা আর ক'দিন দেরী করে আসতে! কী শাহিদ? কেমন আছো?"
শাহিদ চারদিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। বলল, "মানতে হবে। তোর ক্ষমতা আছে। নাহ রে রশিদ। এটাকে বেশি মারিস না। ভাল কাজ করেছে"।
রশিদ রাগী চোখে দয়াসাগরকে কয়েক সেকেন্ড দেখে ছেড়ে দিল।
বাবাজী ছিটকে মেঝেতে পড়ে চিঁচিঁ করতে লাগল।
রশিদ বলল, "খাবার আনা। খিদে পেয়েছে। গোস্ত কাবাব আর রুটির ব্যবস্থা কর"।
বাবাজী বলল, "ঠিক আছে। সব হয়ে যাবে। তোমরা বিশ্রাম কর"।
শাহিদ বলল, "সব ইন্তেজাম হয়ে গেছে তো? নইলে তোর ইন্তেকালের ব্যবস্থা হবে"।
বাবাজী বলল, "সব হয়ে গেছে"।
শাহিদ বলল, "তোর বউ বাচ্চাকে দেখতে ইচ্ছা করে না রে? করাচীতে ওরা কেমন আছে, কী করছে, কিছুই জানতে ইচ্ছে করে না আর? ভক্ত দিয়ে কাজ চলে যাচ্ছে?"
বাবাজী মাথা নাড়ল, "ফোন করি তো"।
শাহিদ বলল, "না, ফোন করিস না। তোর বউয়ের সঙ্গে দেখা করে আসছি। তোর কপালে বড় দুঃখ আছে"।
বাবাজী ক্লান্ত মুখে বলল, "আজই ফোন করছি"।

১৪
ইসলামাবাদ এয়ারপোর্ট।
রাত আটটা। সৌদিয়া এয়ারলাইন্সের একটা বিমান অবতরণ করল।
এয়ারপোর্টের সব প্রসিডিংস পেরিয়ে বীরেন যখন বেরোল, তখন ন'টা দশ। তার সঙ্গে কোন লাগেজ নেই। শুধু একটা ল্যাপটপের ব্যাগ। এয়ারপোর্টের বাইরে একটা লাল রঙের এস ইউ ভি দাঁড়িয়ে ছিল। বীরেন সেটায় উঠল। গাড়ি চলতে শুরু করলে এস ইউ ভির চালক পরিস্কার বাংলায় বীরেনকে বলল, "কোন অসুবিধা হয় নি তো আসতে?"
বীরেন চমকে বলল, "না। আপনিই সায়ক?"
সায়ক বলল, "আজ্ঞে। পাকিস্তানে তোমায় স্বাগত"।
বীরেন বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ স্যার"।
সায়ক বলল, "স্যার ট্যার বলতে হবে না। নাম ধরে ডেকো। শীত লাগছে?"
বীরেন বলল, "না"।
সায়ক বলল, "ভয়?"
বীরেন হাসল, "তা একটু একটু"।
সায়ক বলল, "এ কাজে দুটো জিনিস সামলে চলতে হবে। এক, এদেশে কাউকে বিশ্বাস করে কিচ্ছু বলবে না। এমন কী আমাকেও বিশ্বাস করবে না। দুই, বাড়ির জন্য মন খারাপ করবে না"।
বীরেন বলল, "আপনার বাড়ির জন্য মন খারাপ করে না?"
সায়ক বলল, "বাড়ি? ভুলে গেছি বাড়ি কেমন দেখতে। পিজা খাও তো? নাকি কাবাব ভাল লাগে?"
বীরেন বলল, "কাবাব"।
সায়ক বলল, "ভরপেট খেয়ে নাও। কাল ভোরে বেরোব"।
বীরেন বলল, "কোথায় যাব?"
সায়ক বলল, "ওহ, আরেকটা কথা। আমি কাল কী করব, আজ তোমাকে বলব না। এর কারণ হল, কোন কারণে তুমি ধরা পড়লে আমাদের প্ল্যান লিক হবার চান্স থেকে যায়। সুতরাং আপাতত বলছি না কোথায়

যাব। তোমার কাজ হবে কাল ভোর তিনটেয় উঠে তৈরী হওয়া।"
বীরেন বলল, "ঠিক আছে"।
সায়ক গাড়িটা একটা ঘিঞ্জি বাজারের বাইরে পার্ক করে বলল, "চলে এসো। ব্যাগটা রেখে এসো না আবার।"
দুজনে নামল।
বীরেন বলল, "গাড়িটা?"
সায়ক হাসল, "থাক। পরে দেখা যাবে"।
বীরেন কিছু বলল না। হাঁটতে হাঁটতে তারা একটা রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করল। সায়ক একগাদা কাবাব অর্ডার করে বলল, "আমিও অনেকক্ষণ ধরে না খেয়ে রয়েছি। যাক গে, তুষার স্যার ভাল আছেন তো?"
বীরেন চারদিকে দেখছিল।
তার মনে হচ্ছিল সে পুরনো দিল্লির চাঁদনি চকের কোন রেস্তোরাঁতে বসে আছে। কোন পার্থক্য নেই। দুটো দেশ একই ছিল এক কালে। তারপরে সব পাল্টে গেল।
সে বলল, "হ্যাঁ, স্যার ভাল আছেন"।
গরম গরম কাবাব এসে গেছিল। সায়ক বলল, "খেতে শুরু কর। বিখ্যাত গোস্ত কাবাব"।
বীরেন একটা কাবাব মুখে দিল। অসাধারণ স্বাদ। মুখে দিতেই যেন গলে গেল। সায়ক চোখ বন্ধ করে খেতে লাগল। টিভিতে দেখাচ্ছে পেশোয়ারের আফগান সীমান্তে তালিবানরা ঝামেলা করেছিল। পাকিস্তানী সেনা কয়েকজনকে আটক করেছে। করাচীর কাছের একটা গ্রামের গীর্জায় বিস্ফোরণ হয়েছে। আপাতত কোন সংস্থা দায় স্বীকার করে নি।
খাওয়া হয়ে গেলে সায়ক বিল দিয়ে বাইরে বেরিয়ে বলল, "পাকিস্তানে থাকলে এসবে অভ্যস্ত হয়ে যেতে হবে। অবশ্য ওদেশও আজকাল কম যাচ্ছে না। ধর্মের ব্যবসায়ীরা মানুষের ঘা খুঁচিয়ে কাজ হাসিল করে নিচ্ছে। তোমার বাবার জন্য কষ্ট হয় না বীরেন?"
বীরেন বলল, "না। অবিশ্বাস হয় শুধু"।
সায়ক বলল, "রাজাকারদের দেখলে অবিশ্বাস হবারই কথা। এরা একটা দেশে থেকে দেশের মানুষদের বিরুদ্ধে কাজ করে গেছে। ধর্মান্ধ এবং একইসঙ্গে মনুষ্যত্ববিরোধী। বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ খুনের পিছনে রাজাকাররাই দায়ী ছিল একাত্তর সালে। পাকিস্তান হেরে যাওয়ার পরেও তারা কম সক্রিয় ছিল না। তবে এদের একটা অংশ ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন দেশে। কেউ গুপ্তচর হল, কেউ বা সব ছেড়ে আলাদা জীবন যাপন করতে শুরু করল"।
একটা অটো নিল সায়ক। বীরেন গাড়িটার কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করল না।
খানিকক্ষণ বাদে একটা জায়গায় এসে অটোটা দাঁড়াল। সায়ক নেমে পড়ল।
এ জায়গাটা ঘিঞ্জি না। ঝকঝকে রাস্তাঘাট।
আরো খানিকক্ষণ হেঁটে একটা বাড়ির দরজা খুলে সায়ক বলল, "চলে এসো। তোমার আগমনের খবর পাঠিয়ে দি স্যারকে এবার। ভদ্রলোক আজ আমার গলা শোনার জন্য নিশ্চয়ই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন"।
বীরেন সায়কের সঙ্গে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করল। সায়ক আলো জ্বেলে বলল, "ফর ইওর ইনফরমেশন বীরেন, এই বাড়িটা এক পাকিস্তানী আর্মি অফিসারের। ভদ্রলোক লন্ডন গেছে। আমি দুদিনের জন্য ট্রেস পাসিং করলাম"।
বীরেন হেসে ফেলল। মাথুর ঠিকই বলেছিলেন, সায়কের কোন কাজেই অবাক হওয়া চলবে না।

সকাল সাড়ে সাতটা। রেস্তোরাঁর ব্যাংকোয়েট সেকশনে ব্যুফে ব্রেকফাস্ট চলছে। ফ্লোরে বেশ ভিড় হয়েছে। আশরফ একটা প্লেটে ব্রেড অমলেট নিয়ে খুব ধীরে খাচ্ছেন।

"আপনি কি কিছু মনে করবেন, আমি যদি এখানে বসি?"

একজন বেশ সুন্দরী ভদ্রমহিলা আশরফকে প্রশ্নটা করলেন।

আশরফ বললেন, "বসুন"।

ভদ্রমহিলা প্লেট নিয়ে আশরফের সামনে বসে সাহেবী ইংরেজিতে বললেন, "আপনাকে কাল দেখি নি। আপনি কি আজ চেক ইন করেছেন?"

আশরফ খাবারের লাইনের দিকে লক্ষ্য রেখে বললেন, "কাল রাতে এসেছি"।

"ওহ। আমি রুকসার। আমার বাবা বরিশালে থাকতেন। তার বাড়ি ভিজিট করতে এসেছি। আপনি বাংলাদেশী?"

আশরফ রুকসারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এত প্রশ্নের উত্তর দিতে ভাল লাগছে না। আমি বুঝেছি। দ্য কোড ইজ লাইফ ইজ বিউটিফুল"।

রুকসার চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, "দ্য ফল্ট ইন আওয়ার স্টারস। শুভর কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি স্যার"।

আশরফ বললেন, "আপনি চুপ করে খেয়ে যান। এই কথাগুলোই রফিকের সামনে বলতে হবে। বরিশালে যাবেন, কাউকে সঙ্গী পাচ্ছেন না। ওকে? আমাকে কেন বলে যাচ্ছিলেন? শুরুতে কোড বললেই হত।"

রুকসার চারদিকে তাকিয়ে বলল, "রিহার্সাল দিলাম একটু। আর কিছু না"।

আশরফ বললেন, "শুধু ব্রেড খাবেন আপনি? আর কিছু নিয়ে নিন"।

রুকসার বলল, "ওকে"।

আশরফ শুভকে ফোন করলেন, একবার রিং হতেই শুভ ধরল, "হ্যাঁ স্যার"।

আশরফ বললেন, "এই যে মেয়েটাকে পাঠিয়েছো, বিশ্বস্ত তো?"

শুভ বলল, "ভীষণ জোশ মেয়ে স্যার। চিন্তার কিছু নেই"।

আশরফ বললেন, "জোশ মেয়ে মানে? আমাদের কাজে লাগবে কি না বল। জোশ না কী এসব জেনে কী করব?"

শুভ বলল, "আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি স্যার। ভাববেন না। ও ঠিক সামলে নেবে"।

আশরফ বললেন, "তাহলেই ভাল"।

রুকসার এবার খানিকটা ফল নিয়ে আশরফের সামনে এসে বসল। আশরফ বললেন, "টার্গেট আসে নি। এলে একইভাবে আলাপ করবেন"।

রুকসার বলল, "স্যার আপনি শাহরুখ খানকে দেখেছেন?"

আশরফ হেসে ফেললেন, "দেখেছি। টিভিতে। কেন?"

রুকসার বলল, "আমার খুব ইচ্ছা শাহরুখ খানের মুখোমুখি হওয়া। অন্তত একটা সেলফি তুলতে পারলে আর বেঁচে না থাকলেও হবে"।

আশরফ বললেন, "তোমার ইংলিশ অ্যাক্সেন্ট খুব ভাল। যাই হোক রুকসার, টার্গেটের সঙ্গে কথা বলার সময় আবার এসব বলতে যেও না"।

রুকসার হাসল। বলল, "ভাববেন না স্যার। আমি ভাল। খুবই ভাল হয়ত। চিন্তা করবেন না"।

পরক্ষণে ফিসফিস করে বলল, "অ্যাকচুয়ালি আপনি ইন্ডিয়া থেকে এসেছেন বলেই বললাম"।

আশরফ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কাঁচের দরজা ঠেলে রফিক ঢুকল।

আশরফ বেশ কয়েক সেকেন্ড রফিককে দেখে সতর্ক গলায় বললেন, "দ্যাটস হিম। আমি বেরিয়ে যাচ্ছি রেস্তোরাঁ থেকে। আমাকে রিপোর্ট করবে কী হল"।

রফিক তবসসুমকে নিয়ে রেস্তোরায় প্রবেশ করে কোথাও না বসে সরাসরি টেবিল থেকে প্লেট তুলছিল। আশরফ চুপচাপ ব্যাংকোয়েট থেকে বেরিয়ে রিসেপশনে নিউজপেপারের আড়াল থেকে ব্লু টুথ স্পিকারে মাথুরকে ফোন করলেন, মাথুর আশরফের ফোনের অপেক্ষাতেই ছিলেন, উত্তেজিত গলায় বললেন, “শুয়োর স্পটেড?”
আশরফ চারদিক মেপে নিলেন। দুটো সোফা দূরে একজন বিদেশী যুবক খবরের কাগজ পড়ছে। রিসেপশনে দুজন বসে আছে। বেশ খানিকটা দূরে। চাপা গলায় বললেন, “স্পটেড”।
মাথুর চাপা উল্লাস করে উঠলেন। বললেন, “শুভকে বল এক গাড়ি এল এম জি দিয়ে যেতে। রামাধির সিংকে যেভাবে মেরেছিল, এই শুয়োরটাকে সেভাবে মারতে ইচ্ছে করছে”।
আশরফ বললেন, “ঠিক আছে। আমি মাথা ঠান্ডা করার চেষ্টা করছি। তুমি বেশি এক্সাইটেড না হয়ে স্যারকে খবর দাও। আমি দেখছি ও কোন ফ্লোরে, কোন রুমে আছে। আর প্ল্যান বি অ্যাক্টিভেটেড”।
মাথুর অবাক গলায় বললেন, “এত তাড়াতাড়ি?”
আশরফ বললেন, “হ্যাঁ, শুভ কর্মঠ ছেলে আমরা তো জানিই। তুমি স্যারকে ফোন কর”।
মাথুর বললেন, “এখনই করছি”।
আশরফ কাগজের আড়ালে বসে রইলেন। মিনিট খানেক পর ব্যাংকোয়েটের কাঁচের দরজা খুলে দেখলেন রফিক আর তবসসুমের টেবিলে রুকসার বসে হেসে গল্প করছে।
আশরফের মুখে হালকা একটা হাসি এসে সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল। তিনি রেস্তোরার দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে আবার কাগজ নিয়ে বসলেন।

১৬

বনগাঁ লোকাল থেকে শিয়ালদা স্টেশনে নেমে লোকটা ভিড়ের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে ফেলল। প্রচন্ড ভিড়। দাঁড়াতে দিচ্ছে না। ট্রেনে ওঠার ভিড় আর ট্রেন থেকে নামার ভিড় এক জায়গায় মিশে গিয়ে ব্যাপারটাকে আরো জটিল করে দিয়েছে।
স্টেশন এলাকা থেকে বেরনোর দরজায় টিটি দাঁড়িয়ে আছে। অফিস টাইমেও টিকিট চেক চলছে। টিটিকে টিকিট দিয়ে লোকটা হন হন করে স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে এল।
ভীষণ রোদ। লোকটা একটু ভেবে ফোন বের করল।
সিম পাল্টে ফোন করল। ও প্রান্ত থেকে একজনের গলা ভেসে এল, “কোথায়?”
লোকটা বলল, “শিয়ালদায়”।
“বাহ। তাড়াতাড়িই হল তো! আমি ভাবছিলাম এখনো বনগাঁতেই আছো বুঝি। বর্ডার পেরোতে অসুবিধা হয় নি তো?”
লোকটা বলল, “না”।
“কত গেল?”
“পাঁচ হাজার”।
“ভাল। ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসো”।
লোকটা ফোন রেখে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে গেল। গন্তব্যের নাম বলতে ট্যাক্সি চালক যে টাকা বলল তাতেই সে রাজি হয়ে ট্যাক্সিতে উঠল।
ট্যাক্সি স্টার্ট নিল। ঘন্টাখানেক পর এক বস্তির সামনে লোকটা নেমে চারদিকে দেখে বস্তিতে ঢুকে হাঁটতে শুরু করল।
মিনিট দশেক হেঁটে একটা ঝুপড়ির সামনে এসে আগের নাম্বারটাই রি ডায়াল করল। ও প্রান্তের লোকটা ধরে বলল, “ঢুকে যাও। দেখেছি”।

লোকটা ঝুপড়িতে প্রবেশ করল।
এক মাঝবয়সী লোক রান্না করছে। তাকে দেখে বলল, "আমার বাথরুমে জল আছে। স্নান করলে করে নাও"।
লোকটা বসে পড়ে বলল, "কোথায় যেতে হবে মল্লিকভাই?"
মল্লিক বলল, "এত তাড়া কীসের হাসান?"
হাসান বলল, "আজকের মধ্যে কাজ হলে ভাল। রমজান ভাই কালকে আবার সিলেট পাঠাবে। পুরো দৌড়ের মধ্যে আছি"।
মল্লিক বলল, "সিলেটে কী কাজ তোমার?"
হাসান বলল, "কাজের কী অভাব আছে? কে একজন লোক এসেছে, মাদ্রাসা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোমার আর কী? ভালই আছো। রান্না করছো, খাচ্ছো। চিন্তাই নেই কোন"।
মল্লিক বলল, "দূর থেকে দেখলে ওরকমই মনে হয়। এখানে কত কিছু বাঁচিয়ে থাকতে হচ্ছে বুঝলে এ কথা বলতে না। বাংলাদেশে আবার চিন্তা কী গো? কী এমন কাজ হয় ওখানে?"
হাসান বলল, "ঠিক আছে। কী করতে হবে বল"।
মল্লিক গ্যাসের আঁচ কমিয়ে হাসান যে খাটে বসে ছিল, তার তলা থেকে একটা ট্রাঙ্ক বের করে একটা প্যাকেট হাসানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, "এ নাও। এটা নিয়ে ফিরে গেলেই হবে"।
হাসান অবাক হয়ে বলল, "কোথাও যেতে হবে না?"
মল্লিক বলল, "কোথায় যাবে আবার? কিছু চেনো নাকি? আমিই ব্যবস্থা করেছি। খেলে খেয়ে যেতে পারো"।
হাসান বলল, "না না। তাহলে আমি চলে যাই"।
মল্লিক বলল, "যাও। আমার কী?"
হাসান বলল, "কাঁধে ঝোলাবার ব্যাগ আছে?"
মল্লিক ব্যাগ বের করে দিল।
হাসান ব্যাগে প্যাকেটটা ভরে নিয়ে বলল, "তাহলে আমি চলি"।
মল্লিক বলল, "এসো"।
হাসান বেরিয়ে একই পথে হেঁটে বড় রাস্তায় এসে ট্যাক্সির জন্য দাঁড়াল।
তার পাশে একটা লম্বা মত লোক এসে দাঁড়িয়ে বলল, "আগুন আছে?"
হাসান বলল, "নাই"।
লোকটা বলল, "সিগারেট খাবেন?"
হাসান বলল, "খাই না"।
লোকটা হাসানের কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "কী খাবেন?"
হাসান একটা ঝটকা দিয়ে লোকটাকে সরানোর চেষ্টা করল। হল না। লোকটা তার ঘাড় শক্ত করে ধরেছে।
হাসান চিঁ চিঁ করে উঠল, "ছাড়ান দ্যান। আমি কিছু করি নাই"।
লোকটা হাসানকে একটা জোরে চড় মেরে রাস্তায় ফেলে দিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বেশ কয়েকজন হাসানকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল।
লোকটা বলল, "চল বাবা। অনেক ভাল আদর করব তোকে"।
হাসান বিস্মিত চোখে দেখল মল্লিক ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্তে বিড়ি খাচ্ছে। সে বিড় বিড় করে বলল, "বিক্রি হইয়া গেসে কাফেরের কাছে"।
মুহূর্তের মধ্যে এন আই এর গাড়িতে হাসানকে তুলে নেওয়া হল।
গাড়িতে ওয়্যারলেসে একজন বলছে, "টার্গেট ক্যাপচারড। নেক্সট?"
"সেন্ড হিম টু দিল্লি"।

হাসানের বুকটা ঠান্ডা হয়ে গেল।

১৭

মাথুর হোটেলের রুমে উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করতে করতে আশরফকে বললেন, “রফিককে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। একে তুলে নিয়ে গিয়ে জেরা করলেই তো হত”!

আশরফ হতাশ গলায় বললেন, “তুষার স্যারের ইন্সট্রাকশন নেই। ওয়েট, ওয়াচ এন্ড ফলো আপাতত। চল বেরোই। তাছাড়া এখানে ওদের লোকও আছে। স্যার খুব একটা ভুল ডিসিশন দেন নি”।

মাথুর বললেন, “চল”।

দুজন বেরোলেন। হোটেল থেকে বেরিয়ে খানিকটা হাঁটার পর শুভর গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। তারা গাড়িতে উঠলেন।

রুকসার গাড়িতে বসে ছিল। তাদের দিকে তাকিয়ে হাসল।

আশরফ বললেন, “আপাতত শুভর ডেরায় যাওয়া যাক। সেখানেই কথা হবে”।

গাড়ি অনেকটা রাস্তা গিয়ে বুড়িগঙ্গার কাছে দাঁড়াল। নদীর তীরে সার দিয়ে নৌকো দাঁড় করানো।

শুভ পথ দেখিয়ে তাদের একটা নৌকোয় তুললে মাঝি দাঁড় বাওয়া শুরু করল।

শুভ বলল, “এবার বলুন, কী কী চাই”।

আশরফ বললেন, “রুকসার বলুক। কতটা কী পেরেছে”।

রুকসার বলল, “আপাতত রাতে ওর স্যুইটে ডেকেছে”।

আশরফ শুভর দিকে তাকালেন। শুভ বলল, “কোন সমস্যা নেই। ওকে কী করতে হবে বলুন”।

আশরফ বুক পকেট থেকে একটা ছোট চিপ বের করে রুকসারকে বললেন, “এটা সাউন্ড রিসিভার। এটা ওর রুমে ঠিক জায়গায় রাখতে হবে”।

রুকসার চিপটা নিয়ে তার পার্সে রেখে বলল, “হয়ে যাবে। আর?”

মাথুর বললেন, “তুমি যখন রফিকের সঙ্গে কথা বলছিলে, তবসসুমের অ্যাটিচিউড কেমন বুঝলে?”

রুকসার হাসল, “উনি একটুও হিংসুটে নন। খানিকটা রোবোটিক নেচার। উঠতে বললে উঠছেন, বসতে বললে বসছেন টাইপ”।

মাথুর বললেন, “দুজনে একই স্যুইটে আছে?”

রুকসার বলল, “হ্যাঁ”।

শুভ বলল, “যন্ত্র পাতি কী লাগবে?”

মাথুর বললেন, “কিচ্ছু না। আপাতত রুকসার সাউন্ড রিসিভারটা রাখুক। ক্যামেরা ইন্সটলেশনের জন্য সময় লাগবে। হোটেলে পরিচিত কেউ থাকলেই তো হবে না, সিসিটিভি অ্যাক্সেস বন্ধ করা অসম্ভব। রফিকের প্রতিটা মুভমেন্ট আমাদের রিপোর্ট করতে হবে”।

শুভ বলল, “ঠিক আছে। হয়ে যাবে তাও”।

রুকসার বলল, “মারাত্মক ওম্যানাইজার কিন্তু। আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছিল, যেন কতদিনের পরিচয়। আমি নিজেও খানিকটা অবাক হয়েছি। বয়স কম না এদিকে”।

আশরফ বললেন, “ঠিক আছে। বেস্ট অফ লাক। তুমি সাবধানে যাও”।

আশরফ আরো মিনিট কুড়ি ধরে রুকসারকে বুঝিয়ে দিলেন কী করে রিসিভারটা লুকিয়ে রেখে আসতে হবে। রুকসার পুরোটা বুঝে নিলে শুভ মাঝিকে নির্দেশ দিল নদীর পাড়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

শুভ একটা ক্যাবে তুলে দিল রুকসারকে। রুকসার চলে যেতে তারা নদীর পাড়ে চুপ করে দাঁড়ালেন।

আশরফের ফোন বাজল। আশরফ ফোনে কয়েক মিনিট কথা বলে শুভকে বলল, “এ দেশ থেকে এক অনুপ্রবেশকারী আজ এন আই এর হাতে ধরা পড়েছে। যেটুকু জানা যাচ্ছে, রফিক বাংলাদেশে নতুন কোন

ঘাঁটি খুঁজে বেড়াচ্ছে যেটা অবশ্যই ভারতীয় সীমান্তের আশে পাশে হবে"।
মাথুর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "সকাল থেকে শুধু মনে হচ্ছে শুয়োরটাকে ঝাঁঝরা করে দিই। কী করব, রফিক ইজ জাস্ট এ পার্ট অফ দেয়ার সিস্টেম। রফিক না থাকলে অন্য কেউ চলে আসবে। অগত্যা বেঁচে থাক!"
আশরফ বললেন, "বাহাত্তর হুর নিয়ে জন্নতে পার্টি করতে হবে বলে তৈরী হচ্ছে, ওর কপাল ভাল আমি ওকে ইন্ডিয়াতে পাই নি। পেলে উপরমহলের কারো কথা শুনতাম না"।
মাথুর বললেন, "রফিক ইন্ডিয়াতে ঢুকল, বাংলাদেশেও থানা গেড়ে বসে গেল, ওরা আবার বড় কিছু প্ল্যান করছে। কী হতে পারে? শুধু মাত্র ট্রেনিং ক্যাম্পে ওদের মন ভরবে বলে তো মনে হচ্ছে না"।
শুভ বলল, "ইসলামিক স্টেট, আই এস আইয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বলে একটা কথা শুনেছিলাম। রফিক ওদের হয়ে অপারেট করছে না তো?"
আশরফ বললেন, "সব কিছু হতে পারে। আই এস আই সব খানে আছে। হামাসের সঙ্গেও কাজ করছে, ইসলামিক ব্রাদারহুডেও আছে, কোন কিছু ওরা ছাড়ে না। আরেকটা টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন ছাড়া ওরা কিছুই না"।
শুভ বলল, "আপনারা দুজনে একটা করে রিভলভার ক্যারি করতেই পারেন। ব্যবস্থা করে দেব?"
আশরফ মাথা নাড়লেন, "নাহ, ছেড়ে দাও। আপাতত বসের ইন্সট্রাকশন ফলো করি। পরে দেখা যাবে। বাই দ্য ওয়ে শুভ, রুকসারকে কী বলে নিয়েছো?"
শুভ বলল, "রুকসার বেশ কয়েকটা অডিশনে ফেল করেছে। হিরোইন হতে চায়। ওকে বলা হয়েছে আপনারা নেটফ্লিক্স থেকে এসেছেন। কাস্টিং করবেন। রফিক আপনাদের রাইভাল। ওর ডিটেলস জানার জন্য রিসিভারটা ফিট করে দিয়ে আসতে হবে"।
আশরফ বললেন, "গুড গড। ও পারবে তো? এটা কি এথিকাল কাজ হল?"
শুভ বলল, "রিসিভারটা রেখে আসা নিয়ে কথা। নিশ্চয়ই পারবে। না পারার কোন কারণ দেখছি না। এথিকসের কোন প্রব্লেম হচ্ছে না যেহেতু ও নিজেই এখানে সব জেনেও কোন আপত্তি করে নি"।
আশরফ চিন্তিত মুখে কাঁধ ঝাঁকালেন, "লেটস সি"।

১৮

হোটেলে ফিরতে তুষার ফোন করলেন আশরফের ফোনে। আশরফ ধরলেন, "বলুন স্যার"।
তুষার বললেন, "রুমে আছো?"
আশরফ বললেন, "হ্যাঁ স্যার"।
তুষার বললেন, "স্পিকারে দাও"।
মাথুর টিভি দেখছিলেন।
আশরফ ইশারা করায় মাথুর টিভি বন্ধ করে দিলেন। আশরফ ফোনটা স্পিকারে দিলেন।
আশরফ বললেন, "বলুন স্যার"।
তুষার বললেন, "শেরাটন থেকে চেক আউট করে যাও"।
আশরফ বললেন, "ওকে স্যার"।
তুষার বললেন, "গুলশানে একটা বাড়ির ব্যবস্থা করা গেছে। তোমরা ওখানে থাকবে। রফিক ওখানে একা নেই। রফিকের সঙ্গে বেশ কয়েকটা রাঘব বোয়াল দেখা করতে আসবে। আই এস আইয়ের দুজন কাল ঢাকা পৌঁছবে। তোমাদের দুজনের মুখ ওদের চেনা। বলা যায় না তোমাদের রফিকও চিনতে পারে। এবার আমাকে বল হোটেল থেকে দূরে থেকে কীভাবে রফিকের সব কাজ জানা যাবে"।
আশরফ বললেন, "সাউন্ড রিসিভার আজ রাতে ইনস্টল হয়ে যাবে, যদি না অন্য কোন সমস্যা হয়"।

তুষার বললেন, "গুড। আর?"
আশরফ বললেন, "আর বলুন, আপনি কী চাইছেন। আপনি যেভাবে বলবেন, আমরা সেভাবে এগোব"।
তুষার বললেন, "দশ মিনিট সময় দাও। আমি আবার ফোন করছি"।
ফোন কেটে গেল।
মাথুর বললেন, "কাল তাহলে শুভকে কাচ্চি বিরিয়ানির কথা বলে দি?"
আশরফ হেসে ফেললেন, "সত্যি, তোমার এতক্ষণে এটা মনে হল?"
মাথুর বললেন, "তো কী মনে হবে? এখানে কাচ্চি আনা সমস্যা বলেই তো খাওয়া হচ্ছে না! একটু তো ভাল মন্দ খেতে চাই। এর বেশি আর কী চেয়েছি?"
আশরফ বললেন, "ঠিক আছে। ঢাকার সব দোকানের খাবার তোমাকে শুভ খাইয়ে দেবে। চিন্তা কোর না"।
মাথুর বললেন, "আই এস আইও ঢাকায় আসছে। কী ব্যাপার বল তো?"
আশরফ বললেন, "রফিক হল বুড়ো ঘুঘু। ও যেখানে থাকবে, সেখানে বড় বড় মাথারা আসবে সেটাই তো স্বাভাবিক। আজ ডিনার আমরা রুমে করব। স্যার যখন বলছেন আমাদের মুখটা সবার চেনা, তাহলে না বেরনোই ভাল"।
মাথুর বললেন, "তাই হোক"।
আশরফের ফোন বেজে উঠল। তুষার ফোন করছেন। আশরফ ফোনটা স্পিকারে দিলেন, "হ্যাঁ স্যার"।
তুষার বললেন, "একটা ছোট ইউনিট পাঠাচ্ছি। ওরাও তোমাদের সঙ্গে থাকবে"।
আশরফ অবাক হলেন, "ছোট ইউনিট? কেন স্যার?"
তুষার বললেন, "তোমাদের দুজনের পক্ষে বেশি ঝুঁকি হয়ে যাবে। রফিক যদি তার টিম ঢাকায় ডেকে নেয়, তাহলে আমরাও দলে ভারি হয়ে থাকব"।
মাথুর বললেন, "ঠিক আছে স্যার। কতজনের টিম আসবে?"
তুষার বললেন, "চার জনের। শুভকে বলে রাখো, ও একটা মাইক্রোবাস ঠিক করে দেবে। রফিক যদি ঢাকা ছেড়ে সিলেট বা চট্টগ্রামের দিকে যায়, তোমরাও ওকে ধাওয়া করবে"।
আশরফ মাথুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আর যদি রফিককে তোলার সুযোগ পাই? আপনি অর্ডার দিলে যশোর বর্ডার দিয়ে ইন্ডিয়াতে নিয়ে যেতে পারি জানোয়ারটাকে"।
তুষার বললেন, "তার জন্য অনেক সময় পড়ে আছে। অধৈর্য হচ্ছো কেন?"
আশরফ বললেন, "ঠিক আছে স্যার। ওরা কখন আসবে?"
তুষার বললেন, "আজ রাতে ঢুকে যাচ্ছে। তোমরা আজ রাতে চেক আউট করে যাও। হোটেল থেকে চেক আউট করে দেখবে বাইরে একটা কালো রঙের পাজেরো দাঁড়িয়ে আছে। নাম্বার ঢাকা ক ২৩১২। গাড়িতে উঠে যেও। পৌঁছে দেবে। ইউনিট জয়েন করে গেলে আমাকে মেসেজ করবে"।
আশরফ বললেন, "ওকে স্যার"।
ফোন রেখে দুজনে তৈরী হয়ে ব্যাগ নিয়ে হোটেলে চেক আউট করলেন। হোটেল থেকে বেরোতে মাথুর বললেন, "বাংলায় নাম্বার লেখা। খান তুমি বাংলা পড়তে পারো না?"
আশরফ বললেন, "হ্যাঁ। ওই যে গাড়িটা"।
রাস্তার উপরেই গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল। দুজনে গাড়িতে উঠতে গাড়ি স্টার্ট দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা বড় গেটের সামনে গাড়িটা দাঁড়াল। গাড়িটা হর্ন দিতে গেট খুলে গেল। মাথুর চাপা গলায় বললেন, "এখনই শুভকে ফোন কর। কাচ্চি মাস্ট আজ রাত্রে"।
আশরফ হেসে ফেললেন।
#
বাড়িটা খুব বড়। ঝকঝক করছে ঘরগুলো।

আশরফ দেখে শুনে বললেন, “শেরাটনের থেকেও বেশ বড় ব্যাপার হে। এরকম অবস্থা বাংলাদেশেই সম্ভব। পাকিস্তান হলে কোন গর্তে ঢুকে থাকতে হত”।

শুভ কিছুক্ষণ পরে এসে পৌঁছল। বলল, “সাউন্ড রিসিভার ইন্সটল হয়েছে নাকি দেখে নিন। রুকসার অনেকক্ষণ হল শেরাটনে গেছে”।

আশরফ কানে হেডফোন দিয়ে ফোন চালু করলেন। মাথুর আগ্রহী গলায় বললেন, “দেখি দেখি”।

আশরফ মাথুরকে দিলেন হেডফোনটা। কয়েক সেকেন্ড শুনেই মাথুর তড়িঘড়ি আশরফকে হেডফোনটা ফেরত দিয়ে বললেন, “ধুস! তুমি এটা আমাকে শোনালে?”

আশরফ শুভর দিকে তাকালেন, “রুকসার এখন রফিকের বেডরুমে”।

শুভ বলল, “বুঝেছি। রফিকের বিশ্বাস পেতে ও সবটা পথ যাবে। আপনাকে আগেই বলেছি”।

আশরফ মাথুরের দিকে তাকালেন। মাথুর বললেন, “সবটা নিতে পারি না। এই জানোয়ারটার সঙ্গে এই বাচ্চা মেয়েটাকে পাঠানো...”

শুভ বলল, “কেউ পাঠায় নি। ও নিজে কাজটা করতে চেয়েছে। আপনি এত আপসেট হচ্ছেন কেন? হানি ট্র্যাপ আগে ইউজ করেন নি?”

মাথুর বললেন, “ঠিক আছে। লিভ ইট। রুকসার ঠিক ঠাক ফিরুক, এটাই চাইব”।

আশরফ বললেন, “কাল সকাল থেকে রফিকের লোকজন রুকসারের উপর নজর রাখবে। ওদের র‍্যাডার রুকসারের উপর অবশ্যই যাবে। আই এস আই ঢুকছে ঢাকায় শুভ। এখানে ওদের কে কে আছে?”

শুভ বলল, “প্রচুর লোক আছে। রাজাকারদের বেশিরভাগই পাকি শুয়োরদের পা চাটার জন্য সব সময় তৈরী। সে বুদ্ধিজীবিই বলুন বা সাধারণ মানুষ। এ দেশে এখনও অবৈধ পাক বীর্যের প্রচুর সন্তান ঘুরে বেড়াচ্ছে”।

আশরফের ফোন বেজে উঠল।

আশরফ ধরলেন। ও পাশ থেকে ভেসে এল, “স্যার সোহান বলছি। ঢাকায় ল্যান্ড করলাম। আমাকে লোকেশনটা সেন্ড করুন। গাড়ি নিয়ে চলে আসছি আমরা”।

আশরফ বললেন, “শিওর। চলে এসো”।

ফোন রেখে সোহানকে লোকেশন পাঠালেন আশরফ।

শুভ বলল, “ক’জন আসবে স্যার”?

আশরফ বললেন, “চারজন। মানে আমরা ছ’জন”।

শুভ বলল, “ঠিক আছে স্যার। আমি তাহলে খাবারের ব্যবস্থা করছি”।

মাথুর বললেন, “কাচ্চি কবে খাওয়াবে বল তো?”

শুভ হেসে ফেলল, “আজকেই খাবেন?”

মাথুর বললেন, “মন্দ হয় না”।

শুভ বলল, “ব্যবস্থা করছি। আমি ছ’জনের খাবারের ব্যবস্থা করছি। আর হ্যাঁ, আপনারা যখন এই বাড়ি থেকে বেরোবেন, আমাকে একটা মেসেজ করে দেবেন। কখন কার নজর পড়বে সেটা বলতে পারছি না, তবে একটু দেখে। বাংলাদেশ আপনাদের বন্ধু রাষ্ট্র হলেও সবাই কিন্তু বন্ধু নয়। শত্রুও কম নেই”।

আশরফ বললেন, “জানি। সাবধানে যেও”।

শুভ বেরিয়ে গেলে মাথুর বললেন, “এটা কী হল?”

আশরফ বললেন, “কী?”

মাথুর বললেন, “ঐ মেয়েটাকে রফিকের বেডরুমে পাঠিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল? ওটুকু মেয়ে!”

আশরফ ম্লান হাসলেন, “কেন আমাকে অস্বস্তিতে ফেলছো বল তো? রেহাই দাও প্লিজ”।

মাথুর কাঁধ ঝাঁকালেন।

আশরফ বললেন, “তোমাকে একটা স্ট্যাটস দিই? ৭২ এর যুদ্ধে পাকিস্তানী সেনারা কয়েক লক্ষ বাংলাদেশী মা বোনকে ধর্ষণ করেছিল। শুধু মাত্র সংখ্যালঘু হিন্দু নয়, মুসলিম মেয়েদেরও। বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটার পর একটা পাকিস্তানী আর্মি যথেচ্ছভাবে রেপ করেছিল ওদের। সেই ক্ষত থেকে বাংলাদেশ এত বছর পরেও উঠে দাঁড়াতে পারে নি। বাঙালিদের একাংশ পাকিস্তানীদের এখনও প্রবল ঘৃণা করে। সেই দুঃস্বপ্ন ভুলবার জন্য ওরা শেষ অবধি যেতে পারে। প্লিজ ট্রাই টু বি এ রোবোট মাথুর সাব”।
মাথুর বললেন, “হু। ঠিক আছে। আমিও বুঝি। তবু মেনে নেওয়া যায় না। কেন জানি না, এই রফিকের নাম শুনলে আমার মাথা গরম হয়ে যায়”।
আশরফ বললেন, “যারা নিরীহ মানুষদের কোন রকম চিন্তা ভাবনা না করে মেরে ফেলতে পারে, তাদের নাম শুনলে মাথা গরম না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। লিভ ইট। সোহানরা আসুক। আমাদের নেক্সট গেম প্ল্যান তৈরী করতে হবে”।
মাথুর বললেন, “ওকে”।

১৯

রফিকের হাঁফ ধরে যায় আজকাল। তার প্রিয় শিকার বাঙালি মেয়ে। পূর্ব পাকিস্তানের মেয়েদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানীদের আলাদা আকর্ষণ।
আগে হলে রুকসারের বয়সী মেয়েদের তিন চারজনকে কাবু করে ফেলত। এখন পারল না। নগ্ন রুকসারকে পেয়ে অতি উত্তেজিত হয়ে হাঁফ ধরে গেল। যৌন মিলন শুরু হবার আগেই শেষ হয়ে গেল।
রুকসার বিদ্রুপের গলায় বলল, “আপনার বয়স হয়ে গেছে”।
রফিক খাটের পাশে রাখা বোতল থেকে জল ঢালল গ্লাসে। এক নিঃশ্বাসে এক গ্লাস জল খেয়ে বলল, “আমাকে সময় দাও। বয়স হয়েছে নাকি বুঝিয়ে দেব”।
রুকসার রফিকের কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, “আপনার স্ত্রী কিছু মনে করছেন না, আমাকে এই ঘরে এনে দরজা বন্ধ করলেন বলে?”
রফিক বলল, “তোমাকে কে বলেছে ও আমার বউ?”
রুকসার ফিক করে হাসল, “ওরও বুঝি আমার মত একা একা দেশ দেখতে ইচ্ছে করেছে?”
রফিক বলল, “ধরে নাও তাই। তুমি কোথায় থাকো যেন? আমি ভুলে গেলাম”।
রুকসার বলল, “বার্লিনে থাকি। তবে আই সোয়ার, আপনার মত হ্যান্ডসাম আমি জার্মানিতে দেখি নি। শুধু জনাব হাঁফিয়ে যান তাড়াতাড়ি”।
রফিক টিভি চালাল। নগ্ন নিম্নাঙ্গের উপরে কম্বল জড়িয়ে নিয়ে বলল, “সিলেট যাবে আমার সঙ্গে? তারপরে না হয় তোমার বরিশালে যাব একদিন?”
রুকসার বলল, “অ্যাজ ইউ উইশ। যাব”।
রফিক খুশি হল, “গুড। নাও ডান্স। ডান্স পারো?”
রুকসার বিনা বাক্যে উঠে পড়ল। বলল, “মিউজিক?”
রফিক রিমোট দিয়ে চ্যানেল পাল্টে মিউজিক চ্যানেলে দিল। কোথাও গান হচ্ছে না। সব খানে বিজ্ঞাপন। বিরক্ত মুখে রফিক বলল, “নাচতে হবে না। পাশে বস”।
রুকসার রফিকের পাশে বসল। রফিক বলল, “বরিশালের কোথায় তোমার বাড়ি ছিল?”
রুকসার বলল, “শহরেই”।
রফিক বলল, “বাবার নাম কী তোমার?”
রুকসার বলল, “সাহিন আলম”।
রফিক বলল, “হু। তুমি জানো আমি কে?”

রুকসার বলল, “খুব হ্যান্ডসাম একজন পুরুষ। আর কী জানার দরকার আছে কিছু”?
রফিক বলল, “আছে। আমার সম্পর্কে কিছু জানো না তুমি”।
রুকসার হাসল, “আপনি খুব মিস্টিরিয়াস একজন মানুষ”।
রফিক এই কথায় খুশি হল। রুকসারের কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, “হোয়েন আই ফার্স্ট কেম টু দিস এরিয়া, আই ওয়াজ টুয়েন্টি। আমাকে জোর করে পাঠানো হয়েছিল। পাতি সেন্ট্রি ছিলাম। কাজ ছিল গ্রামে গ্রামে রেবেল খুঁজে বেড়ানো। আর আমরা কী করতাম জানো? গ্রামের মেয়েদের তুলে নিয়ে যেতাম”।
রুকসার জোর করে হেসে উঠল খিলখিল করে, “তারপর কী করতেন?”
রফিক বলল, “এক্সপেরিমেন্ট। আমার কাজ ছিল এক্সপেরিমেন্ট করা। রাজশাহীতে একটা মেয়ের খোঁজ পেয়েছিলাম, যার কাছ ছিল আমাদের বাহিনী সে এলাকার বাইরে এলেই মুক্তিবাহিনীকে খবর দিত। সে মেয়েটার ভারি মজার হাল করেছিলাম আমরা”।
রুকসার স্বাভাবিক গলায় বলল, “কী করেছিলেন?”
রফিক বলল, “ফিফটি মেন, ওয়ান টিনেজ গার্ল। উই রেপড হার টিল হার লাস্ট ব্রেথ। তারপর ওর যৌনাঙ্গে পাথর গুঁজে দিয়ে গ্রামের বাইরে গাছে ওর বডি টাঙিয়ে দিয়েছিলাম। আমরা ছিলাম বাঙালিদের ত্রাস। আমার নামে কাঁপত ইস্ট পাকিস্তান”।
রুকসার বলল, “আপনি আর্মিতে ছিলেন? হাউ ইন্টারেস্টিং। আমার বাবাও পাকিস্তান সাপোর্টার ছিল”।
রফিক বলল, “একজন সাচ্চা পাকিস্তানীর তাই তো হওয়া উচিত। আমি এখনো এই দেশটাকে বাংলাদেশ বলি না। ইস্ট পাকিস্তানই বলি। দুনিয়া জুড়ে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা হবে আর ইস্ট পাকিস্তান সেখানে পিছিয়ে থাকবে, তা হয় নাকি?”
রুকসার বলল, “হয় না। আমি আপনাকে সাপোর্ট করি”। রুকসার রফিকের কান কামড়ে তাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করল।
রফিক রুকসারকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলল, “লুক গার্ল, আমার বয়স হয়েছে। কিন্তু আমার পৌরুষের বয়স এখনো হয় নি। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, এর প্রমাণ তোমাকে দেবোই আমি। নাও লেট মি স্লিপ। আমার অনেক কাজ আছে কাল”।
রুকসার বলল, “জি জনাব। যেমন আপনার মর্জি”।
রফিক রুকসারের পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।
রুকসারের ঘুম এল না। তার দু চোখ জ্বলছিল।

২০

সোহান, ড্যানি, গুরদীপ এবং ভেঙ্কট।
চারজন পৌঁছে রিপোর্ট করেছে তাদের। আশরফ ওদের খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়তে বলেছেন। ওরা দোতলার ঘরে ঘুমিয়েছে। ভোর রাত অবধি আশরফ জেগে রইলেন।
শেরাটন থেকে আসা প্রতিটা শব্দ শোনার চেষ্টা করলেন।
মাথুর ভোরে উঠে আশরফকে বললেন, “না ঘুমোলে এনার্জি আসবে কী করে?”
আশরফ বললেন, “মেয়েটা ফিরুক। তারপর ঘুম হবে। চিন্তা হচ্ছে”।
মাথুর বললেন, “কেন ফিরবে না? কী নিয়ে ডাউট হচ্ছে তোমার?”
আশরফ বললেন, “ডাউটের কিছু নেই। আমি জানি, মেয়েটা বাহাদুর আছে। ঠিক ফিরে আসবে। তবু রফিক একটা নরকের কীট। এসব লোকের কাছে আমাদের মেয়েদের পাঠালে গিল্ট ফিলিংস কাজ করে। আমরা খুব একটা ভাল কাজ করি না, বল মাথুর?”

মাথুর কাঁধ ঝাঁকালেন, “আমাদের সেই কাজ করতে হবে, যেটা আমাদের দেশের জন্য ভাল। পিছনে তাকানোর জায়গা নেই”।
ফজরের নামাজের প্রস্তুতি নিলেন আশরফ। মাথুর আশরফের পিঠে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে আবার ঘরে ফিরলেন।
আশরফের প্রার্থনা সম্পন্ন হলে মাথুর বললেন, “আজ হঠাৎ রিলিজিয়াস হলে?”
আশরফ বললেন, “নিজের গিল্ট ফিলিংসটা উপরওয়ালার সঙ্গে শেয়ার করলাম। তুমিও ফিরে গঙ্গা স্নান কোর। পাপ কম হবে”।
মাথুর বললেন, “রফিকের রক্তে স্নান করতে পারলে ভাল গঙ্গা স্নান হত। কী বল?”
আশরফ হাসলেন, “তুষার স্যার একবার শুধু নির্দেশ দিক। তারপর রফিকের বারোটা বাজাবো”।
আশরফ কানে হেডফোন লাগালেন। কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।
কয়েক মিনিট পরে শুভকে ফোন করলেন। শুভ ঘুমোচ্ছিল। বেশ কয়েকবার রিং হবার পর ধরল, “হ্যাঁ স্যার”।
আশরফ বললেন, “রুকসার বেরিয়েছে?”
শুভ একটু থমকে গিয়ে বলল, “না তো। বেরোয় নি। কেন স্যার”?
আশরফ বললেন, “ও বেরোলে আমাকে জানিও। আমি মাঝরাতের পর থেকে সেরকম কোন সাউন্ড পাই নি আর”।
শুভ হেসে উঠে বলল, “ওই বুড়োর কী ক্ষমতা আছে স্যার? ঘুমিয়ে পড়েছে দেখুন”।
আশরফ বললেন, “তবু। সতর্ক থাকবে। কোন রকম আপডেট পেলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ইনফর্ম করবে”।
শুভ বলল, “ঠিক আছে স্যার”।
কম্যান্ডোরা উঠে পড়েছে সাড়ে চারটেতেই। বাড়ির সামনের ছোট বাগানে দৌড় শুরু করেছে। আশরফ মাথুরকে বললেন, “ওদের দেখো। শেখো। সারাক্ষণ ঘুমাচ্ছো আর খাচ্ছো। যাও, দৌড়াও”।
মাথুর বললেন, “কেন দৌড়বো না। আমি কত ফিট দেখবে?”
কয়েক মিনিটের মধ্যে মাথুর বাগানে দৌড় শুরু করলেন। বেশ কিছুক্ষণ ব্যায়াম করে এসে ঘেমে নেয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, “কী সর্বনাশ! প্র্যাকটিস একবারে কমে গেছে। হাল ভাল না”।
আশরফ বললেন, “সে তো জানি। ভাল হয়েছে। রোজ সোহানদের সঙ্গে উঠে দৌড় শুরু করবে”।
মাথুর পরনের জামা খুলে ফেললেন। বললেন, “এই চারজনই পুঞ্চে ছিল। সেখান থেকে এখানে জয়েন করল। চার জন চারশো জনের সমান। কে বলবে ওই টেম্পারেচর থেকে এসেছে। দেখে মনে হচ্ছে?”
আশরফ বললেন, “ওদের থেকে ইন্সপিরেশন নিয়ে ফিট হয়ে যাও। তুমি কিন্তু অনেক হালকা দিয়ে দিয়েছো এখন”।
মাথুর বললেন, “ঠিকই। হালকা দিলে চলবে না। দেখা গেল তোমরা সব বেঁচে গেলে, আর আমি ফেঁসে গেলাম”।
আশরফ বললেন, “না দোস্ত, আমি বেঁচে থাকলে তোমার গায়ে হাত দেওয়ার সাধ্য কারো নেই। যাই হোক, রফিক সিলেট যাওয়ার প্ল্যান করছে”।
মাথুর বললেন, “সিলেটে কী ভাল ডিশ পাওয়া যায়?”
আশরফ বললেন, “জানি না। শুভকে জিজ্ঞেস করতে হবে”।
মাথুর বললেন, “অনেক এক্সারসাইজ হয়ে গেল। আজকেই সিলেটে যাব নাকি?”
আশরফ মাথা নাড়লেন, “জানি না। রফিকের উপর ডিপেন্ড করছে। ও আজ গেলে আমরাও আজই যাব”।
মাথুর বললেন, “ঠিক আছে। এরা তো ছোলা টোলা খাবে মনে হয়। তুমি কী খাবে ব্রেকফাস্টে?”

আশরফ বললেন, “আরে ইয়ার এখনো ঠিক করে ভোরের আলো ফোটে নি। তুমি খাওয়ার চিন্তা শুরু করে দিলে?”
মাথুর বললেন, “দৌড় করালে যে? আচ্ছা আমি দেখি ফ্রিজে কী আছে”।
মাথুর ফ্রিজের দিকে দৌড়লেন।
আশরফ কানে হেডফোন দিলেন।

২১
সকাল সাতটা।
আশরফ পায়চারি করছেন।
রফিকের ঘরের সাউন্ড রিসিভার থেকে কোন রকম শব্দ আসছে না।
মাথুর বললেন, “চিন্তা কোর না। বুড়ো ঘুমোচ্ছে আর কী”।
আশরফ বললেন, “আরে কিছু তো সাউন্ড আসবে। নাক ডাকার সাউন্ড এলেও তো বুঝব ঠিক আছে সব”।
ফোন বাজতে শুরু করল আশরফের।
আশরফ দেখলেন শুভ ফোন করছে। তাড়াতাড়ি ধরলেন, “বল শুভ”।
শুভ বলল, “স্যার, একটা ব্যাড নিউজ আছে”।
আশরফ বললেন, “কী ব্যাড নিউজ? রফিকের ঘরের রিসিভারটা নষ্ট হয়ে গেছে না রুকসার ধরা পড়েছে?”
শুভ বলল, “না স্যার। রফিক ইজ ডেড স্যার”।
আশরফ চোখ কপালে তুলে বললেন, “হোয়াট?”
মাথুর নড়ে চড়ে বসলেন, “কী হল?”
শুভ বলল, “রুকসারকে পাচ্ছি না। পালিয়েছে সম্ভবত”।
আশরফ বললেন, “ঠিক আছে। রুকসারকে পাচ্ছো না মানে কী বলতে চাইছো? আর একটা কথা, উই নিড টু লিভ দিস প্লেস।”
শুভ বলল, “বেরিয়ে যান স্যার। পেছনে একটা ছোট দরজা আছে। আমি এখনই গাড়ি নিয়ে আসছি। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকবেন”।
আশরফ বললেন, “ওকে। এসো”।
ফোন কেটে আশরফ মাথুরকে বললেন, “এখনই বেরিয়ে যেতে হবে। সোহানদের বলে দাও। চল চল”।
মিনিট তিনেকের মধ্যে বাড়িটার পেছনের দরজা দিয়ে বেরোলেন তারা। মাথুর বললেন, “রুকসারের কোন বিপদ হয়েছে? কী হয়েছে বলবে তো?”
আশরফ তুষারের ফোনে চেষ্টা করছিলেন। লাইন বিজি বলছে। মাথুরকে বললেন, “রফিক মরে গেছে। রুকসারই মেরেছে মনে হচ্ছে। তারপর রুকসারকে শুভ খুঁজে পাচ্ছে না”।
মাথুর বললেন, “গুড গড। রুকসারই নাম তো মেয়েটার? ডাবল এজেন্ট না তো?”
সোহানসহ বাকি তিনজন কম্যান্ডো চুপ চাপ তাদের সঙ্গে হাঁটছিল।
ফুটপাথে একটা গাছের তলায় দাঁড়ালেন আশরফ। সবাইকে দাঁড়াতে বললেন।
বললেন, “এখানেই অপেক্ষা করা যাক। রুকসার ডাবল এজেন্ট কি না জিজ্ঞেস করছো কেন?”
আশরফ এবার তুষারকে ফোনে পেলেন। খবরটা শুনে তুষার কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, “সামথিং ইজ ভেরি ফিশি”।
আশরফ বললেন, “আমরা কী করব স্যার? ঢাকায় থাকবো না বেরিয়ে যাবো?”
তুষার বললেন, “থাকবে। শুভকে বল কোন একটা সেফ হাউজে নিয়ে যেতে। উই নিড টু ওয়েট ফর দেয়ার রিয়্যাকশান। রুকসারের ব্যাপারে যা যা জানার জানতে শুরু কর। আর রফিকের সঙ্গে আরেকটা মেয়ে

এসেছিল। হ্যাঁ, তবসসুম ওর নাম, ওর কী খবর আছে?”
আশরফ বললেন, “না স্যার। জেনে জানাচ্ছি”।
শুভর গাড়ি এসে গিয়েছিল।
তারা গাড়িতে উঠে বসলেন।
আশরফ বললেন, “তুষার স্যার বললেন কোন সেফ হাউজে নিয়ে যেতে। তবসসুমের ব্যাপারেও জানতে চাইছেন”।
শুভ বলল, “ওকেও মেরে দিয়েছে রুকসার। দুজনকেই”।
আশরফ বললেন, “তুমি কী করে খবর পেলে? কে জানাচ্ছে তোমায়?”
শুভ বলল, “স্যার শেরাটনে লন্ড্রিতে আমাদের লোক আছে। ওকে তো নজর রাখতেই বলেছিলাম। সাড়ে ছ’টা নাগাদ ও গিয়ে দেখছে রফিকের ঘরের দরজা হাট করে খোলা। ঘরে ঢুকে দেখছে দুজন দুটো ঘরের খাটে পড়ে আছে। দুজনেরই গলার কাছে কাটা দাগ। ওদের ঘুমন্ত অবস্থায় রুকসার ওদের মেরে বেরিয়ে গেছে”।
আশরফ শুভকে বললেন, “আমাকে ঠিক করে বল শুভ। রুকসারের সম্পর্কে তুমি কতটা জানো?”
শুভ বলল, “আপনি ভাল করেই জানেন স্যার, আমাদের এজেন্টদের লাইফে কতগুলো শেড থাকে। রুকসার কালকে অবধি আমার কথা শুনে কাজ করেছে। এখন কেন আমাদের কোন রকম ইন্সট্রাকশান ছাড়াই এ কাজ করল, সেটা কী করে বলব?”
আশরফ বললেন, “তুমি সিসিটিভি চেক্ করতে বল। ঠিক কখন রুকসার হোটেল থেকে বেরিয়েছে, বেরিয়ে কোন ট্যাক্সি ধরেছে কি না, জানার চেষ্টা কর”।
মাথুর বললেন, “রফিক মরেছে, সেলিব্রেট করা উচিত তো। আজকে কাচ্চি হবে তো শুভ”?
আশরফ কড়া চোখে মাথুরের দিকে তাকালেন।
মাথুর হাসলেন, “ক্যা ইয়ার। হোয়াই সো সিরিয়াস?”

২২

রশিদ আর শাহিদের জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসি চালিয়ে দুজনে শুয়ে টিভিতে হিন্দি সিনেমা দেখছিল।
রশিদ বলল, “কত বড় দেশ, কতগুলো শহর। চাচাজান ঠিকই বলেন। আমরা ইন্ডিয়ার উপকারই করছি। এত লোকের বেঁচে থাকার দরকার কী?”
শাহিদ জোরে হেসে উঠল।
রশিদ বলল, “কম শব্দ করে হাস ভাই। আমাদের বাবার ভক্তরা ভয় পেয়ে যাবে। এই ধর্মও কী জিনিস ভাই, একটা মুসলমান এসে হিন্দুগুরু সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবাই তার পায়ে পড়ে যাচ্ছে। হা হা হা”।
শাহিদ বলল, “আমাদের কাজটা ওর জন্য সোজা হয়ে গেছে। এখন আর নৌকোয় করে এদেশে আসার দরকার পড়বে না। চাচাজান জিন্দাবাদ”।
রশিদ বলল, “চাচাজান টেস্ট প্লেয়ার। ওই আছে না, ইন্ডিয়ার, রাহুল দ্রাবিড় টাইপ। লম্বা ভাবে”।
শাহিদ বলল, “ভাই, রাহুল দ্রাবিড় ব্যাঙ্গালোরের লোক না?”
রশিদ বলল, “হবে হয়ত”।
শাহিদ বলল, “যদি আমাদের হাতে দ্রাবিড় মরে যায়, তো?”
রশিদ বলল, “পার্টি হবে”।
শাহিদ বলল, “আর মুম্বইতে হলে শচীন”।

রশিদ বলল, "বলিউড আছে। মৌজা হি মৌজা"।
দরজায় নক হল।
রশিদ উঠে দরজা খুলল।
দয়াসাগর বাবা ঘরের ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ করল।
খাটে বসল।
শাহিদ আর রশিদ বাবার দিকে তাকিয়ে খিক খিক করে হাসতে লাগল। শাহিদ বলল, "শালা, পুরো কাফের লাগছে তোকে বাশার"।
বাশার বলল, "হাসির সময় নেই। কাজের কথা বলি। আমাকে সব ঠিক করতে হয়েছে এ ক'দিন ধরে"।
শাহিদ বলল, "আমরা তো এখন হাসব। তুই কাঁদবি। দিব্যি ছিলি বল? বউ বাচ্চা সব ভুলে... আহাহা কত সেবিকা"।
বাশার এবার রেগে গেল, "আর ভাল লাগছে না। আমি আমার কাজ ঠিক করেই করেছি। নইলে তোমরা এখানে কিছুতেই পৌঁছতে পারতে না। এবার ঠিক করে কথা বল"।
শাহিদ বলল, "শুনতে হবে। আমরা এখানে মরতে পারি যে কোন সময়। আর তুই থাকবি আনন্দে। কেন কথা শুনবি না?"
বাশার বলল, "চাচাজান যা বলবেন, আমাদের তাই শুনতে হবে। কোনটাই আমার ইচ্ছেমত হচ্ছে না। প্রথমে তো তোমারই এ দেশের আসার কথা ছিল। তুমি আসবে না বলেই আমাকে পাঠানো হয়েছিল"।
রশিদ বলল, "ঠিক আছে। তোকে আর রাগাবো না। তোর কাজে আমরা খুশি। আমাদের জন্য কী ব্যবস্থা করা হয়েছে, বল এবার"।
বাশার বলল, "আমাদের কাল ব্যাঙ্গালোরে সভা আছে। পরের দিন চেন্নাই। নেক্সট হায়দ্রাবাদ। আমি ফিরে এলে তোমরা মুভ করবে। যদি মুম্বইয়ের বাইরে যেতে হয়, যাবে"।
রশিদ বলল, "আমাকে আগে বলিস নি কেন? এতদিন কী করব?"
বাশার বলল, "গাড়ি ঠিক করা আছে। মুম্বই ঘুরবে। ভাল ভাল জায়গা আছে, আমি ব্যবস্থা করে রেখেছি। সেখানে যাও, ফুর্তি কর।"।
শাহিদ বলল, "আমরা এখানে ফুর্তি করতে আসি নি। তুই ঘুরে বেড়াবি, আমরা এখানে কেন পড়ে থাকব?"
বাশার বলল, "উপায় নেই বলে। আমাকে আলাদা থাকতে হবে বলে চাচাজান হুকুম দিয়েছেন বলে। আমি ফিরব, তারপরে তোমরা চাচাজানের কথা মত যেখানে যাবার যাবে। আগে বলেছি, আবারও বলছি"।
শাহিদ রশিদের দিকে তাকাল। দুজনের মুখই থমথমে হয়ে গেল।
বাশার সেটা দেখে পাত্তা না দিয়ে হালকা গলায় বলল, "মুম্বই আর করাচীর মধ্যে আমার খুব বেশি পার্থক্য মনে হয় না। তোমাদের মনে হচ্ছে?"
শাহিদ বলল, "আমি জানি না তুই চাচাজানকে কী বুঝিয়েছিস, কিন্তু এভাবে কোন অপারেশন কমপ্লিট হয় না। আমি কিছুতেই এর মাথা মুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না"।
বাশার বলল, "তোমরা আমার থেকে বয়সে বড়। তোমরা যদি প্ল্যানের কিছু বুঝতে না পারো, তাহলে সেটা আমাকে না জিজ্ঞেস করে চাচাজানকে জিজ্ঞেস করে নাও"।
শাহিদ বলল, "চাচাজান তো আমাদের কথা শুনবে না। তোর কথা শুনবে। ঠিক আছে। আমি এখন কিছু বলব না। যদি বেঁচে থাকি, তোর কপালে দুঃখ আছে"।
বাশার বলল, "সেই আশাই করব, তোমরা ঠিক থাকো, ইনশাল্লাহ। আমি যাই, সান্ধ্য প্রার্থনার সময় হয়ে এল"।
শাহিদ আর রশিদ একে অপরের দিকে তাকাল।

২৩
শহরের বাইরে বেশ খানিকটা পথ যাবার পর একটা বাড়িতে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করাল শুভ। বলল, "এটা আমাদের সেফ হাউজ। যতক্ষণ না জানতে পারব রুকসার কেন এই কাজটা করেছে, ততক্ষণ ঢাকা নিরাপদ নয়"।
আশরফ বলল, "তা তো ঠিকই। ফোনের ব্যাবস্থা আছে তো?"
শুভ বলল, "হ্যাঁ, আপনারা আসুন, আমি ব্যবস্থা করেছি"।
আশরফ সোহানকে বললেন, "তোমরা দেখে নাও"।
সোহান সবাইকে নিয়ে বাড়ির ভিতরটা দেখতে গেল।
মাথুর বিরক্ত গলায় বললেন, "এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ঢাকার মত ভাল হবে না শুভ"।
আশরফ বললেন, "তোমার কি খাওয়া ছাড়া আর কিছু মাথায় আসে না?"
মাথুর কাঁধ ঝাঁকালেন, "আরে খাওয়াটা তো শুভদের দায়িত্ব, আমরা ওদের গেস্ট না?"
শুভ হেসে বলল, "খাওয়ার ব্যাপারে চিন্তা নেই, আমি ব্যবস্থা করছি। চলুন"।
তারা বাড়ির ভিতরে ঢুকে বসলেন। সোহানরা একটা ঘরের দখল নিল আশরফের নির্দেশ মত। শুভ মাদুর পেতে দিল, "এখানে খাটের ব্যবস্থা নেই। আপনার সমস্যা হতে পারে"।
মাথুর বললেন, "খাওয়া ছাড়া আমার সমস্যার কিছু নেই। এবার বল শুভ, তুমি রুকসারকে নিয়ে কী ভাবছো? আমরা কি রুকসারের খোঁজে যাব? তোমার সাজেশন বল"।
শুভ বলল, "আমি ক্ষুদ্র মানুষ। আমি এই ব্যাপারে কী বলব বলুন তো?"
আশরফ বললেন, "আমাদের কাছে কেউ ক্ষুদ্র না শুভ। মাথুর ঠিকই বলেছে। তোমার কী মনে হচ্ছে?"
শুভ একটু ভেবে বলল, "রুকসারের ব্যাকগ্রাউন্ড সার্চ শুরু করেছি। ওর বাড়িতে আমাদের লোক যাবে। আমরা খুব শিগগিরি ওকে ট্র্যাক করতে পারব আশা করছি"।
আশরফ বললেন, "শুধু আশা করলে হবে না শুভ। ব্যাপারটার সঙ্গে অনেক কিছু জড়িয়ে আছে। উই নিড টু নো এভ্রিথিং এবাউট হার, অ্যাট এনি কস্ট। আমাদের সব প্ল্যানই তো ভেস্তে দিল মেয়েটা। যদি ধরেও নি রফিক এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করেছিল যে ওকে আত্মরক্ষার্থে ওদের মারতে হয়েছে, তাহলেও সে স্টোরি দাঁড়াচ্ছে না"।
শুভ বলল, "যদি রাগের মাথায় মেরে থাকে? আমাদের দেশের এক শ্রেণীর মানুষের পাকিস্তানীদের উপর প্রবল রাগ আছে। হতে পারে রাগের মাথায় রুকসার কাজটা করেছে, পরে ভয় পেয়েছে আপনারা বকাবকি করবেন, তাই গা ঢাকা দিয়েছে"।
আশরফ গম্ভীর মুখে মাথুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই পয়েন্টটা হলেই ভাল হয়, তাই না?"
মাথুর বললেন, "দেখো শুভ, বাংলাদেশে পাকিস্তানের সিমপ্যাথাইজারও প্রচুর আছে। তুমি যা বললে তা যেমন ঠিক, তার উল্টোটা হলে যথেষ্ট সমস্যা তৈরি হতে পারে। এটা হতে পারে আই এস আই এমন কোন প্ল্যান করেছে যেটা থেকে রফিককে সরিয়ে দিয়েছে। ওদের নিজেদের লোকের উপর বিন্দুমাত্র ভরসা নেই, রুকসারকে ব্যাবহার করেছে হয়ত"।
শুভ বলল, "হতে পারে। তবে তার জন্য আমার কাছে আসার আগে রুকসারকে অনেক বেশি ব্যাকগ্রাউন্ড সেট আপ করতে হত। যদি তাই হয়, তাহলে বুঝতে হবে আমরা ওর ট্র্যাপে পড়েছিলাম"।
আশরফের ফোন বাজছিল। আশরফ দেখলেন প্রাইভেট নাম্বার থেকে ফোন এসেছে। ধরলেন, "হ্যালো"।
"কী আপডেট?" তুষারের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।
আশরফ বললেন, "এটা সিকিওর লাইন স্যার?"
তুষার বললেন, "হ্যাঁ। তোমরা সেফ হাউজে শিফট করে গেছো?"
আশরফ বললেন, "হ্যাঁ স্যার"।

তুষার বললেন, “গুড। চোখ কান খোলা রাখো। আর শোন, রুকসার বলে যে মেয়েটিকে তোমরা পাঠিয়েছিলে, ওর সমস্ত ডকুমেন্টস জাল”।
আশরফ চমকে উঠলেন, “আপনি কী করে জানলেন?”
তুষার বললেন, “জেনেছি, বাংলাদেশে আমার পুরনো সেট আপ আছে। ওসব নিয়ে বেশি ভাবতে হবে না এখন। রুকসারের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে সময় নষ্ট করার দরকার নেই। ওটা আলাদা টিম দেখছে, কালকের মধ্যে সব জেনে যাবে”।
আশরফ বললেন, “তাহলে এখন আমরা কী করব স্যার?”
তুষার বললেন, “ঢাকা নড়ে চড়ে বসেছে। রফিকের ব্যাপারে আমরা ওদের ব্রিফ করে দিয়েছি। এখন দেখার আই এস আই ঢাকাকে কোন চাপ দেয় নাকি। আপাতত আমার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকো”।
আশরফ হতাশ গলায় বললেন, “কিছুই করব না স্যার? ঘরে বসে থাকবো?”
তুষার বললেন, “হ্যাঁ। সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ তো। চিন্তা কোর না। কাজ আসবে, শিগগিরি আসবে। তোমাদের মুভমেন্ট এখন থেকে রেস্ট্রিকটেড। আমাকে সাউথ ব্লককে ইনফর্ম করতে হয়েছে। তোমরা কোন রকম মুভমেন্টে থাকবে না”।
আশরফ ফোন রাখলেন।
মাথুর জিজ্ঞেস করলেন, “কী হল? কী করতে বলছেন স্যার?”
আশরফ বললেন, “আপাতত বিরিয়ানি খেতে বলছেন আর কী”।
মাথুর বললেন, “মানে কিছু করব না?”
আশরফ শুভকে বললেন, “ব্যাকগ্রাউন্ড চেকের কিছু নেই শুভ। রুকসারের কোন ডকুমেন্ট ঠিক নেই। সব জাল। তুমি স্যারকে রুকসারের ডকুমেন্ট পাঠিয়েছিলে?”
শুভ অবাক হয়ে বলল, “আমি তো কিছু পাঠাইনি”।
আশরফ বললেন, “ঢাকা অফিস থেকে পেয়েছেন তবে। চিন্তা কোর না। আমাদের এখন কোন কাজ নেই আপাতত। তুমি মাথুরকে বিরিয়ানিই খাওয়াও”।
শুভ বলল, “উনি দিল্লিতে বসে এত কিছু পেয়ে যাচ্ছেন?”
আশরফ হাসলেন, “ঐ জন্যই তো উনি আমাদের বস”।

২৪

বাশারকে ঘিরে ভক্ত সমাগম হয়েছে। প্রচুর ভক্ত এসেছে। বাশারের পায়ে আছড়ে পড়ছে।
ব্যাঙ্গালোর যাবে বাশার। তার আগে ভক্তদের সঙ্গে মিলন সভার আয়োজন করা হয়েছে। জানলা থেকে বাশারের জনপ্রিয়তা দেখে শাহিদ বলল, “আমি যত দেখছি তত অবাক হচ্ছি। এত কম সময়ে বাশার এগুলো করল কী করে?”
রশিদ টিভি দেখছিল। বলল, “তোর কি হিংসা হচ্ছে। এসব করতে ইচ্ছা করছে?”
শাহিদ বলল, “না মানে এখানকার মানুষ এরকম কেন? পাগলের মত করছে। ওই দেখ, মায়েরা বাচ্চা কোলে নিয়ে এসেছে। নাম দেবে নাকি বাশার”।
রশিদ বলল, “পাকিস্তানেও এরকমই হয়। আমাদের মত দেশে এরকমই হবে। বাশার এখানে কী করে এত বড় বাবা হয়ে গেল, কেউ ভাবলোই না। তুই এসব ছাড়। এদিকে আয়”।
শাহিদ এসে রশিদের সামনে বসল।
রশিদ বলল, “তুই ফল খা। বেশি ভাবিস না”।
শাহিদ আঙুর খেতে খেতে তার ব্যাগ বের করল। একটা মাঝারি মাপের ফোন ব্যাগ থেকে বের করে বলল, “আমি চাচাজানকে ফোন করি”।

রশিদ রেগে গিয়ে বলল, “ফোন রাখ। বার বার ফোন ইউজ করতে বারণ করে গেছে বাশার”।
শাহিদ বলল, “বাশার বারণ করলেই শুনতে হবে?”
রশিদ বলল, “হ্যাঁ, কারণ আমাদের সেভাবেই চলতে বলা হয়েছে। আরেকটা কথাও ভুলে গেলে চলবে না, বাশার আমাদের অনেক আগে থেকে এখানে ঘাঁটি গেড়ে আছে। ও যদি মনে করে এখানে স্যাটেলাইট ফোন ইউজ করায় কোন সমস্যা আছে, তাহলে আছে। আমাদের ওর কথা শুনতে হবে”।
শাহিদ বলল, “সবার এত কথা শুনে চলতে ভাল লাগে তোর?”
রশিদ বলল, “আমরা অন্য দেশে আছি এখন। সাবধান থাকতেই হবে। বাশার গাড়ি ঠিক করে দিয়েছে। বেশি না বকে চল আমরা মুম্বই ঘুরে আসি। আশ্রমের গাড়ি করে ঘুরবি, ফিরবি, খাওয়া দাওয়া করবি, এই নিয়ে খুশি থাক। যখন আমাদের দরকার পড়বে, আমরা তখন কাজ শুরু করব”।
শাহিদ স্যাটেলাইট ফোন সশব্দে তার ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, “তুই যা, একা একা ঘুরে আয়। আমি যাব না”।
রশিদ বলল, “তাও হবে না। চাচাজান বলে দিয়েছে সব সময় আমাদের এক সঙ্গে থাকতে হবে। আমি একা একা ঘুরতে পারি না। চল, তৈরি হ”।
শাহিদ বিরক্ত মুখে উঠে বাশারের দেওয়া জামা কাপড় পড়ল। আশ্রমের পোশাক, এটা পরলে তাদের আশ্রমিক বলে মনে হবে।
রশিদ জানলার কাছে গিয়ে দেখল একটা বিরাট বড় গাড়িতে বাশার বেরিয়ে গেল। সবার দিকে হাত নাড়ল। তাদের জানলার দিকে একবার দৃষ্টি হেনে চলে গেল।
কিছুক্ষণ পরে তারা দুজন বেরোল। আশ্রমের গাড়ি করে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার কাছে পৌঁছল।
তাজ হোটেলের দিকে তাকিয়ে রশিদ চোখ বন্ধ করে শ্রদ্ধা জানাল শহিদদের প্রতি। শাহিদ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলল, “এখান থেকে কোথায় যেন ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হয়? আমরা যাব?”
রশিদ বলল, “হ্যাঁ, এলিফ্যান্টা কেভ। আর এদিকেই ট্রম্বে আছে। সমুদ্র থেকে তেল তোলা হয়”।
শাহিদ রশিদের দিকে তাকাল। রশিদ বলল, “তুই যেটা ভাবছিস আমি বুঝতে পারছি। কঠিনতম মিশনের একটা হবে সেটা। মনে হয় না চাচাজান রাজি হবে”।
শাহিদ বলল, “আচ্ছা”।
কথাটা বলে সে ফিক ফিক করে হাসতে লাগল।

২৫

একটা ক্যারামের ব্যবস্থা করা গেছে। চারজন জওয়ান ক্যারাম খেলছে। আশরফ শুয়ে মোবাইল ঘাঁটছেন।
মাথুর ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বললেন, “তুমি কি কিছু আঁচ করতে পারছ?”
আশরফ বললেন, “কী আঁচ করতে হবে?”
মাথুর বললেন, “স্যার আমাদের সঙ্গে চারজন কম্যান্ডো পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে বলছেন আমাদের কিছু করতে হবে না। এর কী মানে দাঁড়ায়?”
আশরফ উঠে বসে বললেন, “রফিক মরেছে এটায় তুমি খুশি তো?”
মাথুর বললেন, “খুশি হয়ে কী হবে? যদি ওরা আরো বড় কোন প্ল্যান করে থাকে, তাহলে রফিকের থাকা না থাকায় কী যায় আসে?”
আশরফ বললেন, “একজ্যাক্টলি। স্যারের কাছে এমন কোন খবর আছে, যাতে বাংলাদেশ জড়িত। সোহানদের এই জন্যই স্যার পাঠিয়ে দিয়েছেন। তুমি আর আমি হলাম স্যারের দুটো ঘোড়া। আমাদের দুটোকে একসঙ্গে পাঠানোর ঝুঁকি কেন নিচ্ছেন সেটা অনুমান করাই যায়”।
মাথুর হেসে বললেন, “আর মন্ত্রী কে? সায়ক?”

আশরফ বললেন, “বড়াল অনেক দূর চলে গেছে ভাই। ওকে আর বোর্ডে বসানোর জায়গায় নেই আমরা”।
মাথুর বললেন, “অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না? কবে যে আবার সবাই মিলে পার্টি করব, আদৌ আর করতে পারবো কি না, তাই জানি না”।
শুভ দরজা ঠেলে ঢুকল।
মাথুর বললেন, “কী খবর তোমার?”
শুভ বলল, “একটা খবর পেলাম। মায়ানমার সীমান্ত থেকে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানী ঢুকেছে এ দেশে। এখন ওরা চট্টগ্রামে আছে”।
আশরফ বললেন, “পাকিস্তানী তো বুঝলাম, কোন গ্রুপ”?
শুভ বলল, “বছর পনেরো থেকে সতেরো বয়স এদের। রোহিঙ্গাদের সঙ্গে ঢুকেছে খবর পেলাম”।
আশরফ বললেন, “ব্যস। ওই বয়স মানেই হল মগজ ধোলাই করে এদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। নজর রাখা হচ্ছে তো?”
শুভ বলল, “স্যার শুধু খবর এসেছে। নজর রাখার কাজ পুরোপুরি চলছে নাকি সেটা বলতে পারব না”।
আশরফ ফোন নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তুষারকে ফোন করলেন। তুষার ধরে বললেন, “বল”।
আশরফ বললেন, “স্যার চট্টগ্রামে একটা দল ঢুকেছে। টিনেজারদের দল। মায়ানমার থেকে ইনফিল্ট্রেট করেছে। পারমিশন চাই স্যার”।
তুষার অবাক গলায় বললেন, “কীসের পারমিশন?”
আশরফ বললেন, “ওদের ধরার”।
তুষার বললেন, “ধরে কী করবে? আমি ঢাকা ইন্টেলিজেন্সকে জানিয়ে দিচ্ছি। ওরা ব্যবস্থা করবে”।
আশরফ বললেন, “স্যার ঢাকা সম্পর্কে তো আপনিও ভাল করে জানেন। এদের হাফ আমাদের সাপোর্ট করে, হাফ পাকিস্তানকে করে। ইন ফ্যাক্ট এখন পাকিস্তানীদের সমর্থনের পাল্লা বেশি যাচ্ছে। কেন অকারণ রিস্ক নেবেন?”
তুষার বললেন, “সে যাই হোক, আমরা কূটনৈতিক চাপ দিতে পারি খুব বেশি হলে। তোমাদের এই অপারেশনে নামাতে পারি না। একটা কথা মনে রাখো, চট্টগ্রামে জামাতের বেস মারাত্মক স্ট্রং। ওখানে কিছু করতে পারা কঠিন ব্যাপার। আর কয়েকটা বাচ্চা ছেলেকে ধরে কী করতে চাইছ? হতে পারে ওরা এখানে কোন মাদ্রাসায় ট্রেনিং ক্যাম্প চালাতে এসেছে”।
আশরফ বললেন, “এটাও হতে পারে ওরা চট্টগ্রাম থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে কোন এক সীমান্ত দিয়ে আমাদের দেশে ঢুকে গিয়ে কোন ব্লাস্ট করল”।
তুষার বললেন, “তার জন্য আমরা তো আছি। কেন খামোখা টেনশন দিচ্ছ তুমি? এখন অলরেডি একটা ঝামেলায় ফেঁসে আছো, বাংলাদেশে কী হচ্ছে তার আপডেট আমার কাছে আছে। ভেবো না। যেখানে আছো সেখানেই থাকো”।
আশরফ বললেন, “স্যার আপনি আমাদের চট্টগ্রাম যেতে দিন অ্যাটলিস্ট”।
তুষার বললেন, “কেন জেদ করছ খান? কী হয়েছে তোমার? এত অধৈর্য তো তুমি ছিলে না। ওখানে অসুবিধা হচ্ছে কোন?”
আশরফ বললেন, “না স্যার। ঠিক আছে। গুড নাইট স্যার”।
তুষার বললেন, “টেক কেয়ার। গুড নাইট”।
ফোন কাটলেন তুষার। আশরফ ঘরে ঢুকতে মাথুর বললেন, “বস কী বললেন?”
আশরফ বললেন, “কিছু না। হাত পা বেঁধে বসে থাকতে হবে আমাদের। শুভ, খাওয়াও কিছু। খাওয়া আর ঘুম ছাড়া কোন কাজ নেই এখন মনে হচ্ছে”।

২৬

আগের দিন সৌদি থেকে ইসলামাবাদ যেতে যতটা না সময় লেগেছিল, তার থেকে অনেক বেশি মানসিক চাপ ছিল।

তার ওপর সায়ক যখন বলল তারা এক পাকিস্তানি সেনার বাড়িতে অনুপ্রবেশ করে থাকছে, বীরেন খানিকটা ঘাবড়েই ছিল।

বিছানায় এপাশ ওপাশ করে ঘুম এল রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ। ভোর চারটের সময় সায়ক তার কাঁধে চাপড় মেরে তুলে দিল, "উঠে পড় বীরেন"।

বীরেন উঠে বসল। সায়ক বলল, "পেট ক্লিয়ার করে নাও। একটা গাড়ি জোগাড় করেছি"।

বীরেন তাড়াতাড়ি উঠে বাথরুমে গিয়ে যতটা পারে পেট খালি করার চেষ্টা করল। প্রবল চেষ্টাতেও পুরোপুরি পেট খালি হল না। হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে বাথরুম থেকে বেরোতে সায়ক তাকে পাঠান কুর্তা পায়জামা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "এটা পরে নাও। আর ফেজ টুপিটা টেবিলের ওপর আছে। পরে নাও"।

বীরেন তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিল।

একটা জিপ দাঁড়িয়ে ছিল বাড়িটার সামনে।

সায়ক বলল, "বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। আমি একবার জাস্ট দেখে নি কিছু ফেলে গেলাম কি না"।

বীরেন বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। আকাশ অন্ধকার। রাস্তাঘাট ভারি সুন্দর। স্ট্রীট লাইটগুলো জ্বলছে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সায়ক বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে বলল, "চলে এসো"।

বীরেন গাড়িতে গিয়ে বসল।

সায়ক গাড়ি স্টার্ট করে বলল, "উর্দুতে তুমি সড়গড়?"

বীরেন বলল, "হ্যাঁ"।

সায়ক বলল, "প্র্যাকটিস কর। আমাদের ওখানে যেমন বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন বলার ধরণ, এখানেও তাই। যেখানে যাবে, বলবে কম, শুনবে বেশি। বোকা সেজে থাকলে সব থেকে ভাল। তবে বোবা হয়ে টিকে থাকা বিপদ। যতটা প্রয়োজন, তার বাইরে কোন কথা বলবে না। তোমাকে আমি প্ল্যান্ট করছি রাওয়ালপিণ্ডি রাজা মার্কেটে। সব থেকে বেশি ভিড় হয় এখানে। তুমি এখানে একা থাকবে। কাউকে কোন ফোন করবে না। কারো সঙ্গে কোন যোগাযোগ করার দরকার নেই। তুমি অনাথ বা এতিম। এখানে কাউকে চেনো না। কাজ খুঁজছিলে বলে তোমাকে আমি দিয়ে যাচ্ছি"।

বীরেন বলল, "কী কাজ করতে হবে?"

সায়ক বলল, "দোকানে যা যা কাজ থাকে। এরা হোলসেলার। কাপড় বওয়া, হিসেব করা, সব করতে হবে। মানুষের ভিড় হল লুকিয়ে থাকার সেরা জায়গা। এই ভিড়েই লুকিয়ে থাকবে অমূল্যরতন। চোখ কান খোলা রাখবে। কোথাও কিছু লিখে রাখবে না। যা লেখা থাকবে, সব মগজে। মগজাস্ত্র ছাড়া এখানে তোমার আর কোন অস্ত্র নেই"।

বীরেন বলল, "বুঝেছি"।

সায়ক বলল, "শোয়েব আলি। এটাই তোমার নাম এখন, মনে রেখো"।

বীরেন বলল, "ঠিক আছে"।

ইসলামাবাদ পেরিয়ে রাওয়ালপিণ্ডির দিকে গাড়ি চলল। রাজা মার্কেটে এই ভোরেও ভিড় শুরু হয়ে গেছে। বাজারের বাইরে গাড়ি ছেড়ে সায়ক বলল, "আমার সঙ্গে চল"।

দুজনে হাঁটতে থাকল। সকাল সকাল কর্মব্যস্ত লোকের ভিড়ে জমজমাট বাজার। একটা দোকানে ঢুকে সায়ক দোকানের মালিকের কাছে গিয়ে সেলাম জানিয়ে বলল, "সুলেমানভাই, খবর কী?"

সুলেমান রুপি গুনছিল। সায়ককে দেখে বলল, "আরে সোবাহান মিয়াঁ। কতদিন পরে দেখা। সব ঠিক আছে তো?"

সায়ক হাসল, "হ্যাঁ মিয়াঁ। আপনি দোকানের জন্য এক বিশ্বস্ত লোক খুঁজছিলেন না? আমি আমার এক পরিচিতকে নিয়ে এসেছি। গ্রামের ছেলে। বাপ মা মরা এতিম। কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। আমার তো আপনার কথাই মনে পড়ল। ও শোয়েব আলি। শিখিয়ে পড়িয়ে নেবেন। আপনি যা কাজ দেবেন, আশা করি পারবে। অসুবিধে হবে না"।

সুলেমান বীরেনের আগাপাস্তালা দেখে বলল, "কী মিয়াঁ, হিসেবের কাজ জানো তো?"

বীরেন বলল, "জি জনাব। যেটা জানি না শিখিয়ে দেবেন"।

সুলেমান বলল, "দোকানের পিছনের ঘরে শোয়া। সারাদিন কাজ। এখন কাজ শেখো। বেশি দিতে পারবো না, তবে যদি বিশ্বাসী লোক হও, খাওয়া পরার অভাব রাখবো না এটা মনে রেখো। ঠিক আছে?"

বীরেন মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে জনাব"।

সায়ক বলল, "তাহলে মিয়াঁ, আমি আজ চলি? শোয়েবকে আপনার জিম্মায় দিয়ে দেলাম"।

সুলেমান বলল, "নাস্তা করে যান মিয়াঁ। নাস্তা না করে তো আপনাকে ছাড়ব না"।

সুলেমান বীরেনের দিকে তাকাল, "বাইরে দেখো পরোটার দোকান আছে। সোবাহান মিয়াঁর জন্য পরোটা নিয়ে এসো"।

সুলেমান বীরেনের হাতে রূপি দিল। বীরেন দোকান থেকে বেরোল। আগে হলে কান্না পেত, এখন সেসব পাচ্ছে না তার। মজা লাগছে। অচেনা জায়গায় কাজ। সে কি পারবে? ওসব ভাবলে চলবে না। তাকে পারতেই হবে।

২৭

আতর জাহিরের সামনে কাচু মাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

জাহির বলল, "কী হল? এরকম মুখ করে তাকিয়ে থাকার কী হল?"

আতর বলল, "কী করব জনাব? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এত বড় একটা কাজে পাঠালাম, কাজ তো পুরো উল্টো করে চলে এল!"

জাহিরের ফোন বাজছিল। জাহির ধরল, "জি জনাব"।

ও প্রান্ত থেকে সামসেরের কণ্ঠ ভেসে এল, "খবর চেপে যেতে হবে। এখন হাইলাইট করা যাবে না"।

জাহির ধরলো, "জি জনাব"।

সামশের বলল, "মেয়েটাকে নিয়ে কোন আপডেট পাওয়া গেছে?"

জাহির বলল, "না জনাব"।

সামশের বলল, "তুমি শিওর, মেয়েটা তোমাদের লোক ছিল?"

জাহির বলল, "জি একশো ভাগ জনাব। সব দিক থেকে কনফার্ম করেছিলাম"।

সামশের বলল, "কাকে মেরেছে বুঝতে পারছো? কোন ধারণা আছে?"

জাহির চুপ করে গেল।

সামশের ও প্রান্ত থেকে ফোন কেটে দিল।

জাহির আতরের দিকে তাকালো, "ও মাগীরে যেখান দিয়ে পাবি, যেখানে পাবি, যে অবস্থায় পাবি ধরতে হইবো। যদি না পারোস, নিজে নিজেরে মারবি, ঠিক আছে?"

আতর আতঙ্কিত মুখে মাথা নাড়ল।

#

দয়াসাগর আশ্রম। দুজনে নামাজ পড়ে উঠল। শাহিদ খাটে বসে বলল, "বাশার না থাকলে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। থাকলে ওর পেছনে লেগে মজা পাওয়া যেত"।

রশিদ বলল, "মজাতেই আছে। যে কোন সময় আমাদের ঘাড় থেকে নামিয়ে এখানকার ধর্মগুরু হয়ে যাবে। আর কী চাই? বিরাট ক্ষমতা হয়ে গেছে"। শাহিদ গম্ভীর হয়ে গেল, "অতো সোজা না। একবার বেগড়বাই

করলে ওর হিসেব ঠিক বুঝে নেওয়া হবে। সেটা বাশার খুব ভালভাবে জানে"।
রশিদ হেসে উঠল, "বেচারা বাশার। একবার র ওর খোঁজ পেলে খালি হাতে জবাই করবে ওকে"।
শাহিদ বলল, "বাশারের কিছু না হওয়াই ভাল এখন। হলে সমস্যা বাড়বে। এখানকার পুলিশদের সঙ্গে ওর দহরম মহরম দেখেছিস? ওর জন্য আমাদের দিকে কেউ চোখ তুলেও তাকাবে না"।
রশিদ বলল, "চাচাজান ছিল বলেই তো এত কিছু হল? কার প্ল্যান এগুলো? চাচাজানেরই তো"!
শাহিদ বলল, "জানি না চাচাজান কী ভেবে রেখেছে আমাদের জন্য"।
রশিদ বলল, "ফোন কর। আমি বলছি। জিজ্ঞেস কর আমাদের এখন করণীয় কী"।
শাহিদ উঠল। ব্যাগ থেকে ফোন বের ফোন করল। ও প্রান্তে একবার রিং হতেই ফোন রিসিভ হল, "কেমন আছিস আমার বাঘেরা?"
শাহিদ সালাম জানিয়ে বলল, "এখানে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না। সারাদিন বদ্ধ ঘরে থাকা যায় নাকি? চাচাজান যেন আমাদের খুব তাড়াতাড়ি কোন কাজের ব্যবস্থা করে"।
ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল, "আজ রাতে কাজ দিচ্ছি। আপাতত ঘরে থাকাই ভাল। যত কম বেরোনো যায়, তত ভাল। বাশার ফিরলে কাজে নেমে পড়তে হবে। উপরমহল থেকে অর্ডার এলে মিশন শুরু হবে। চিন্তার কোন বিষয় নেই, বাশার যখন আছে, কোন ভয় নেই"।
শাহিদ বলল, "ভয়ের কোন ব্যাপার নেই। শুধু কাজ চাই। জন্নত নসীব হওয়ার থাকলেও যেন যা হবে তাড়াতাড়ি হয়। আমরা ভয় পাই না। আমরা আমাদের মানুষদের কথা সর্বত্র পৌঁছনোর জন্য যা যা করতে হয়, তাই করব। চাচাজান আমাদের শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা নেবেন"।
ফোন কেটে গেল। শাহিদ উত্তেজিত মুখে রশিদের দিকে তাকিয়ে বলল, "রাতে কাজ আসছে। বলছে বাশার ফিরলে কাজ শুরু করতে হবে"।
রশিদ শান্ত মুখে বলল, "বাশার খুব গুরুত্ব পেয়ে গেছে দেখছি। আমাদের থেকে বাশার এত বেশি গুরুত্ব পেয়ে গেল? অথচ বাশারের জায়গায় আমার আসার কথা ছিল আগে। চাচাজান বাশারকেই পাঠাল। ঠিক আছে। কোন অসুবিধা নেই। বাশারই যদি এখন ভি আই পি হয়, তবে তাই হোক। দেখা যাক ও কী বলে"।
শাহিদ বলল, "আমিও তো সেটাই বলছি। বাশারের উপর যেন একটু বেশিই টান হয়ে গেছে সবার। কী এমন কঠিন কাজ? বুরবক লোকেদের আরো বুরবক বানাচ্ছে! যেন আমরা এখানে থাকলে এ কাজটা করতে পারতাম না! কী এমন হাতিঘোড়া কাজ ছিল"।
রশিদ বলল, "চাচাজান যদি আজকে কোন কাজ না পাঠায়, তাহলে আমি চাচাজানের অপেক্ষায় থাকব না। তার আগেই বড় ঘটনা ঘটাবো। আমরা কী কাজ করব, তার জন্য আমাদের বাশারের জন্য বসে থাকতে হবে, চাচাজানের এই ফয়সলা মেনে নেওয়া যাচ্ছে না"।
শাহিদ বলল, "কালকে? কোথায় করব?"
রশিদ বলল, "এখানেই করব। লোক গিজগিজ করছে সবখানে। যেখানেই বিয়ে হবে, সেখানেই বারাত আসবে। চিন্তার কিছু নেই"।
শাহিদ বলল, "স্লিপারদের কাজে লাগাবো না"?
রশিদ বলল, "দুশমন মুলুকে দুশমনদের মেরে মরব, আর কাউকে দরকার হয়? কাউকে না। চাচাজান আজকাল খুব সামশের সাবের সঙ্গে মিটিং করছে। এত মিটিং করার কী আছে? এসব সিদ্ধান্ত নিতে এত সময় নিলে হয়?"
শাহিদ উত্তেজনায় রশিদের হাত চেপে ধরে বলল, "তুই যা ঠিক করবি তাই হবে। আমাদের দুজনের জান্নাত নসীব হোক, তার আগে যতজন ভারতীয়কে জাহান্নামে পাঠাতে পারি, তত লাভ। দরকার নেই কারো নির্দেশের অপেক্ষায় থাকার"।
রশিদ বলল, "আজকে রাতটা শুধু দেখব। তারপর যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার, আমরা দুজনেই নেব"।

শাহিদের দু চোখ জ্বলে উঠল, "বেশক"।

২৮

"মুক্তিযুদ্ধের সময় এ দেশে যে আগুন জ্বলেছিল, তা যখনই শুনি, আমরা একদিকে যেমন উত্তেজিত হই, ভয়ও পাই। অনেকেই জানে না, পূর্ব পাকিস্তানে গ্রামের পর গ্রাম পাক সেনারা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। হিন্দুদের দেখা মাত্র খুন করা হত, হিন্দু মেয়েদের রেপ করা হত। প্রচুর, অসংখ্য, কোন হিসেব পাওয়া যাবে না স্যার"।

শুভ ভোর বেলাতেই চলে এসেছিল। খাবার টেবিলে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা শুরু হয়েছে। শুভর কথা শুনে আশরফ বললেন, "সে হিসেবে পাকিস্তানের উপর বাংলাদেশের প্রচুর রাগ থাকার কথা"।

শুভ ম্লান হেসে মাথা নাড়ল, "দুঃখের কথা অনেকের মধ্যেই সে রাগ নেই। ধর্মের কালো কাপড়ে তাদের চোখ বাঁধা। এখনও পাকিস্তানের সিমপ্যাথাইজার প্রচুর আছে। রাজাকারদের সেভাবে শাস্তি দেওয়া হয় নি তখন। রাজাকার প্রচুর আছে এ দেশের আনাচে কানাচে। খুঁজলে অনেক রাজাকার পাওয়া যাবে। কুখ্যাতদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। বাকিদের কিছুই হচ্ছে না"।

মাথুর মন দিয়ে পরোটা খেতে খেতে বললেন, "পাকিস্তান বেশ কয়েকটা দেশকে ইন্ডিয়ায় ইনফিল্ট্রেট করতে ইউজ করে। বাংলাদেশের বেশ কিছু জায়গায় মাদ্রাসাগুলোকে আই এস আই ট্রেনিং ইন্সটিটিউট হিসেবে ব্যবহার করছে। আমার মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে, রফিকের প্ল্যান আরো বড় হতে পারে। জানি না এরপর কী হতে পারে"।

শুভর ফোন বেজে উঠল। শুভ ফোন ধরে উত্তেজিত হয়ে বাইরে চলে গেল। আশরফ মাথুরের দিকে তাকিয়ে অবাক গলায় বললেন, "কী হল?"

মাথুর বললেন, "দেখো, আবার কিছু হল নাকি"।

মিনিট দুয়েক পরে শুভ চিন্তিত মুখে ফিরল। আশরফ বলল, "কী হয়েছে?"

শুভ বলল, "ভাগ্যিস আগের সেফ হাউসটা ছেড়ে এসেছি। ওখানে ব্লাস্ট হয়েছে এখন"।

মাথুর আশরফ মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। মাথুর বললেন, "কারা করেছে জনা গেছে"?

শুভ মাথা নাড়ল, "না। তবে আপনাদের খবর গেছে ওদের কাছে"।

মাথুর বললেন, "কাদের কাছে? আই এস আই?"

শুভ বলল, "ডিরেক্ট আই এস আই নাও হতে পারে। হতে পারে আই এস আই ফান্ডেড এখানের কোন অর্গানাইজেশন। ওই বাড়িটার খবর ওদের কাছে যাওয়া মোটেও ভাল খবর না"।

আশরফ ফোন বের করে তুষারকে ফোন করে সবটা বললেন। তুষার শুনে বললেন, "ফোনটা স্পিকারে দাও"।

আশরফ স্পিকারে দিলেন। তুষার বললেন, "শুভ শুনতে পাচ্ছো?"

শুভ বলল, "জি স্যার"।

তুষার বললেন, "সেফ হাউজের কথা ঢাকা সি আই ডি জানত?"

শুভ বলল, "না স্যার। শুধু দুজন জানতেন। মিজান সাহেব আর ডি আই জি সাহেব। ওরা কাউকে বলার লোক নন"।

তুষার একটু ভেবে বললেন, "এই সেফ হাউজের কথা কে জানে?"

শুভ বলল, "কেউ জানে না স্যার। আমি কাউকে বলি নি। এই সেফ হাউজ আমিই বের করেছিলাম। আমার নানার বন্ধুর বাড়ি এটা। এখন কেউ থাকে না"।

তুষার বললেন, "ঠিক আছে। তুমি এখন থেকে কোথাও যেও না। ওদের সঙ্গে থাকো"।

শুভ অবাক হয়ে বলল, "তাহলে স্যার বাজারহাট করব কী করে?"

তুষার বললেন, “সেগুলো কর। কিন্তু ওরা যদি তোমাকে ট্রেস করে ফেলে, তাহলে এই সেফ হাউজও ট্রেস হয়ে যাবে। আমি এখনই ঢাকা সরকারকে এখানে ইনভলভ করতে চাইছি না। সেক্ষেত্রে তোমাকে অনেক রেস্ট্রিক্টেড ওয়েতে চলতে হবে। অ্যাম আই ক্লিয়ার?”
শুভ বলল, “জি স্যার”।
তুষার বললেন, “তোমাদের সবাইকেই বলছি, ঢাকা ইজ স্টিল সেফ। চিন্তার কোন কারণ নেই। তোমরা অ্যালার্ট থেকো শুধু। আমায় শুধু রুকসারের ব্যাকগ্রাউন্ডটা পুরো পুরি বের করা অবধি অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এই মুহূর্তে অন্য কোন অর্গানাইজেশন অ্যাক্টিভ হলে সেটা কারা, তারা বন্ধু না শত্রু, সেটা বের করতে সময় লাগবে”।
আশরফ বললেন, “স্যার, যারা ওই বাড়িটায় বোম ফেলেছে, তারা বন্ধু হবে ভাবার কি কোন কারণ আছে”?
তুষার থমকে গিয়ে বললেন, “সেটা ঠিক। আচ্ছা শুভ, রুকসার ওই বাড়িটা সম্পর্কে জানত?”
শুভ বলল, “জি স্যার”।
তুষার বললেন, “গুড গড। তাহলে রুকসার আমাদের শত্রু?”
শুভ বলল, “আমি ওর ব্যাপারে কী করে বলি বলুন তো? এখন তো কিছুই মিলছে না দেখছি”।
তুষার বললেন, “আমি এই মুহূর্তে ঢাকা মিশন অ্যাবর্ট করতে বলতে পারি, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ঢাকা ছাড়াটা আমাদের জন্য কোন মিস্টেক হতে পারে”।
আশরফ বললেন, “স্যার, শুভ বলছিল মায়ানমার থেকে বেশ কিছু পাকিস্তানি ঢুকেছে। এটা ওদের কাজ হতে পারে?”
তুষার বললেন, “হতে পারে, নাও পারে। আই এস আই বাংলাদেশে অনেক ছেলেই ঢুকিয়ে যাচ্ছে। একেকজনের একেক রকম লক্ষ্য”।
মাথুর বললেন, “স্যার, লস্কর বা অন্য কোন অর্গানাইজেশন হলে?”
তুষার বললেন, “ভীষণ অ্যালারমিং। ঠিক আছে। আমি কয়েকটা উইং অ্যাক্টিভ করছি বাংলাদেশে। আপডেট দিচ্ছি তোমাদের। বাই”।
তুষার ফোন কেটে দিলেন। আশরফ চিন্তিত মুখে বললেন, “আবার কী উইং”?
মাথুর কাঁধ ঝাঁকালেন, “কে জানে”!

২৯

সারাদিন ধরে দোকানের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। প্রথম দুদিন বস্তা ধরতে হয়েছিল, পরে সুলেমান তাকে হিসেবের কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। বীরেনের হিসেবের মাথা পরিষ্কার। জায়গা করতে বেশি সময় লাগে নি।
পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যবসায়ীরা আসে। দুপুরে কোন এক সময়ে টিফিন করতে হয়।
দোকানের বাইরে যাওয়ার সুযোগ পেলে বীরেন বাইরেটা দেখে। কোথায় ছিল, কোথায় চলে এসেছে। এত বড় পৃথিবী, ধর্ম, ভাষা, হিংসার ভিত্তিতে ভাগ হয়ে গেছে। এক কালে তো এ সবই ভারতবর্ষ ছিল, এখন পাকিস্তান হয়ে গেছে। ঠিক কী করতে হবে তাকে, সে নিজেও জানে না। সায়ক যোগাযোগ রাখবে বললেও এখানে যেদিন তাকে দিয়ে গেল, তারপর থেকে আর যোগাযোগ করে নি। এভাবেই শুরু হয় তার মত বাকিদেরও। হয়ত বাকি জীবনটা এখানে কাজ করেই চলে যাবে। হয়ত কালকেই ডাক পড়বে কোন মিশনে। বেশি ভাবা ছেড়ে দিয়েছে সে। দোকানের ভিতরে একটা কুঠুরি পেয়েছে সে। সেখানেই থাকে। বাড়িতে যোগাযোগ করা যাবে না।
এখানে থেকে তেমন কিছু দেখাও যায় না। তবে একদিন শুনেছে তাদের সামনের দোকানের ইমান শেখকে কেউ তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করেছিল। তার সঙ্গে কি সায়কের তাকে এখানে আনার কোন যোগসূত্র আছে? তুষার স্যারের কথা মাথার মধ্যে রাখে বীরেন। তুষার স্যার বলেছিলেন, এই কাজগুলোতে একটার পর

একটা পরিস্থিতি আসবে। একজন ভাল স্পাইকে ভাল অঙ্কও জানতে হয়। ঠিক সময়ে তাকে বুদ্ধি খাটিয়ে এই পরিস্থিতিগুলোকে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে মিলিয়ে দিতে হবে।
বীরেন ইমান শেখের দোকানটা সুযোগ পেলে রোজই খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে। আর পাঁচটা দোকানের থেকে আলাদা কিছু না। ভিড় হয় সকাল থেকে রাত অবধি। সাধারণ দোকানদারেরা আসে। মাল নিয়ে চলে যায়।
জুম্মার দিন অর্থাৎ শুক্রবারে বাজার শুধু রাতে খোলা থাকে। সেদিন বীরেন একটু সময় পায় হাত পা খেলিয়ে নেওয়ার। সারাদিন গদিতে বসে কাজ করে করে ঘাড় ধরে যায়।
সুলেমান তাকে নিয়ে মসজিদে যায়। বীরেন নামাজ পড়ার সব পদ্ধতি শিখে নিয়েছিল। মন দিয়ে ঈশ্বরকে ডাকে। তার মন বলে, মসজিদে ডাকুক কিংবা মন্দিরে, ঈশ্বর ঠিকই তার কথা শুনবেন একদিন। জুম্মার নামাজ সেরে সে সুলেমানের সঙ্গে ফিরছিল, এই সময় সুলেমানের মন হালকা থাকে। বীরেন হালকা গলায় বলল, "ইমান শেখের দোকানটা খুব বড়। অনেক দিনের ব্যবসা ওদের, তাই না জনাব?"
সুলেমান বলল, "হ্যাঁ, আমার আব্বা রাওয়ালপিণ্ডি আসার অনেক আগে থেকে ওদের ব্যবসা। বেচারাকে খুন হতে হল। কে জানে, কী হয়েছিল। সেদিন সকালেও আমাদের কথা হয়েছিল, জানো"।
বীরেন বলল, "কেউ জানে না কেন খুন হতে হয়েছিল?"
সুলেমান বলল, "না। কারো সঙ্গেই তো কোন ঝামেলা ছিল না। এই আমাকেই দেখো মিয়াঁ, সারাদিন দোকানেই ব্যস্ত থাকি। কার সঙ্গে কী শত্রুতা আছে আমি কিছুই জানি না। সবই নিজের নিজের নসীব। কী লিখে দিয়েছেন আল্লাই জানেন। এখন রজ্জাক দোকান চালাচ্ছে। ইমানের মত কি আর পারবে? ইমানের অনেক ক্ষমতা ছিল। শ্রীনগরের লোক ওরা। কবে চলে এসেছিল"।
বীরেন অবাক হয়ে বলল, "ইন্ডিয়ার শ্রীনগর"?
সুলেমান বিরক্ত হল, "কী যে উলটোপালটা কথা বল তুমি শোয়েব, শ্রীনগর ইন্ডিয়ার কেন হবে? ওটা ওরা দখল করে রেখেছে"।
বীরেন মাথা নাড়ল, "ঠিক জনাব। ইমান শেখ কাশ্মীরি ছিল?"
সুলেমান বলল, "হ্যাঁ। ওরা সবাই কাশ্মীরি। ওদের কাপড় দেখলেই সেটা বুঝতে পারবে। আমাদের আর ওদের ঘরানা আলাদা। তা তোমার মাথায় হঠাৎ ইমান শেখ ঢুকল কেন বল তো?"
বীরেন লজ্জিত মুখে বলল, "জি জনাব, সেরকম কোন কারণ নেই। একই বাজারের ব্যবসায়ী ছিলেন উনি, শুনে খারাপ লাগল যে খুন হতে হয়েছে"।
সুলেমান দুঃখিত মুখে বলল, "ঠিকই বলেছ, মানুষের জীবনের কি কোন ঠিক আছে? আল্লাহ যেমন রেখেছেন, তেমন থাকতে হবে আমাদের। আচ্ছা শোন, তুমি আজ ছুটি নিয়ে সিনেমা দেখে আসতে চাইলে যেতে পারো, তুমি তো ছুটিও নাও না। গেলে যাও। আমি দোকান সামলে নেবো"।
বীরেন বলল, "জি বহুত শুক্রিয়া জনাব। ছুটি নিয়ে কী হবে? আপনি একা পড়ে যাবেন, ও পরে দেখা যাবে"।
সুলেমান খুশি হল, "তুমি উন্নতি করবে মিয়াঁ আমি বুঝতে পারছি"।
রাতে দোকানে বসে বসে বীরেনের চোখ মাঝে মাঝেই ইমান শেখের দোকানের দিকে চলে যাচ্ছিল। সবকিছুই স্বাভাবিক। তাও কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল তার।

৩০

"জনাব"।
সামশের তার চেম্বারে ছিল। আকবর খান প্রবেশ করল নক না করেই। সামশের বিরক্ত হয়ে বলল, "কী হল?"
আকবর বলল, "সরি জনাব। একটা কথা বলার ছিল"।

সামশের বলল, "কী কথা?"

আকবর বলল, "মৌলানা হজরতউল্লাহ খবর পাঠিয়েছেন। উনি মাসকট যাবেন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে"।

সামশের স্থির চোখে আকবরের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কোন রিপ্লাই করেছো?"

আকবর বলল, "না জনাব। আপনার সঙ্গে কথা না বলে রিপ্লাই করি নি"।

সামশের বলল, "গুড। তুমি জানিয়ে দাও ওকে এখন মুজফফরাবাদ থেকে বের করা অসম্ভব। ওখানেই থাকতে হবে। দরকার হলে আমরা ফান্ড পাঠাতে পারি, কিন্তু বেরোয় না যেন। যত ঝামেলা। একটাও ঠিক ঠাক কাজ করতে পারে না, শুধু দেশের বাইরে যাবার ঝামেলা করে আমাদের মাথা খারাপ করে দেবে"।

আকবর বলল, "জনাব, ওকে কেন বাইরে যেতে হয়?"

সামশের বলল, "জানি না। এসবের ঝক্কি কে সামলাবে? সি আই এ খোঁজ পেলেই আমাদের চেপে ধরবে। এদিকে আবার ইলেকশনের ঝামেলা এসে পড়ল। কোন মানে হয় এত ঝামেলা করার? এমনিতেই কোন সরকারকে আর্মি বেশিদিন টিকিয়ে রাখবে না, মাঝখান থেকে আবার ইলেকশন"।

অফিসের ফোন বাজছিল। সামশের ধরল, "হ্যালো"।

"জনাব। একটা রিকুইজিশন পাঠিয়েছি সকালে। পেয়েছেন তো?" ও পাশ থেকে মৌলানা হজরতউল্লাহর গলা ভেসে এল।

সামশের বলল, "জি জনাব। পেয়েছি। এই মুহূর্তে আপনার মুজফফরাবাদ থেকে বেরোনো কঠিন জনাব। আপনি এখন না বেরোলেই ভাল"।

ও প্রান্তে কয়েক সেকেন্ডের নিস্তব্ধতা। তারপর শোনা গেল, "আল্লাহর মর্জিতে আমরা অনেকদূর এগিয়েছি। এখন তো পিছনো যাবে না জনাব"।

সামশের বলল, "জনাব, আপনি বোঝার চেষ্টা করুন। প্রেসিডেন্ট সাহেব ইলেকশনের ঘোষণা করেছেন, গোটা পৃথিবীর নজর এখন পাকিস্তানের উপরে, এখন কোন রকম ঝুঁকি নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব না"।

মৌলানা বলল, "কোন ফুল গাছ ওঠার আগে অনেক যত্ন করতে হয় জনাব। একদিনে সে ফুলগাছ ওঠে না। ফুল ফুটলেই হল না, তার যত্ন আত্তিও করতে হয়। আপনি নীল ফুলের কথা ভুলে গেছেন আশা করি?"

সামশের ফোনের স্পিকার হাত দিয়ে ঢেকে আকবরকে বলল, "তুমি এখন এসো। পরে ডাকব"।

আকবর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সামশের ফোন ধরে বলল, "না জনাব। তা ভুলব কেন? মকসদ কি কেউ এত সহজে ভুলে যায়?"

মৌলানা বলল, "আপনারা তো আমাকে ভুলেই গেলেন। মালি যদি ফুলের কুঁড়িদের ভুলে যায়, তাহলে কী করে হবে? একদিনের চেষ্টায় আপনি ওই পোস্টে গেছেন আলি সাহাব? আমাদের পরিশ্রমকে ভুলে যাচ্ছেন বুঝি? নাকি পূর্ব পুরুষের পরিশ্রমকেও মনে করতে চাইছেন না?"

সামশের সোজা হয়ে বসল, "জি জনাব, গুস্তাখি মাফ করবেন, তবে অনেকদিন হয়ে গেল, এই নিয়ে আমার কাছে কোন ইনফরমেশন আসে নি"।

মৌলানা বলল, "দায়টা শুধু আমাদের? আপনার না? পাকিস্তানের ভালর জন্য শুধু আমরাই ভেবে যাবো? আপনাদের ওখানে কী করতে রাখা হয়েছে?"

সামশের বলল, "জি জনাব, আপনার হুকুমই শিরোধার্য। আমি দেখছি কী করতে পারি"।

মৌলানা বলল, "দেখা বা না দেখার দিন চলে গেছে জনাব। আমি ইসলামাবাদ পৌঁছবো খুব শিগিগিরি। এই সময়ে আমার কোন আই ডি তৈরি করা হবে, আমায় কী কভার দেওয়া হবে, সেগুলো ঠিক করে রাখুন। মনে রাখবেন, নীল ফুলের ঠিক ঠাক যত্ন করতে হলে আমাদের যত্নও করতে হবে। বিন্দুমাত্র অযত্ন অনেক সমস্যা তৈরি করতে পারে। ঠিক বলছি তো?"

সামশের বলল, "জি জনাব। আপনি যেভাবে বলবেন, তেমনই হবে। আমি ব্যবস্থা করছি"।

মৌলানা বলল, “রফিক সাহেবের খবরটা পেলাম। খুব দুঃখ পেলাম”।
সামশের বলল, “কোন রফিক সাহেব জনাব?”
মৌলানা ফোন কেটে দিল। সামশের কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল।
পরক্ষণেই “শিট” বলে চেম্বার থেকে বেরোল। আকবর তার ডেস্কে বসে ছিল। সামশের বলল, “ঢাকার এজেন্টকে ইমিডিয়েটলি বল আমাদের অফিশিয়াল মেইল করতে। রফিকের খবরটার অফিশিয়াল কনফার্মেশন পাঠাতে বল”।
আকবর বিস্মিত হয়ে বলল, “আপনিই তো জনাব খবরটা আটকে রাখতে বলেছিলেন?”
সামশের বলল, “এখন আমিই বলছি। যা বলছি কর”।
আকবর বলল, “জি জনাব”।
সামশের অস্থির হয়ে পায়চারি শুরু করল। মৌলানার ফোন তার মাথা খারাপ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

৩১

রাত বারোটা। মুম্বই।
দুজনে চুপ করে বসে আছে।
শাহিদ বিরক্ত গলায় বলল, “আমি জানতাম চাচাজান ফোন করবে না। এভাবে হয়? আমরা কি এখানে বাশারের আশ্রমে থাকতে এসেছি নাকি?”
রশিদের চোখ মুখ কঠিন হয়ে গেছে। সে বলল, “আমি তো তোকে বলেছিলাম। ঠিক আছে। আমরা আর ফোন করব না। এর পর কী করতে হবে, আমিই বলব”।
শাহিদ বলল, “কিছুই বলার নেই। চল হেঁটে আসি”।
রশিদ বলল, “এত রাতে?”
শাহিদ বলল, “রাতের কী আছে? আমাদের কাছে আর কী রাত কী দিন। চল”।
রশিদ বলল, “ঠিক আছে। চল”।
দুজনে বেরোল। আশ্রমের বাগানের মাঝ বরাবর সুদৃশ্য রাস্তা। দামী মারবেল দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। বাগানের মাঝে সুদৃশ্য ফোয়ারা।
রশিদ বলল, “আমার কেন জানি না, মনে হচ্ছে চাচাজান ইচ্ছে করে দেরী করছে”।
শাহিদ বলল, “কেন? দেরী করার কি কোন কারণ আছে? আর যদি সেটা করেও, আমাদের জানাচ্ছে না কেন?”
রশিদ বলল, “হতে পারে চাচাজান ভেবেছে বাশার আমাদের সামলে নেবে”।
শাহিদ রেগে গেল, “চাচাজান কি বাশারকে আমাদের থেকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে?”
রশিদ দাঁড়িয়ে গেল। বলল, “একজন পাকিস্তানি এই দেশে এসে এত বড় সাম্রাজ্য তৈরি করে ফেলল কয়েক বছরের মধ্যে, তোর কি মনে হয় না চাচাজান আমাদের থেকে ওকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ভুল করেছে?”
শাহিদ বলল, “কেন? বাশারের জায়গায় আমরা এলে পারতাম না?”
রশিদ বলল, “আমি মনে করছি না তো। চাচাজান কী মনে করে সেটা বলছি”।
ফোয়ারার সামনে একটা বছর সাতেকের ছেলে দৌড়ে এল। তার পেছন পেছন একজন আশ্রমিক। বাচ্চাটা রশিদের পেছনে গিয়ে লুকল। আশ্রমিক বলল, “বাবা বলরাম, এত রাতে দুষ্টুমি করে না, ঘরে চল বাবা”।
রশিদ আশ্রমিককে বলল, “এ এত রাতে জেগে আছে কেন?”
আশ্রমিক বলল, “বাবাজী নেই তো, তাই ঘুমাচ্ছে না। ও সেই সন্ধ্যে থেকে বায়না ধরেছে বাবাজীর কাছে যাবে বলে”।
রশিদ বলল, “বাবাজীর খুব প্রিয় এই ছেলে?”

আশ্রমিক বলল, “হ্যাঁ, বাবাজি ওকে বেনারস থেকে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর থেকে আশ্রমেই থাকে”।
বাচ্চাটা আবার দৌড়ে পালাল। আশ্রমিক তার পেছন পেছন গেল। শাহিদ বলল, “এতিমখানাও খুলেছে বাশার”।
রশিদ বলরামকে দেখছিল চোখ ছোট ছোট করে। বলল, “এই বাচ্চাটা বাশারের খুবই প্রিয়।”
শাহিদ বলল, “হ্যাঁ। তাই তো বলল। ব্যাটা সত্যি সত্যিই নিজেকে পয়গম্বর ভেবে ফেলেছে। ডানা খুব বড় হয়ে গেছে”।
রশিদ বলল, “ডানা বাড়লে ছাটার দরকার তো থাকেই। যে কাজে পাঠানো হয়েছে, সে কাজ না করে যদি পয়গম্বর সেজে ঘুরে বেড়ায় আর চাচাজান এগুলো দেখেও না দেখার ভান করে থাকে, তাহলে কী করার আছে?”
বাচ্চাটা এতক্ষণে আশ্রমিকের হাতে ধরা পড়ল। রশিদ ডাকল। আশ্রমিক বাচ্চাটিকে নিয়ে এল। রশিদ বলল, “বলরাম, সকালে আমাদের কাছে এসো। তোমার জন্য স্পেশাল গিফট আছে”।
বলরাম বড় করে ঘাড় নেড়ে পালাল।
শাহিদ বলল, “তুইও বাশারের মত হয়ে গেলি নাকি? বাচ্চাটাকে আবার কী স্পেশাল গিফট দিবি?”
রশিদের পকেট থেকে ফোন বেজে উঠল। রশিদ চমকে শাহিদের দিকে তাকাল। এই ফোনটা বাশার দিয়ে গেছিল। ইন্ডিয়ান নাম্বার থেকে ফোন এসেছে। রশিদ ধরল, “হ্যালো”।
“ভাইজান, হালাল বকরির বিরিয়ানি শেষ কবে খেয়েছিলে?”
রশিদ বলল, “জুম্মাবারে”।
“সকাল আটটায় আশ্রম ঘুরতে যাবো ভাইজান”।
ফোন কেটে গেল। শাহিদ বলল, “কে ফোন করেছে?”
রশিদ বলল, “জানি না। কোড বলল”।
শাহিদ বলল, “বিরিয়ানির কোড?”
রশিদ মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ”।
শাহিদ বলল, “তাহলে কী করবি? আবার অপেক্ষা? একেই হয়ত চাচাজান পাঠিয়েছে”?
রশিদ থমথমে গলায় বলল, “সেটাই মনে হচ্ছে। দেখি কী বলে। এখন তো বাশার নেই”।
শাহিদ বলল, “বাশারের জন্য আমাদের বসে থাকার কোন ইন্সট্রাকশান নেই তো। কাজ এলে চলে যেতে হবে। সেটা কাল হবে নাকি, সেটা জানা নেই”।
রশিদ বলল, “আমার মনে হচ্ছে কালই হবে”।
শাহিদ বলল, “তবে তাই হোক। চল তাহলে শুয়ে পড়ি”।
রশিদ কিছু বলল না। সন্দিগ্ধ মুখে হাঁটতে লাগল।

৩২

ইমান শেখের দোকানের সামনে একটা বড় গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। এত বড় সচরাচর রাজা বাজারে আসে না। দোকানে ভিড় কম ছিল। বীরেন বাইরে গেল।
ইমানের ভাই রজ্জাক গাড়ির ভেতরে বসা কারো সঙ্গে কথা বলছে। বীরেন এগিয়ে গিয়ে শুনতে যাচ্ছিল এমন সময় সায়কের গলা শুনতে পেল “উঁহু, এই ভুল নয়। দূরে থাকো”।
বীরেন চমকে পিছনে ফিরে দেখল একজন বয়স্ক দাড়িওয়ালা পাঠান তাকে এ কথা বলল। এ লোকটাকে তো সে দেখেছে। এদিকে মাঝে মাঝেই আসে।
সে তড়িঘড়ি নিজের বিস্মিতভাবটা গিলে নিয়ে বলল, “ওহ, আর আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি আমাকে ভুলেই গেছেন”।

সায়ক বলল, “কাজটা ভালই করছো। কৌতূহল দমন করতে শেখো। শুধু লক্ষ্য রাখো কী ধরণের লোকজন আসছে। ইমান শেখ আমাদের লোক ছিল। এখন হাঁটতে থাকো। করাচী ভ্যারাইটির গলিতে চলো”।
বীরেন হাঁটতে থাকল। পিছন ফিরে দেখল বুড়ো পাঠানের ছদ্মবেশধারী সায়ক তার থেকে একটা দূরত্ব রেখে ধীরে ধীরে হাঁটছে। করাচী ভ্যারাইটির গলিটা কানা গলি। তেমন লোকজন নেই। গলিতে ঢুকে বীরেন দাঁড়াল। সায়ক এসে বলল, “রজ্জাকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে”?
বীরেন মাথা নাড়ল, “না”।
সায়ক বলল, “ওরা নতুন লোক নেবে। গিয়ে কথা বল”।
বীরেন বলল, “সুলেমানের কী হবে? এখানে তো ভালই জমে গেছিলাম”।
সায়ক বলল, “কমফোর্ট জোনে থেকে কোন মানুষ উন্নতি করতে পেরেছে? তোমাকে এই কারণেই বাজারে ঢোকানো হয়েছিল। ট্রেনিং কমপ্লিট, বাজার বুঝে গেছো। দেখবে ওদের দোকানের সামনে একটা পোস্টার ঝুলিয়েছে, লোক লাগবে। কথা বলতে যাও। যদি পেয়ে যাও, ঢুকে যাবে। যদি না পাও, পরিচিত হয়ে যাবে, মাঝে মাঝে গিয়ে দোকানে বসবে, আড্ডা মারবে”।
বীড়েন বলল, “সুলেমান রেগে যাবে না?”
সায়ক বলল, “চাকরি ছাড়লে রাগবে, না ছাড়লে কেন রাগতে যাবে? ব্যাল্যান্স করতে হবে। চেষ্টা কর। হয়ে যাবে। আমি আসি”।
সায়ক ভিড়ে মিশে গেল। বীরেন কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে সুলেমানের দোকানের গদিতে পৌঁছল। তাকে দেখে সুলেমান বলল, “আরে মিয়াঁ কোথায় গেছিলে?”
বীরেন বলল, “বাথরুমে গেছিলাম জনাব। যাওয়ার পথে কত বড় গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল, সেটাই দেখছিলাম”।
সুলেমান হেসে উঠল, “ইসলামাবাদ ঘুরে এসো একদিন, এরকম কত বড় বড় গাড়ি দেখতে পাবে। এই বাজারে কি আর বড় গাড়ি চাইলেই ঢুকতে পারে? ও হল ভি আই পি গাড়ি”।
বীরেন বলল, “কোন নেতা এসেছিলেন?”
সুলেমান বলল, “এই তো, ইলেকশনের খবর এসেছে। এখন কত নেতার আসা যাওয়া দেখবে। এরা পারেও। সেই তো মিলিটারিই দেশ চালাবে, কেন যে আবার এসব ঝামেলা করতে যায়। তুমি বড় গাড়ি দেখবে তো? সে যাবো তোমাকে নিয়ে একদিন। অনেক রকম গাড়ি দেখিয়ে নিয়ে আসব”।
বীরেন ঘাড় নেড়ে বসে পড়ল। দোকানের লোকেদের সঙ্গে সুলেমান রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করল। সুলেমানের ধারণা জেনারেল নিয়াজি নতুন দল করবেন। নতুন দল করা মানে নিন্দুকদের মুখ বন্ধ রাখার একটা নতুন কৌশল। সেনানায়কেরা ক্ষমতার লোভ সামলাতে পারেন না। নিয়াজিও সেটাই করবেন।
সারাদিন রাজনীতির আলোচনা শুনে আর হিসেব কষে কাটিয়ে দিল বীরেন। রাত ন'টার পর ইমান শেখের দোকানে ঢুকল। রজ্জাক এখন দোকানের মালিক হয়েছে। মূল গদিতে বসছে। তাকে দেখে বলল, “কী লাগবে?”
বীরেন বলল, “জি জনাব আমি কাজের বিজ্ঞপ্তি দেখে এলাম। আপনাদের লোক লাগবে?”
রজ্জাক বলল, “হ্যাঁ সে তো লাগবেই। আগে আমি হিসেবের কাজ দেখতাম, এখন হিসেব দেখলেই তো শুধু হবে না, গোটা দোকান সামলাতে হচ্ছে। তুমি কি হিসেব জানো?”
বীরেন বলল, “আমি সুলেমান মিয়াঁর দোকানে হিসেবের কাজ করি”।
রজ্জাক বলল, “তাহলে? কাজ তো করছ, আবার কাজ চাইতে এসেছো যে”?
বীরেন বলল, “জি জনাব, যদি কিছু বেশি মাইনে পাওয়া যেত, গ্রামে টাকা পাঠাতে হয় তো”।
রজ্জাক বলল, “সে ঠিক আছে, সুলেমানের সঙ্গে তো আমাদের ভাল সম্পর্ক। ওর লোক নিলে আবার সেটা খারাপ হতে পারে। তুমি খবর রাখো, আমি লোক না পেলে তোমাকে নেব না হয়। কত দিচ্ছে সুলেমান?”

বীরেন বলল, “জি, পাঁচ হাজার রূপী, সঙ্গে খাওয়া দাওয়া”।
রজ্জাক বলল, “ঠিক আছে। তুমি খবর রাখো। কাউকে না পেলে তো রাখতেই হবে। আমি না হয় তোমায় সাত হাজার দেবো, পরে আরো বাড়িয়ে দেব। চলবে?”
বীরেন বলল, “জি জনাব”।
রজ্জাক বলল, “তোমার ফোন আছে?”
বীরেন মাথা নাড়ল, “না”।
রজ্জাক বলল, “তাহলে দিন তিনেক পরে দোকানে এসেই খবর নিয়ে যেও”।
বীরেন বলল, “ঠিক আছে জনাব”।
বীরেন বেরিয়ে নিজের মনেই হাসল। সায়ক তাকে আচ্ছা ঝামেলায় ফেলে দিল!

৩৩

সকাল আটটা।
দয়াসাগর আশ্রমের গেটের বাইরে রশিদ আর শাহিদ দাঁড়িয়ে আছে। শাহিদ বলল, “ওই নাম্বারে একবার ফোন করলে হত না?”
রশিদ বলল, “না। কোন দরকার নেই। দেখা যাক”।
মিনিট খানেক পরে একটা বড় গাড়ি এসে দাঁড়াল। একই সঙ্গে রশিদের ফোন বেজে উঠল। রশিদ ফোন ধরতে গাড়ির দরজা খুলে গেল। রশিদ শাহিদকে নিয়ে গাড়িতে উঠল। গাড়ি চলতে শুরু করল। গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ নেই।
রশিদ ড্রাইভারকে বলল, “আর কেউ আসে নি”?
ড্রাইভার বলল, “না ভাইজান”।
এসির তাপমাত্রা হিমশীতল করে দেওয়া হয়েছে। দুজনে চুপ করে গাড়িতে বসে রইল।
ঘন্টাখানেক বাদে গাড়িটা একটা মাঝারি মাপের হোটেলে এসে দাঁড়াল। ড্রাইভার বলল, “রুম নাম্বার তিনশো সাত। রিসেপশনের দিকে যেতে হবে না। লিফটে উঠে যান”।
দুজন তাই করল। তিনশো সাত নম্বর রুমে ডোর বেল বাজাতে দরজা খুলে গেল। রশিদ ঘরের ভিতর ঢুকে দেখল একজন যুবক টিভি দেখছে। রশিদ বলল, “আপনি ফোন করেছিলেন?”
যুবকটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “মুম্বইতে স্বাগত। আমি উমর। বিলালের ছেলে। আমাকে মনে আছে আপনাদের?”
রশিদ এবং শাহিদের চোখ মুখ পাল্টে গেল। এতক্ষণ তারা সন্দিগ্ধ ছিল। এবার তারা স্বাভাবিক হল। শাহিদ বলল, “তোমার বাবা কোথায়? আমরা কত ভাল বন্ধু ছিলাম জানো?”
উমর বলল, “বাবা তিন বছর আগে চলে গেছেন। যাওয়ার আগে আপনাদের কথা বার বার করে বলেছিলেন”।
রশিদ বলল, “চাচাজানের কথাও বলেছে?”
উমর মাথা নাড়ল, “জি’।
তিনজন বসল। শাহিদ বলল, “তুমি কখনো বাশারের সঙ্গে দেখা করতে যাও নি?”
উমর বলল, “হ্যাঁ। মাঝে মাঝেই উনি আমাকে ডেকে নিতেন। ওর কথাতেই আমি জিনিসপত্র স্টোর করতে শুরু করেছিলাম। আপনার কি এখনই স্টোররুমে যাবেন?”
রশিদ বলল, “তার আগে জায়গা আর প্ল্যান জানতে হবে”।
উমর বলল, “প্ল্যান এখনও কিছু আসে নি, তবে একটু আগে আমার কাছে মেসেজ এল, আমাদের কালকের মধ্যে মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে”।

রশিদ বলল, "মুম্বইতেই?"
উমর মাথা নাড়ল, "জানি না"।
রশিদ বিরক্ত গলায় বলল, "এভাবে হয় নাকি? কী করতে হবে, কোথায় করতে হবে, না জানলে কী করে হবে?"
উমর বলল, "আজ রাতে আরেকজন আসার কথা। বাকিটা উনি জানেন হয়ত"।
রশিদ উমরের দিকে তাকিয়ে বলল, "উমর, চাচাজান কিন্তু এবার আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছেন। অন্য সব মিশনে প্ল্যান আগে থেকে ঠিক করা থাকে। আমাদের অন্ধকারে রেখে লাভ কী হচ্ছে?"
উমর বলল, "ধরা পড়ার পর সবাই গড় গড় করে প্ল্যান বলে দেয়। চাচাজান সে ঝুঁকি নিতে চান নি হয়তো"।
রশিদ রেগে গেল, "অন্য সবাই আর আমরা এক? উনি জানেন না আমাদের?"
উমর বলল, "আমি একটা সম্ভাবনার কথা বললাম শুধু। এই কারণেই কিছু চাই নি। আপনারা রেগে যাবেন না। আমার আব্বুর বন্ধু আপনারা। আপনারা আমার উপর রেগে গেল কষ্ট পাবো"।
উমরের কথায় রশিদের রাগ খানিকটা কমল। সে সোফায় বসে পড়ে বলল, "যেভাবে সব চলছে, তার দুটো মানে দাঁড়ায়। হয় সব কিছু নিখুঁত প্ল্যান হয়ে আছে, নয়ত কিছুই হয় নি। চাচাজান কাঁচা কাজ করার লোক না। তাহলে..."
শাহিদ বলল, "সব কিছু প্ল্যান করা আছে। আমাদের শুধু কাজটা জানতে হবে ইনশাল্লাহ"।
উমর উঠল। একটা প্যারাস্যুট কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে এসে টেবিলের উপর রেখে ব্যাগ থেকে একটা ছোট জ্যাকেট বের করে টেবিলের উপর রাখল। বলল, "এই জ্যাকেটটা আপনাদের কার হবে"?
শাহিদ বলল, "এতো ছোটদের জ্যাকেট। আমাদের কারো হবে না"।
উমর বলল, "এটা লাস্ট এপ্রিলে বাশারচাচা আমাকে দিয়েছিল। জিজ্ঞেস করলে বলেছিল সময়ে কাজে দেবে"।
রশিদ জ্যাকেটটার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, "বাচ্চাদের জ্যাকেট। আচ্ছা?"
জোরে হেসে উঠল রশিদ। শাহিদকে কানে কানে কিছু একটা বলল, তারপর দুজনেই হেসে উঠল। শাহিদ বলল, "শাবাশ চাচাজান"।

৩৪

শুভকে তুষার ফোন করে কয়েকটা নির্দেশ দিয়েছিলেন। শুভ বেরিয়ে গেল বিকেল নাগাদ। রাতে শুভ তারেক হাসানকে নিয়ে এল।
আশরফ তারেককে দেখে বললেন, "কাশ্মীর ২০০৩? হাসান না?"
হাসান আশরফকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "যাক। মনে আছে তাহলে। আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম কে জানে? প্রথমে তুষার স্যার, তারপরে তোমরা। যাক, আমাকে মনে আছে এখনও"।
মাথুর তারেককে দেখে চোখ পিট পিট করে বললেন, "কী খাবার এনেছ আগে বলো তো। শুভ কোথায় একটা নিয়ে এল, সর্বক্ষণ আতঙ্কে থাকতে হচ্ছে"।
তারেক বললেন, "এ দেশে এসেছ যখন, খাবারের চিন্তা তোমাদের করতে হবে না। বাংলাদেশ পুলিশ এখন হাই অ্যালার্টে চলে গেছে। বাংলাদেশে সব সময় দুটো সত্ত্বা কাজ করে। ওদের নিজেদের লোকেদেরই দেখাতে হয় যে ওরা ইন্ডিয়ার হয়ে কাজ করছে না"।
আশরফ বললেন, "আর রফিক যে এখানে ফ্রিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তার বেলা?"
তারেক বললেন, "রফিকের অনেক চামচা আছে। ক'টাকে ধরবে? কাশ্মীরে যেমন তুমি বুঝতে পারবে না কোনটা পাকিস্তানী আর কোনটা স্বাধীনপন্থী, এখানেও অনেকটা এক। সরকারের উপর অনেক চাপ থাকে।

ইন্ডিয়ান জাসুস এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে খবর পেলে সরকারের মাথা খারাপ করে দেবে বিরোধীরা। পাকিস্তানও ছাড়বে না"।

মাথুর বললেন, "ঠিক আছে। তুমি এবার বল তো আমরা কী করব? মানে এরকম পরিস্থিতিতে অনেকদিন পড়ি নি। কী করব সেটাই তো বুঝে উঠতে পারছি না। তুষার স্যারও সরাসরি কোন সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন না"।

তারেক বললেন, "সেটা তো সাহেব যা অর্ডার দেবেন তাই হবে। আমি আপাতত তোমাদের আমার বউয়ের রান্না খাওয়াতে পারি"। আশরফ বললেন, "আমাদের ফলো করে হচ্ছে। অতো ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। আমরা এখানেই থাকি"।

তারেক চিন্তিত গলায় বললেন, "সেটা ঠিক। আমি কয়েকটা জায়গায় সোর্সদের অ্যাক্টিভ করেছি, দেখা যাক কী হয়। শুভর কাছ থেকে রুকসার নামের মেয়েটির ব্যাপারে শুনলাম। ডেসক্রিপশন শুনে মনে হল রিভেঞ্জ বাহিনীর মেয়ে"।

আশরফ ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "রিভেঞ্জ বাহিনী মানে?"

তারেক বললেন, "১৯৭১ এ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অনেক পরিবার সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সেসব ক্ষতিগ্রস্থরা এখন দেশের গণতন্ত্র রক্ষায় নতুন করে জোট বাঁধছে"।

আশরফ বললেন, "একাত্তরের যুদ্ধে যারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, মানে তখনও যদি জন্ম নেয়, তাদের এখন পঞ্চাশের উপর বয়স হবে। রুকসার তো সরাসরি তাদের কেউ হবে না"।

তারেক বললেন, "তাহলে তাদের ছেলে মেয়ে কেউ হবে। বা আরো অন্য কোন রিলেশন। কিংবা হতে পারে রফিকই টার্গেট ছিল। ইন্ডিয়া বাংলাদেশে রফিকের কম কেচ্ছা আছে নাকি?"

আশরফ বললেন, "উফ। মাথা খারাপ হয়ে গেল। অঙ্কের বাইরে কোন কিছু এলে অবশ্য এটাই হওয়া স্বাভাবিক। রুকসার আমাদের অংকে ছিলই না। কোত্থেকে এসে সব এলোমেলো করে দিল"।

তারেক বললেন, "সেফ হাউজের ঘটনা নিয়ে একটা খটকা থেকেই যাচ্ছে। ঠিক কী কারণে সেফ হাউজে হামলা হল। কে করল? শুভ, এই শুভ"।

শুভ সোহানদের সঙ্গে মিলে রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিল। তারেকের কথা শুনে ঘরে ঢুকল। তারেক বললেন, "রুকসার তোমার হদিশ পেল কী করে? ওই বা কী করে জানল তুমি কী করছ, কাদের সঙ্গে যুক্ত?"

শুভ বলল, "আমাদের নাটকের ক্লাবে ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। মাস ছয়েক আগে ও আমাদের জয়েন করেছিল। বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করলে বলত পুরান ঢাকায়। প্রচণ্ড অ্যাম্বিসাস মনে হত। খুব ভাল অভিনয় করত। আমাকে বলেছিল ও সিনেমা করতে চায় এবং তার বিনিময়ে ও সব কিছু করতে পারে"।

তারেক রেগে গেলেন, "আর সেটা জেনে তুমি ওকে রফিকের কাছে পাঠিয়ে দিলে? তুমিই তো আসল ব্লান্ডারটা করেছো"।

শুভ বলল, "বন্ধুত্ব হয়েছিল। দেখে মনে হত মিথ্যা বলার মেয়ে না। আমি তো এখনও বুঝতে পারছি না রুকসার কী করে আমাকে ইউজ করে নিল। ও যে এত দূর যাবে, বুঝতেই পারি নি। স্যারেরা হানিট্র্যাপের কথা বলায় আমার ওর নামই মাথায় এসেছিল"।

তারেক বললেন, "কত বড় ব্লান্ডার করেছো তুমি বুঝতে পারছো? মিথ্যে কথা বলার লোক না বলে তোমার মনে হয়েছে? মনে হবার উপরে আমাদের কাজ চলে? তুমি জানো না কী কী দেখে নিতে হয়? জানতে না?"

শুভ বলল, "তখন অতোটা গভীরে গিয়ে ভাবি নি। ভেবেছিলাম ও রফিকের থেকে রফিক কোথায় যাবে বের করে ফেললে ওকে টাকা দিয়ে চুপ করিয়ে দেব"।

তারেক বললেন, "আর টাকা। আমার তো এখন চিন্তা হচ্ছে ও তোমার সম্পর্কে কতটুকু জানে"।

শুভ বলল, "জানার তো কথা না। ওর সঙ্গে আমি কোন ব্যক্তিগত কথা কখনই বলি নি"।

তারেক বললেন, "ওরম মনে হয়। মেয়ে দেখলে সবাই দুর্বল হয়ে যায়। তুমি আর তার ব্যতিক্রম হবে কেন?"
শুভ জোরে জোরে মাথা নাড়ল, "এটা আপনার একদম ভুল ধারণা। এসব ভাবা ঠিক না"।
তারেক বললেন, "শুভ। তুমি এবার অফ যাও। এখান থেকে মিশন আমি টেক ওভার করব। আমি তুষার স্যারকে বলে দিচ্ছি"।
শুভ ম্লানমুখে মাথা নাড়ল।

৩৫

রাত এগারোটা। তুষার কফি নিয়ে স্টাডি রুমে বসেছেন।
ইরাবতী বললেন, "এখন কফি? রাতে ঘুমনোর ইচ্ছে নেই নাকি?"
তুষার বললেন, "কিছু একটা ওয়ে আউট বের করতে হবে। ঢাকায় একটা জট পাকিয়ে গেছে"।
ইরাবতী বললেন, "কী রকম জট?"
তুষার বললেন, "ছোট জট। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি এই জটটা খুলতে পারি, তত ভালো"।
ইরাবতী বললেন, "ঢাকায় খান আর মাথুর দুজনেই তো আছে। ওরা কিছু একটা উপায় বের করবে"।
তুষার বললেন, "আমি দেখেছি, যে ব্যাপারটা নিয়ে আমরা বেশি উত্তেজিত হয়ে যাই, সেখানেই সব ভুলগুলো করি"।
ইরাবতী বললেন, "ড্যামেজ হয়েছে? সেটা কি খুব বেশি? কন্ট্রোল করা যাবে না"?
তুষার বললেন, "যাবে। সেটাই চেষ্টা করতে হবে এখন"।
ইরাবতী বললেন, "ঠিক হয়ে যাবে। বেশি ভেবো না। আজ সাউথ ব্লকে গেছিলে কেন?"
তুষার বললেন, "স্পেশাল মিটিং ছিল। এজেন্সির ষোলটা ভাগ হচ্ছে। তার মাথায় আমাকে রাখা হবে। আমি বার বার করে বললাম, এবার আমার রিটায়ারমেন্টের সময় এসে গেছে। ছেড়ে দিন। কিছুতেই শুনল না। বলছে আমাকে দেশের এখন দরকার"।
ইরাবতী বললেন, "সমস্যা কোথায়? বরং তুমি অলস হয়ে বসে থাকলে আরো বেশি সমস্যায় পড়ে যাবে। যতদিন সক্ষম আছো, লড়ে যাও"।
তুষার বললেন, "এক একজন প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসেট এখন দেশের বাইরে। সায়ক কী করছে, বীরেন কী করছে, খান, মাথুর কী করছে, সারাক্ষণ মাথায় ঘুরতে থাকে। দেশের ভিতর কিছু হলে আমরা সেই লড়াইটা করতে পারি, বাইরে থাকলে কী করব? পাকিস্তানে তো কোন প্রশ্নই নেই, বাংলাদেশ নিয়েও অনেকগুলো দ্বিধা আছে"।
ইরাবতী বললেন, "বাংলাদেশ তো বন্ধু দেশ। ওরা ১৯৭১ নিয়ে আমাদের উপর যথেষ্ট কৃতজ্ঞ"।
তুষার ম্লান হাসলেন, "ব্যাপারটা অতো সোজা না। ওদের মধ্যে পাকিস্তানের সমর্থক প্রচুর। বিষয়টা পাকিস্তান বা আফগানিস্তান না, বিষয়টা হল ঠিক ভুলের। সবাই সেটা বুঝতে পারে না। পাকিস্তান কেন বাংলাদেশের মাটিকে ব্যবহার করে ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাসী সংগঠন চালিয়ে যাবে? বাংলাদেশই বা সেটা হতে দেবে কেন? অনেক সময় ইচ্ছে থাকলেও ওরা পারে না। কিন্তু কূটনীতিতে সবাইকে ওভাবে বন্ধু ভাবা যায় না। বন্ধু থাকলেও আমাদের লাভ ক্ষতির হিসেব আমাদেরই করে রাখতে হয়"।
তুষারের ফোন বেজে উঠল। তুষার দেখলেন আননোন নাম্বার থেকে ফোন এসেছে। ইরাবতী উঠে বললেন, "আমি বেডরুমে গেলাম। তুমি দেরী কোর না। রাত জাগলে আবার শরীর খারাপ হবার চান্স থাকে"।

তুষার ফোন ধরলেন। ও প্রান্ত থেকে গান ভেসে এল, "অ্যায় মেরে প্যারে ওয়াতান। ভাল আছেন তো স্যার?"
সায়ক। তুষার বললেন, "আমি ভাল আছি। তোমাদের নিয়ে চিন্তাতে আমার মাথা খারাপ হবার জোগাড় হয়েছে। কী খবর তোমাদের"?"
সায়ক বলল, "বিশেষ কোন খবর নেই স্যার। আমি জানি আপনি বীরেনকে নিয়ে চিন্তায় আছেন, আপনাকে জানিয়ে দিই, বীরেন ঠিকই আছে। নিরাপদে আছে"।
তুষার বললেন, "আর নিরাপদ। পদে পদে যে দেশে বিপদ, সে দেশে তুমি নিরাপদের কথা বলছ"।
সায়ক বলল, "তাহলে কথাটা রিভাইস করে বলি, আপাতত নিরাপদে আছে"।
তুষার বললেন, "হ্যাঁ। সেটা বলতে পারো"।
সায়ক বলল, "ইমানের দোকানে অনেকদিন পরে কবুতরের লোক এসেছিল। রজ্জাকের সঙ্গে কথা বলেছে। রজ্জাককে ওরা বিশ্বাস করতে পারছে না"।
তুষার বললেন, "তাতে আমাদের কোন ক্ষতি নেই। রজ্জাক কিছু জানেও না"।
সায়ক বলল, "কাশ্মীরে ওরা একটা লোকাল নিউজ চ্যানেল খুলেছে। ক্রমাগত ভারত বিরোধী প্রচার হচ্ছে। ওদের ফান্ডিং করছে কবুতর"।
তুষার বললেন, "কাশ্মীরে আবার ওরা ঢুকছে। আজকেও দুজনকে খুঁজে মারা হয়েছে। ওরা গ্রামে গ্রামে ঢুকে গেছে, মানুষের ঘরে ঢুকে গেছে। সাধারণ কাশ্মীরিরা ওদের আশ্রয়ও দিচ্ছে। এইসব নিউজ চ্যানেল আরও বেশি করে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। কত আর বন্ধ করা যায়? একটা বন্ধ করলে আরেকটা চলে আসছে"।
সায়ক বলল, "বাইরে থেকে ফান্ডিং আসছে। ফান্ডিং এর সোর্স বের করুন স্যার। ফান্ড বন্ধ হলে ওদের পাখনা কেটে দেওয়া যাবে। গুড নাইট স্যার। আজ আর কথা বলা যাবে না"।
ফোন কেটে গেল। তুষার চিন্তিত মুখে বললেন, "অ্যাবসোলিউটলি রাইট বড়াল। ফান্ডিং সোর্স। দেখা যাক কী করা যায়"।

৩৬

"আজ সন্ধ্যেবেলা নামাজ পড়ে এসে আমার বাড়ি নিয়ে যাবো তোমায়। আমার ছোট ছেলের জন্মদিন আছে"।
সুলেমান কাজ করতে করতে বলল। বীরেন অপ্রস্তুত হল। আজকেই সে সুলেমানকে ইমান শেখের দোকানে কাজ করার কথা বলবে ঠিক করেছিল। রজ্জাক বলেছে সে জয়েন করতে পারে। ওর হিসেবের লোকের দরকার, এদিকে সেরকম বিশ্বস্ত কাউকে পাচ্ছে না। রজ্জাকও নিশ্চয়ই খোঁজ নিয়েছে তার ব্যাপারে। বুঝেছে সে কাজের ছেলে এবং বিশ্বস্ত।
বীরেনের একটু মন খারাপ হচ্ছিল। সুলেমান লোক ভাল। মন পরিষ্কার। বাজারের অনেক দোকানকদারই কর্মচারীদের মানুষ বলে ভাবে না। সুলেমানের সে দোষ নেই। তাকে পছন্দ করে।
বীরেন বুঝতে পারে সুলেমানকে ঠিক করে কথাটা বলতে হবে, নাহলে সুলেমান দুঃখ পাবে। নিজের দেশ ছেড়ে এসে, তথাকথিত শত্রু দেশের একজন মানুষের প্রতি হয়ত এরকম অনুভূতি আসা উচিত না, কিন্তু মানুষের সঙ্গে না মিশলে বোঝা যায় না দেশ বিভেদেও তারা মানুষই থাকে। তাদের ভালোবাসা, রাগ, দুঃখ সব আছে। মানবিক অনুভূতি, বন্ধুত্ব সব কিছু ভুলেই হয়। তার জন্য আলাদা কোন শর্ত থাকে না।
ভাল মানুষদের জন্য শত্রুতা মুলতুবি রাখাই ভাল।
সারাদিন ব্যস্ততায় কেটে গেল। মাগরেবের নামাজের সময় সুলেমান বলল, "চল চল শোয়েব, আর দেরি করা ঠিক হবে না। মসজিদ থেকে বাড়ি চলে যাবো। চল বেরোনো যাক"।

দুজনে বেরোল। বাজারের মাঝখান দিয়ে যাবার সময় প্রতি মুহূর্তে বীরেনের মনে হচ্ছিল এবার বলে দেওয়াই ভাল। মসজিদের সামনে গিয়ে ঠিক করল ওর বাড়িতে গিয়েই বলবে। সুলেমানের ছেলের জন্য কোন উপহার কেনাও দরকার। মসজিদে ঢোকার ঠিক আগে বীরেন দেখল একটু দূরে সায়ক দাঁড়িয়ে আছে আগের ছদ্মবেশে। তাকে ইশারায় ডাকছে।
বীরেন বলল, "মিয়াঁ আপনি যান, আমি একটু পরে আসছি"।
সুলেমান অবাক হয়ে বলল, "কী হল আবার?"
বীরেন বলল, "একটা কাজ মনে পড়ে গেল। আপনি যান"।
সুলেমান বলল, "কী যে কর না। ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি এসো"।
সুলেমান মসজিদে প্রবেশ করল। বীরেন সায়কের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সায়ক ফিসফিস করে বলল, "ফুলের দোকানের পাশে এসো"।
বীরেন বলল, "মাগরেবের নামাজটা পড়ে এলে হত না?"
সায়ক বলল, "না। কথা আছে। এসো"।
সায়ক হাঁটতে শুরু করল। বীরেন তার পিছনে গেল। ফুলের দোকানের পাশের দাঁড়িয়ে সায়ক বলল, "রজ্জাক কী বলছে?"
বীরেন বলল, "কাজ হয়ে গেছে। জয়েন করতে বলছে"।
সায়ক বলল, "বলেছে যখন জয়েন কর নি কেন?"
বীরেন বলল, "সুলেমানকে বলতে হবে তো"।
সায়ক বলল, "বলে ফেলো। দেরী করছো কেন? মায়া পড়ে গেছে? এখানে মায়ার কোন জায়গা নেই। শক্ত হও এবং পারলে কালকেই জয়েন কর"।
বীরেন মাথা নাড়ল।
সায়ক বলল, "এবার যাও"।
বীরেন মাথা নেড়ে মসজিদের দিকে হাঁটতে শুরু করতেই সায়ক তার হাত চেপে ধরল। বীরেন অবাক হয়ে সায়কের দিকে তাকানোর সময়টুকু পেল না। তীব্র শব্দে চতুর্দিকে কেঁপে উঠল। সায়ক চেঁচিয়ে উঠল, "শুয়ে পড়। শিগগিরি"।
বীরেনের মাথা ঘুরে উঠল। সে রাস্তায় শুয়ে পড়ল। আর্ত চিৎকার, হাহাকারে চারদিক ভরে উঠছে। সায়ক বলল, "ব্লাস্ট হয়েছে। মসজিদে। শুয়ে থাকো। ক'টা বোম আছে কে জানে"। মানুষের ছোটাছুটির মধ্যে দেওয়ালের পাশে চোখ বন্ধ করে মিনিট পাঁচেক বসে থাকল বীরেন। মাথা কাজ করছে না। সুলেমান মসজিদের ভেতরে গেছিল ভাবতেই বমি চলে এল। রাস্তার উপর হড় হড় করে বমি করে দিল সে।
সায়ক বলল, "কপালজোরে বেঁচে গেলে। আমি না ডাকলে মসজিদের ভেতর তুমিও থাকতে। উফ, এই দেশ"!
বীরেন মসজিদের দিকে তাকাল। ভয়াবহ দৃশ্য। একটু আগেও যেটা কল্পনাতেও ছিল না, সেটাই হল।
হাঁটুর নিচে ব্যথা হচ্ছিল। এতক্ষণ পর খেয়াল হল। প্যান্ট তুলে দেখল পা থেকে রক্ত পড়ছে। সায়কেরও চোখে পড়েছে সেটা। বলল, "কাঁচ লেগেছে মনে হচ্ছে। চিন্তা নেই। ক্লিনিকে যাও। সেরে যাবে"।
বীরেন অসহায় গলায় বলল, "সুলেমান বাঁচবে না?"
সায়ক তার পিঠে হাত রেখে বলল, "আগে নিজে বাঁচো। মায়া পরে কোর। চল, পা দেখিয়ে নাও। রেস্ট করতে হবে আজকে। সুলেমানের দোকানেই যাও। এখনই উবে গেলে সন্দেহ হবে ওদের"।
বীরেন শূন্য চোখে মানুষজনের হাহাকার দেখছিল। কী অদ্ভুত এই ভূখণ্ড! মানুষের প্রাণের কোন মূল্যই নেই?

৩৭

প্রেসিডেন্ট নিয়াজী তার অফিসে কাজ করছিলেন। তার সেক্রেটারি আক্রম এসে বলল, "জনাব"।

নিয়াজী আক্রমের দিকে তাকালেন, "বল"।

আক্রম বলল, "রাওয়ালপিন্ডি রাজা মার্কেটের মসজিদে ব্লাস্ট হয়েছে কিছুক্ষণ হল"।

নিয়াজী বললেন, "শিয়া মসজিদ?"

আক্রম মাথা নাড়ল, "না জনাব। সুন্নি মসজিদেই হয়েছে"।

নিয়াজি বললেন, "এখানে আবার কে ব্লাস্ট করতে যাবে? বালোচদের কেউ? সামশেরকে ফোন কর। তুমি বস"।

আক্রম বসে সামশেরকে ফোন করল। সামশের ধরে সালাম করল।

আক্রম সামসেরের সালামের উত্তর দিয়ে বলল, "জনাব, আপনার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট সাহেব কথা বলবেন"।

আক্রম ফোনটা নিয়াজির দিকে এগিয়ে দিলেন। নিয়াজি ফোন ধরে বললেন, "রাজা মার্কেটে ব্লাস্ট হয়েছে?"

সামশের বলল, "জি জনাব। আমি এখন ওখানেই যাচ্ছি"।

নিয়াজি অবাক হয়ে বললেন, "আপনি যাচ্ছেন? আপনাকে কেন যেতে হচ্ছে?"

সামশের বলল, "আমি রাওয়ালপিণ্ডিতেই আছি এখন জনাব। নিজে গিয়ে দেখাই তো ভাল"।

নিয়াজি বললেন, "হ্যাঁ, সেটা হলে খুবই ভাল হয়। রাজা মার্কেটের মত এত জনবহুল এলাকায় এই ব্লাস্টটা যথেষ্ট চিন্তার ব্যাপার। এটা তো ইন্টেলিজেন্স ফেইলিওরের মধ্যে পড়ছে, তাই না?"

সামশের চুপ করে গেল। বোঝার চেষ্টা করল নিয়াজী তাকে দোষ দিচ্ছেন কি না। একটু থেমে বলল, "জনাব, আমাকে একটা দিন সময় দিন। যারা এই কাজ করবে, তাদের আমরা ছাড়ব না। এর শেষ দেখে ছাড়ব"।

নিয়াজী বললেন, "গুড। টেক কেয়ার"।

সামশেরের উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ফোন কেটে দিলেন নিয়াজি। আক্রমের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আক্রম, সামশেরের কাজকর্ম তোমার কেমন লাগে?"

আক্রম বলল, "জনাব, আমি ওঁর সম্পর্কে কী বলব?"

নিয়াজি বললেন, "নির্দ্বিধায় বল। আমি জানতে চাইছি"।

আক্রম বলল, "মুজফফরাবাদে থাকাকালীন উনি বেশ কয়েকবার উপরতলার কথা না শুনে লস্করের ছেলেদের এল ও সি পার করাতে গিয়ে শো কজ খেয়েছিলেন। ওর ট্র্যাক রেকর্ড খুব একটা ভাল নয়। তবু ওর আগের লোকেদের কারো দুর্ঘটনায় মৃত্যু, কারো বা খুন, ওকে খুব তাড়াতাড়ি চিফের পজিশন দিয়েছে। আজাদ কাশ্মীরে যে ক'টা অর্গানাইজেশন অপারেট করছে, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ওর খুব ভাল সম্পর্ক"।

নিয়াজি বললেন, "এন্ড ইভেন হি ক্যান ডিজওবে মি, ইফ হি থিঙ্কস, রাইট?"

আক্রম মাথা নাড়ল, "জি জনাব। সামশেরের আলাদা নেটওয়ার্ক আছে"।

নিয়াজি বললেন, "নিজের নেটওয়ার্ক থাকা ভাল, ধরে নিলাম সব কিছুর পরেও সেটা পাকিস্তানের ভালর জন্যই করা হয়েছে, তবু এভাবে মসজিদে ব্লাস্ট হলে ও নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। সম্ভবত এই জন্যই ও ঘটনাস্থলে যাচ্ছে। নজর রাখতে হবে। সামশের ইজ এ ভেরি কানিং পারসন। ওর অফিসে তোমার লোক অ্যাড কর। সামশেরের প্রতিটা কাজ কর্মের হদিশ যেন আমার কাছে আসে"।

আক্রম বলল, "জনাব, এরকম ব্লাস্ট কি ভোটে এফেক্ট ফেলবে?"

নিয়াজি মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করে বললেন, "না। ওসবে কিছু হয় না। সমস্যা হল, এই নিউজটা পশ্চিমি আর ইন্ডিয়ান মিডিয়া ফলাও করে দেখাবে। এইভাবে দেশের নাম খারাপ হয়। আমরা সেটা হতে দিতে পারি না। রাওয়ালপিন্ডি পুলিশকে ইন্সট্রাকশান পাঠাও, অকুস্থলে কোন রকম মিডিয়াকে যেন প্রবেশ করতে দেওয়া না

হয়। এলাকাটা আইসোলেট করে দিতে হবে মিডিয়ার থেকে। অবশ্য ওখানে আইসোলেট করবেই বা কী করে?”

নিয়াজি চিন্তিত হলেন।

আক্রম বলল, “জনাব আমি পুলিশকে জানাই আইসোলেট করার জন্য আপনি ইন্সট্রাকশন দিয়েছেন। দেখা যাক, ওরা কী করে আপনার ইন্সট্রাকশন এক্সিকিউট করে”।

নিয়াজি বললেন, “এখানে র- এর হাত থাকার চান্স কতটা?”

আক্রম বলল, “ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়ায় আমরা এই ঘটনার দায় র-কেই যদি দিই, তাহলেও এখানে র এর কোন ভূমিকা না থাকারই কথা। আপনি ভোটের ঘোষণা করেছেন, এটা তার জন্য হতে পারে। বালোচরা রাওয়ালপিন্ডিতে আসবেই বা কেন? তাও মসজিদে? তার চান্সও খুব কম”।

নিয়াজি মাথা নাড়লেন, “সামশের থাকলে আমি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি আক্রম। ও কোন কাজের নয়”।

আক্রম বলল, “কিন্তু ও আপনার সময়েই আই এস আই চিফ হয়েছে”।

নিয়াজি অস্থিরভাবে মাথা নাড়লেন, “জানি। খুব ভাল করে জানি। ওই সময়টা আমি ইউ এস এতে ব্যস্ত ছিলাম। তখনই ও চিফ হল। বলতে পারছি না, হয়ত এখানেও ওই কিছু করাচ্ছে। আই নিড টু রিড হিম, নাও”।

প্রেসিডেন্ট নিয়াজির চোয়াল শক্ত হল।

৩৮

রাত এগারোটা। সেফ হাউজের সামনে একটা বাস এসে দাঁড়াল।

শুভকে কিছুক্ষণ আগেই তারেক রিলিজ দিয়ে দিয়েছেন।

ডিনার হয়ে গেছিল।

সবাই বাসে উঠলেন। তারেক ড্রাইভারকে দিক নির্দেশ দিয়ে আশরফের পাশে এসে বসলেন, “হয়ত এই সেফ হাউজটা ছাড়া ভাল সিদ্ধান্ত হল না। কিন্তু আমার কোন কিছুই ঠিক লাগছে না খান। আমি যেখানে নিয়ে যাচ্ছি, সে জায়গায় পাকিস্তানি কুকুর থাকবে না, সেটা তোমাকে নির্দ্বিধায় বলতে পারি”।

খান হাসলেন, “তুমি যদি জাহান্নামেও যেতে বল মিয়াঁ, আমি সেখানে যেতেও রাজি আছি। এখানে তুমিই লিডার। তুমি যা বলবে তাই হবে”। তারেক বললেন, “এখন এসব বলে লাভ আছে বস? তোমরা তো ভুলেই গেছিলে আমাকে। নেহাত এখানে শুভ বাজে ভাবে ছড়ালো বলে তুষার স্যার আমাকে ফোন করলেন। নইলে আমি তো ভেবেছিলাম সংসারী লোক হয়েই এ দেশে আমৃত্যু কাটিয়ে দিতে হবে”।

খান বললেন, “আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বল। এই রিভেঞ্জ বাহিনী অ্যান্টি রাজাকার তো ঠিক আছে। এদের ইন্ডিয়া সম্পর্কে কী মনোভাব? এরা আমাদের শত্রু না বন্ধু?”

তারেক বললেন, “এদের মধ্যে দুটো দল আছে। একদল মুক্তিযুদ্ধে ইন্ডিয়ার কন্ট্রিবিউশন স্বীকার করে, আরেক দল করে না”।

মাথুর রেগে গেলেন, “কেন করবে না?”

তারেক বললেন, “সেটা তুমি জোর করতে পারো নাকি? ওদের আলাদা দেশ, আলাদা সব কিছু। ওদেরও অনেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জিনিসটা জোর করে আদায় করা যায় না। ওরা যখন ফিল করবে, এমনিই আমাদের সঙ্গে থাকবে। তবে কিছুতেই বাংলাদেশকে শত্রু করার কথা ভাবলে চলবে না। পাকিস্তান এখনও এ দেশে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে রেখেছে। একবার সুযোগ পেলেই এখান থেকে এরা নতুন উদ্যোগে অনুপ্রবেশ শুরু করাবে”।

রাতের রাস্তা চিরে বাস যাচ্ছে। এক জায়গায় বাস দাঁড় করানো হল। তারেক নেমে গিয়ে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বাস ছেড়ে দেওয়া হল। আশরফ বললেন, “পরিচিত নাকি?”

তারেক বললেন, "হ্যাঁ। পুলিশে বেশ কয়েকজন পরিচিত আছে। তবে এখানে অন্য সমস্যা। এ রাস্তায় ডাকাতির ভয় আছে বলে গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়"।
খান বললেন, "ভাল তো। দু চারটে ডাকাত থাকা ভাল। সোহান বলছিল এখানে খেয়ে আর ঘুমিয়ে ওর লাইফ স্টাইল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নেট প্র্যাকটিস হয়ে যাবে"।
তারেক বললেন, "এ দেশে আসার পর থেকে যে হারে তোমাদের বাসস্থান পাল্টাচ্ছে, তাতে লাইফ স্টাইলের থেকেও মানসিক সমস্যা বেশি হবার কথা"।
খান বললেন, "এ তো তাও দেশের বাইরে। কাশ্মীরে আমাকে এক সময় সপ্তাহে সাত দিনই আলাদা আলাদা ঠেকে কাটাতে হয়েছিল। অভ্যাস আছে। শুধু এভাবে অলস বসে থাকলে বিরক্ত লাগে"।
তারেক ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসলেন। বড় রাস্তা থেকে কিছুক্ষণ পর বাসটা একটা ছোট রাস্তায় নামল। রাস্তার অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। খানা খন্দে পড়তে পড়তে বাসটা একটা পুরনো অথচ খুব বড় বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।
তারেক বললেন, "চল"।
খান বললেন, "এটা আবার কার বাড়ি? কত বড় বাড়ি এটা বাপরে!"
তারেক বললেন, "এই বাড়ি এক কালে এক হিন্দু জমিদারের ছিল। পরে এ বাড়ি আমার কলিগের বাবা কেনেন। ওর থেকে আমি কিনেছি"।
খান হাঁ করে তারেকের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "করেছো কী তুমি মিয়াঁ? ভাবতেই পারছি না"।
তারেক হাসলেন, "ভাবা না ভাবার কিছু নেই। এ বাড়ির ধারে কাছে কেউ আসে না। হন্টেড বলে কুখ্যাতি আছে। আমরা এখানে বসেই তুষার স্যারের পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করব। যদি নির্দেশ আসে তোমাদের ইন্ডিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়ার, সেটাও এখান থেকেই তোমরা চলে যেতে পারবে। চল"।
সবাই জমিদার বাড়ির ভেতর প্রবেশ করলেন। বড় বড় ঘর।
তারেক বললেন, "এত বড় বাড়ি মেইন্টেইন করা খুব কঠিন ব্যাপার। চারটে ঘর মত ঠিক করা গেছে"।
সোহানরা ঘর দোর দেখে খুশি হয়েছে। পুকুর দেখে বলল, "এখানে কাল স্নান করা যাবে"।
তারেক বললেন, "বাইরে না যাওয়াই ভাল। যা করবে বাড়ির প্রাচীরের ভেতর থেকে করবে। এই বাড়ির কাছের গ্রাম তাও পাঁচ কিলোমিটার দূরে আছে। তবু সাবধানের মার নেই"।
তারেক বেরিয়ে গেলেন।
মাথুর বললেন, "শুধু লুকোচুরি খেলে যাচ্ছি এ দেশে আসার পর থেকে। তুষার স্যার কী চাইছেন বল তো খান?"
খান হাসলেন, "লেটস সি। দ্য বস ইজ অলওয়েজ রাইট"।
মাথুর ঠোঁট ওলটালেন।

৩৯

দয়াসাগর বাবা ফিরেছে। ভক্তরা সব ভিড় করে বাবার পা ছুঁতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। দয়াসাগর ভক্তদের সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকল না। আশ্রমে ফিরে রশিদের ঘরে এসে দরজা ধাক্কাল।
রশিদ দরজা খুলল।
দয়াসাগর ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে বলল, "এত অধৈর্য হবার কী আছে? চাচাজান কি এত তাড়াহুড়ো করতে বলেছিল? আমি বার বার বলেছিলাম যা হবে আমি ফিরে আসার পরে"।
রশিদ বলল, "ঠিক আছে। চিন্তা করছিস কেন? আমরা কাজ এগিয়ে রেখেছি তো। তুই এবার শুধু জায়গা বলবি, এ ছাড়া তোর তো কোন কাজ নেই আর"। বাশার খাটে বসে পড়ল। বলল, "চাচাজানের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। লোকেশন ফাইনাল হয়েছে। মুম্বইতেই"।

শাহিদ বলল, “মুম্বই তোর খুব ভাল লেগে গেছে না? রোজ রোজ নতুন নতুন মেয়ের সঙ্গে শুয়ে পড়ছিস এখন বাশার? তুই তো এখানেই জন্নত পেয়ে গেছিস রে”।
বাশার শাহিদের দিকে রাগী চোখে তাকাল।
শাহিদ বলল, “চোখ কাকে দেখাচ্ছিস তুই? খুব সাহস হয়ে গেছে তোর”।
বাশার বলল, “সাহসটা তোমাদের হয়েছে। আমি এখানে না থাকা অবস্থায় যদি তোমরা ধরা পড়তে, তাহলে এত দিনের প্ল্যান সব নষ্ট হয়ে যেতো”।
রশিদ বলল, “কেন? ধরা পড়তে যাবো কেন?”
বাশার বলল, “তোমরা কী ভেবেছো ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্সকে? ওরা অনেক এগিয়ে গেছে। সব কিছু আর আগের মত নেই”।
রশিদ বলল, “তুই চুপ করে বস। আর আমাকে বল জ্যাকেটটার জন্য কাকে ইউজ করবি?”
বাশার বলল, “কাউকে পাই নি। ধারাভিতে একটা বাচ্চাকে পাওয়া গেছিল। কিন্তু ওই বাচ্চাটা বাস চাপা পড়ে মারা গেছে। আমি নতুন জ্যাকেট তৈরি করতে দিয়েছি”।
রশিদ কয়েক সেকেন্ড বাশারের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থেকে বলল, “আমি তো ভেবেছিলাম জ্যাকেটের বাচ্চাকে তুইই ঠিক করে রেখেছিস”।
বাশার অবাক হয়ে বলল, “কে?”
রশিদ বলল, “বলরাম। তুই যাকে বেনারস থেকে নিয়ে এসেছিলিস”।
বাশার চমকে উঠে বলল, “না না। তা কী করে হয়? এটা অসম্ভব। বলরামকে দিয়ে এটা করা যাবে না”।
রশিদ বলল, “কেন করা যাবে না? তোর কি এই কাফের বাচ্চাটার উপর মায়া পড়ে গেছে?”
শাহিদ হেসে বলল, “এখানে তুই কি সত্যিকারের বাবা-ই হয়ে গেছিস নাকি বে?”
বাশার বলল, “বলরামের মা আমার কাছে ওকে দিয়ে গেছে। আমি কী করে ওকে দিয়ে এ কাজটা করাবো? তাছাড়া ওর তো জন্নতও নসীব হবে না। ও হিন্দু। আমাদের কাজে ওকে জড়ানোর কোন মানেই হয় না”।
রশিদ ঠাণ্ডা গলায় বলল, “উপরওয়ালা ঠিক করে দিলে সব কিছুর মানে হয়। সব কিছুর। তুই আমি ঠিক করে দেবো নাকি কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক? এই কাজের জন্য স্বয়ং উপরওয়ালা বলরামকে নির্বাচন করেছেন। আমরা এখানে কিচ্ছু করতে পারব না। শোন বাশার, ও বাচ্চা তোর কথা শোনে। তুই ওকেই জ্যাকেটটা পরানোর ব্যবস্থা করবি। বাকি কাজের দায়িত্ব আমার”।
বাশার অস্থির হয়ে বলল, “চাচাজান বারণ করবেন”।
রশিদ বলল, “চাচাজানকে নিয়ে তোকে চিন্তা করতে হবে না। চাচাজানের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে”।
বাশার বলল, “বাচ্চাটা উধাও হয়ে গেলে, আমার উপরেও সন্দেহ আসতে পারে। কিছুদিন আগেই এখানে একজন ভণ্ড সাধুকে আশ্রমের মধ্যে ধরেছিল এদের ইন্টেলিজেন্স। চাচাজান যদি চান এখানে আর আমাকে দরকার নেই, শুধু তাহলেই এই বাচ্চাটাকে দিয়ে কাজ করাও। নইলে করিও না”।
রশিদ বলল, “চাচাজানের কথা বাদ দে। তোকে তো আমি বলেছি। এই মিশনে আমি আর শাহিদ তখনই ঢুকব, যখন তোর বলরাম ওই জ্যাকেটটা পরবে”।
বাশার রশিদের দিকে তাকিয়ে বলল, “আমার সঙ্গে তোমাদের কীসের শত্রুতা? আমি কী করেছি? নাকি আমাকে এত লোক সম্মান করছে বলে তোমরা আমাকে হিংসা করছ?”
রশিদ জোরে হেসে উঠে বলল, “শুধু একটা মেইল যাবে মিডিয়াতে। সবাই তোর আসল পরিচয় জেনে যাবে। সম্মান? মানে কোন সম্মান? তুই এখানে সম্মান পাওয়ার জন্য আছিস?”
বাশার পাংশু মুখ করে বলল, “আমি ব্যবস্থা করছি। কালকের মধ্যে বস্তির কোন বাচ্চাকে নিয়ে আসা হবে”।
রশিদ জোরে জোরে মাথা নাড়ল, “উঁহু। বলরামই যাবে। নয়ত এই মিশন হবে না”।
বাশার চুপ করে বসে রইল। তার মাথা কাজ করছে না।

রাতে কিছুতেই ঘুমোতে পারল না বীরেন। সুলেমানের মুখটা তাকে ঘুমোতে দিল না। দোকানের কর্মচারীরা ঠিক করেছে দোকান চালাবে। সুলেমানের এক ভাই করাচী থাকে। সে আসবে। সম্ভবত সেই দোকানের দায়িত্ব নেবে। সুলেমান যেন নিজে মরে বীরেনকে মুক্তি দিয়ে গেল।
আরেকটু বেলা বাড়লে সে রজ্জাকের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।
রজ্জাক তাকে দেখে বলল, “কাল তুমি কোথায় ছিলে?”
বীরেন বলল, “আমিও মসজিদেই যাচ্ছিলাম। বরাতজোরে বেঁচে গেলাম”।
রজ্জাক বলল, “আল্লাহ তোমাকে বাঁচিয়েছেন। আচ্ছা, তোমাকে হিসেবপত্রের সব কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বুঝে নিতে হবে। এটা কিন্তু ছোট ব্যবসা না। অনেক বেশি হিসেব সামলাতে হবে। চলে এসো”।
বীরেন স্টক বুঝতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল গোটা বাজার এলাকা পুলিশে ছয়লাপ হয়ে গেছে। পুলিশ এসে জানিয়ে গেল সব দোকান বন্ধ করে দিতে হবে। তদন্ত শুরু হবে।
রজ্জাক মাথা চাপড়িয়ে বলল, “হয়ে গেল আমার ব্যবসার হাল খারাপ। আর জায়গা পেল না ইবলিশের বাচ্চাগুলো! এবার দোকান বন্ধ রাখতে হবে। দে রে, ঝাঁপ ফেলে দে। নইলে পুলিশগুলোই দোকান ভাংচুর করতে শুরু করে দেবে”।
ঝাঁপ পড়ে গেল। দোকানের ভেতর বসে বিরক্ত মুখে রজ্জাক বলল, “একটু শান্তিতে এদেশে ব্যবসা করা যাবে না। এর থেকে সৌদি চলে যেতাম। সেখানেই ভাল থাকতাম। দাদার জন্য যাওয়া হল না। নিজে একদিকে মরল, আমাকেও অন্যদিকে মেরে গেল”।
বীরেন ঠিক করতে পারছিল না রজ্জাকের সঙ্গে এখনই কোন কথা বলবে কি না। কিছুটা ভেবে সে কিছু না বলাই মনস্থির করল। এখনই সব কিছু জানতে চাইলে রজ্জাক তাকে সন্দেহ করতে পারে।
জানলা দিয়ে উঁকি মারছে রজ্জাকের কর্মচারীরা। একজন বলল রাস্তায় পুলিশের কুকুর নেমেছে। রজ্জাক গলায় শ্লেষ এনে এক উর্দু প্রবচন বলল যার মানে বাংলায় করলে দাঁড়ায়, “চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে”।
বিকেল নাগাদ পুলিশ দোকান খোলার অনুমতি দিল। তবে বাজারে বেশ কয়েকজন পুলিশ মোতায়েন হল। বীরেন যতটা সম্ভব কাজ বুঝে নিল। মাগরেবের নামাজের সময় সে দোকান থেকে বেরোতেই কানের কাছে সায়কের গলা শুনতে পেল, “সবজি বাজারের দিকে চল”।
বীরেন সবজি বাজার চিনে গেছিল। সবজি বাজারে প্রবেশের মুখে একটা বড় তোরণ আছে। সেখানে পৌছনো মাত্র ছদ্মবেশধারী সায়ক তাকে বলল, “তোরণের রাস্তায় ঢোকার পর ডানদিকে একটা ছোট রাস্তা বাজারের বাইরে যাচ্ছে। ওই রাস্তায় হাঁটতে থাকো”।
বীরেন সায়কের নির্দেশ মত হাঁটতে লাগল। সায়কও তার পেছন পেছন হাঁটছিল। এই রাস্তাটা বাজারের পেছন দিক এবং মসজিদের উল্টো দিক। একটা ছোট গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সায়ক গাড়ি খুলে ড্রাইভারের সিটে বসে বলল, “উঠে পড়”।
বীরেন গাড়িতে উঠে বসে বলল, “কোথায় যাবো?”
সায়ক বলল, “রাজা বাজার ছেড়ে যত দূরে যাওয়া যায়, তত দূর”।
বীরেন চমকে উঠে বলল, “মানে? কালকেই তো বললেন এখান থেকে পালালে আমার উপর সন্দেহ হবে?”
সায়ক গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বলল, “আমাদের কাজই তো এরকম। সেকেন্ডে সেকেন্ডে সিদ্ধান্ত বদলাতে পারে। যাক গে, তোমার কৌতূহল নিরসনের জন্য বলে দিই, এ বাজারে ইসলামাবাদের টিকটিকিদের প্রবেশ হয়েছে। এখন তোমাকে এখানে রাখা মানে তোমাকে বিপদের মুখে ফেলে দেওয়া। প্রতিটা দোকানের লোক ধরে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে। যদিও তোমার একটা নকল আই কার্ড বানানো আছে কিন্তু সেটা বিপজ্জনক হয়ে যাবে হে বীরেনচন্দ্র। তাই নো রিস্ক”।

বীরেন হতাশ গলায় বলল, "ধুস, কত পরিশ্রম করলাম এদের হিসেব শেখার জন্য"। সায়ক হো হো করে হেসে উঠল। বলল, "এরকম যে কত হিসেব আমি শিখেছি এ কয়েক বছরে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। পাকিস্তানি আর্মি বা ইন্টেলিজেন্স ইন্ডিয়ান জাসুস পেলে কী করে জানো? পাতি ছাল ছাড়িয়ে নুন মাখিয়ে রেখে দেয়। তাই আপাতত হাওয়া গরম থাকাকালীন বেরিয়ে চল"।

বীরেন বলল, "কিন্তু রজ্জাক রিপোর্ট করে দেয় যদি?"

সায়ক বলল, "তা করবে। সে জন্যই ক'টা দিন একবারেই লুকিয়ে থাকতে হবে এখন"।

বীরেন বলল, "কোথায় লুকোতে হবে?"

সায়ক চিন্তিত গলায় বলল, "দেখা যাক"।

৪১

সকাল হয়েছে। খান বাড়িটা ঘুরে দেখছিলেন। বিরাট বিরাট ঘর।

ছাদে উঠে দেখলেন তারেক চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। খান বললেন, "কী ব্যাপার? তুমি উদাস হয়ে গেছো কেন"?

খানের ডাকে তারেকের সম্বিত ফিরল। বললেন, "কী অদ্ভুত একটা জীবন কাটিয়ে দিলাম খান। এখন আমার বউয়ের জন্য মন খারাপ করছে। ঢাকায় কী করছে একা একা কে জানে। ওকে তো আমি শুধু একটা পরিচয় পাওয়ার জন্য বিয়ে করেছিলাম, তবু খারাপ লাগছে। কাল যদি ওদের ছেড়ে দিতে হয়, আমি কী করব বল তো? এখন তো মনে হচ্ছে, এর থেকে স্যারের ডাক না পেলেই ভাল হত। এখানেই কাটিয়ে দিতাম"।

খান তারেকের কাঁধে হাত রাখলেন, "চিন্তার কিছু নেই। ভারতীয়রা অতো অমানবিক নয়। তোমার পরিবারের কথা নিশ্চয়ই মাথায় রাখবে"।

তারেক হাসলেন, "আমার কথাই ভুলে গেছিল! যাক গে, ঢাকার আপডেট হল, রফিকের বডি ওরা ওখানেই দাফন করে দিয়েছে"।

খান বললেন, "সেফ হাউজে কারা অ্যাটাক করেছিল কিছু জানা গেছে?"

তারেক মাথা নাড়লেন, "না। এই দুটো ঘটনা ভাবাচ্ছে। যথেষ্ট ভাবনার বিষয়"।

আকাশে মেঘ করে এসেছে। তারেকের ফোন বাজছিল। তারেক ধরলেন। কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। ফোন রেখে বললেন, "কোইন্সিডেন্স দেখো। এই মাত্র তুমি ঢাকার সেফ হাউজের কথাই বলছিলে। জানা গেছে। ওটা আই এস আইই করেছে"।

খান চমকে উঠলেন, "ঢাকায়? শিট!"

তারেক বললেন, "লোকাল রিক্রুট। সাত আটজনের কাজ। মুখ বেঁধে এসে বোম মেরে চলে গেছে। ওদের কাছে ও বাড়ির হদিস ছিল"।

খান তুষারকে ফোন করলেন। একটা রিং হতেই তুষার ফোন রিসিভ করলেন, "বল খান"।

খান বললেন, "স্যার, তারেক বলছে ঢাকার সেফ হাউজে আই এস আইই অ্যাটাক করেছে। ওদের লোকাল রিক্রুট আছে বেশ কিছু। ওরাই করেছে। এর মানে দাঁড়ায়, ঢাকায় আই এস আই অ্যাক্টিভ হয়েছে"।

তুষার বললেন, "হ্যাঁ। পাকিস্তানপন্থী র‍্যাডিকাল কিছু গ্রুপ আছে ওখানে। একটু আগে ঢাকা থেকে ফোন এসেছিল। ওরাও জানতে চাইছিলেন আমাদের এজেন্টরা ঢাকায় আছে নাকি? তোমাদের উপস্থিতি এখন একটা ইস্যু হয়ে গেছে"।

খান বললেন, "ওরা বিনা কারণে অ্যাটাক করে নি স্যার। ওরা বড় কিছু প্ল্যান করছে। আমরা এখানে বসে না থেকে কি ঢাকায় ফিরে যাবো?"

তুষার বললেন, "না না। একবারে না। সব কিছু থিতিয়ে যাক। ওখানে ওরা কিছু করলেও সেখানে আমাদের কিছু করার নেই। মাথায় রেখো, আমরা শুধু আমাদের থ্রেটগুলো নিয়ে ভাবব। ঢাকাকে আমরা খুব বেশি

হলে অ্যালার্ট করে দিতে পারি"।
খান বললেন, "স্যার, কিছু কী জানা গেল?"
তুষার বললেন, "না। জানা যাবে। একটার পর একটা ক্লু আসছে। কোনটা ইস্ট থেকে আসছে, কোনটা ওয়েস্ট থেকে। ডটগুলো জোড়ার অপেক্ষায় আছি। যেখানে আছো, সেখান থেকে একবারে বেরোবে না। সময় আসবে। তখন যা করার করতে হবে"।
খান বললেন, "রিভেঞ্জ বাহিনী সম্পর্কে কিছু জানতে পারলেন?"
তুষার বললেন, "হ্যাঁ। মূলত ঢাকা বেসড কমবয়সী ছেলে মেয়ে। ঠিক কতজন সদস্য আছে, জানা যায় নি। রাজাকারদের বিচার চলছে। এই ব্যাপারে চর্চা বাড়ছে, ওরা ওদের মত করে তৈরি হচ্ছে। এরা একবারেই অহিংস নয়। ভীত নয়। জীবন দিতে দুবার ভাববে না। রুকসারের প্রোফাইলের সঙ্গে এদের চিন্তাভাবনা মিলে যাচ্ছে। তবে রুকসার ওদের হয়ে কাজ করছিল না অন্য কারো হয়ে, সেটার ব্যাপারে আমরা অন্ধকারে"।
খান বললেন, "আপনার জন্যই অপেক্ষা করে থাকব স্যার"।
তুষার বললেন, "ঠিক আছে। টেক কেয়ার"।
খান ফোন রাখলে তারেক বললেন, "ঢাকা পুলিশের এক বন্ধু ফোন করেছিল। ঢাকায় এই রাজাকারদের ফাঁসির প্রতিবাদে কয়েকটা জায়গায় কাল রাষ্ট্রের প্রতিশোধপরায়নতার বিরুদ্ধে হঠাৎ মিছিল শুরু হয়েছিল। বেশ কয়েকটা জায়গায় টায়ার পোড়ানো হয়। পুলিশ বা র‍্যাব নামার আগে ওরা মুহূর্তের মধ্যে হাওয়া হয়ে যায়। কুমিল্লায় কমিউনাল টেনশন তৈরি হয়েছে। আমাদের সাবকন্টিনেন্টে তো কমিউনাল টেনশন ছড়িয়ে দেওয়া সব থেকে সোজা কাজ। একটা কিছু নিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলেই হল"।
খান চিন্তিত বললেন, "হু, ওরা নজর ঘুরিয়ে দিতে চাইছে এসব কিছু থেকে। দে আর প্ল্যানিং সামথিং বিগ। ভেরি বিগ"।
তারেক বললেন, "হ্যাঁ। চিন্তার ব্যাপার হল আমরা ওদের র‍্যাডারে পড়ে গেছি। ঢাকার সেফ হাউজে অ্যাটাক সেটার প্রমাণ দিচ্ছে। ওদের কাছে খবর আছে তোমরা এ দেশে এসেছো। ওরা সেটা সাকসেসফুলি ট্র্যাক করেছে"।
খান বললেন, "ওরা এ বাড়ির সন্ধান জানে?"
তারেক বললেন, "জানতেও পারে। ১% চান্স থাকলেও পারে। অ্যালার্ট থাকতে হবে। রাতে দুজন করে জাগার ব্যবস্থা করতে হবে। এ বাড়িটাকে দুর্গ হিসেবেই ট্রিট করতে হবে। কোন ঝুঁকি নেওয়ার দরকার নেই"।
খান বললেন, "ঠিক। জায়গাটা রিমোট হলেও ওরা যদি চুপ করে বসে শুধু আমাদের মুভমেন্ট দেখে, তাহলেও ঝুঁকির ব্যাপার আছে। চল দেখি"।
ওরা ছাদ থেকে এক তলায় সোহানদের কাছে এলেন। খান বললেন, "আজ রাত থেকে দুজন করে এ বাড়ি পাহারা দেবে। নিজেদের মধ্যে রোস্টার করে নাও। আমাদের দরকার হলে বলবে, আমরাও থাকব"।
সোহান বলল, "কোন দরকার নেই স্যার। আমরাই করে দেব"।
খান বললেন, "যদি সন্দেহজনক কিছু দেখো, আমাদের ডেকে দেবে। যদি তখনই রি অ্যাক্ট করার দরকার পড়ে, তাও আমাদের ডেকে দেবে। ঠিক আছে?"
সোহান মাথা নাড়ল, "রাইট স্যার"।

৪২

রাজা বাজার পেরিয়ে রাতের অন্ধকারে শহরের মধ্যে বেশ খানিকটা পথ গিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় গাড়ি দাঁড়ি করাল সায়ক।

বীরেন বলল, “রাজাবাজারে আমার এ ক’দিন থেকে কোন লাভই হল না তাহলে? সেই তো পালিয়ে আসতে হল”।

সায়ক হাসল, “আমাদের ওভাবে ভাবলে হয় না বীরেন। এর পজিটিভ দিকগুলো দেখো। তুমি ওখানে থেকে ওদের অ্যাক্সেন্ট, কথার ধরণ অনেকখানি আয়ত্ত করে নিয়েছো। এটা কি কম মূল্যবান ছিল? এ দেশে থাকতে হলে ওদের মত হয়ে যেতে হবে আমাদের। তুমি বাঙালি, রবিবার সকালে সাদা আলুর তরকারি দিয়ে লুচি খেতে, সেসব ব্যাপার যত তাড়াতাড়ি তোমার গা থেকে মুছে যায়, তত মঙ্গল। আচ্ছা, শোন, আমি এখন গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করছি। তুমি একটু পর নামবে। আমার সঙ্গে পঞ্চাশ মিটারের ডিসট্যান্স রেখে আমাকে অনুসরণ করবে। একটা বাড়িতে আশ্রয় নেবো। কিন্তু একসঙ্গে গেলে হবে না। ঠিক আছে? গাড়ির চাবি গাড়িতেই রেখে নামবে। লক করারও দরকার নেই।”

বীরেন মাথা নাড়ল। সায়ক গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করল। মিনিট তিনেক পর সে গাড়ি থেকে বেরোল। গাড়িটা যেখানে দাঁড় করানো, সেখান থেকে কিছুটা হাঁটলে আরেকটা বাজারের মত ঘিঞ্জি এলাকা শুরু হল। বীরেন কিছুই চেনে না। শুধু ধ্রুবতারার মত সায়ককে সামনে রেখে সে হেঁটে চলল। একটার পর একটা দোকান, গাদা গাদা মানুষের ভিড় পেরিয়ে সায়ককে দেখে হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছিল তার। তবু সে দৌড়ল না। হেঁটে যেতে লাগল।

কসাই বাজার শুরু হল। চারদিকে মাংস ঝুলিয়ে রেখেছে। গন্ধে বীরেনের গা গুলিয়ে উঠল হঠাৎ করে। নাকে রুমাল দেবে নাকি ভেবেও চারদিকে তাকিয়ে কারো নাকে রুমাল নেই দেখে সে রুমাল বের করল না। কসাই বাজার পেরিয়ে পুরনো ভাঙা ভাঙা কতগুলো বিল্ডিং। সায়ক একটা বিল্ডিং এর কাছে এসে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে পড়ে তার ভেতর প্রবেশ করল।

বীরেন বিল্ডিঙটার ভেতরে ঢুকে দেখল নিচের তলায় বেশ কয়েকটা ঘুপচি দোকান। এক পাশে অন্ধকার সিঁড়ি। সে সিঁড়ি দিয়ে উঠে একতলায় উঠে দেখল চাবি দিয়ে একটা ঘরের তালা খুলছে সায়ক। সে চারদিকে দেখল।

না। এই ফ্লোরে আর কেউ নেই। টিম টিম করে একটা বাল্ব জ্বলছে।

সায়ক দরজা খুলে ঘরের ভেতরে যেতে বীরেনও ঘরের ভিতরে ঢুকল।

ঘরের ভেতরেও সেই একই টিমটিমে আলো। ঘরটা বস্তায় ভর্তি। মেঝেয় এক কোণ একটু ফাঁকা। সেখানে কার্পেট পাতা। সায়ক বলল, “দরজা বন্ধ করে বস”।

বীরেন দরজা বন্ধ করে এসে বসল। সায়ক বলল, “আপাতত এখানে দু তিন দিন থাকা যেতে পারে”।

বীরেন বলল, “ইমান শেখের দোকানে যারা আসত, তারাই কি মসজিদে ব্লাস্ট করিয়েছে?”

সায়ক বলল, “হতে পারে। নাও হতে পারে। এখানে অসংখ্য অর্গানাইজেশন আছে। প্রত্যেকের নিজেদের মত দাবি দাওয়া। কে যে কখন কোন দাবিতে এসব করে, কেউ জানে না। বলাই বাহুল্য, এরা কেউ গান্ধীজীর শিষ্য না”।

কথাটা বলে সায়ক হাসল। বীরেন বলল, “ইমান শেখের দোকানে কোন অর্গানাইজেশনের লোকজন যেত?”

সায়ক বলল, “ইমান শেখকে ওরা কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কাজ দিয়েছিল। কাশ্মীরে ওদের নিজস্ব মিডিয়া আছে, মাঝে মাঝেই কেবল চ্যানেলে ওরা ওদের কথা বার্তা প্রচার করে। ইমান নিজেও কাশ্মীরি। আমাদের হাতে ধরা পড়ার পর ও ডাবল এজেন্ট হয়ে যায়। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, এরা সেটা জেনে যায় এবং ইমানকে শেষ করে দেয়। ওদের লোক তারপরে রজ্জাকের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করল। আমাদের সন্দেহ রজ্জাকই ওর দাদাকে ধরিয়ে দেয়। কাজটা হল না বীরেন। আমার লক্ষ্য ছিল তোমাকে রজ্জাকের বিশ্বস্ত করে তোলা। করার আগেই ব্লাস্টটা হল”।

বীরেন বলল, “রজ্জাকের দোকানে আমি এই লিফলেটটা পেয়েছিলাম”।

পকেট থেকে একটা সাদা লিফলেট বের করে সায়ককে দিল বীরেন। লিফলেটটা শ্রীনগরে একটা ভারত বিরোধী বিক্ষোভ মিছিলের। সায়ক দেখে বলল, “হু, এটা এখানেই ছাপা হয়ে শ্রীনগরে যাচ্ছে। যা দেখছি এরা নিজেরা খেতে না পেলেও কাশ্মীরে অশান্তি লাগিয়েই যাবে। তার মানে আমার ধারণা ভুল না। রজ্জাক এদের নতুন তাস। এই লিফলেটটা শ্রীনগরেই বিলি করবে ওরা। আজকের দিনটা বিশ্রাম কর। কাল দেখতে হবে রজ্জাক কবে আবার কাশ্মীর রওনা দেয়। আমাকে তুষার স্যারকে খবরও পাঠাতে হবে। এখানে তো সে উপায় নেই”।
চিন্তিত মুখে সায়ক পায়চারি শুরু করল। বলল, “ঘুমিয়ে নাও বীরেন। সুযোগ পেলেই ঘুমিয়ে নাও। শরীরের বিশ্রাম দরকার। জানি না এর পরে আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে”।
বীরেন চোখ বুজল।
সায়ক ঘরের অপরিসর জায়গাতে পায়চারি করতে লাগল।

৪৩
সন্ধ্যে সাতটা। ইসলামাবাদ।
স্যাটেলাইট টাউনশিপের একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল।
গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটার গেট ঠেলে ঢুকল সামশের আলি।
দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তিনটে টোকা দিতে দরজা খুলে গেল। ড্রইং রুমে মৌলানা বসে আছে। সামশের মাথা নিচু করে সালাম জানিয়ে বলল, “জনাব”।
মৌলানা ইশারায় বাকিদের সরে যেতে বলল। সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। মৌলানা হজরতউল্লাহ বলল, “বসুন”।
সামশের বসল। মৌলানা বলল, “ব্যবস্থা হয়েছে?”
সামশের পকেট থেকে একটা ছোট ব্যাগ বের করে মৌলানার সামনের টেবিলে ব্যাগটা খুলে সেটা থেকে একটা পাসপোর্ট বের করে রাখল, “জনাব, এটাই আপনার আইডি। পরশু ভোরে আপনাকে আমরা মাসকটে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি”।
মৌলানা খুশি হল, “মাশাল্লাহ। যাক, আপনি আমাদের জন্য চিন্তা করেছেন দেখে ভাল লাগল। প্রেসিডেন্ট সাহেব জানেন?”
সামশের মাথা নাড়ল, “না জনাব। উনি জানার পর বাধা দিলে আমি কিছু করতে পারতাম না”।
মৌলানা মাথা নাড়াল, “এটা এ দেশের জন্য খুব দুঃখের কথা। আমরা কাদের জন্য লড়াই করছি?”
সামশের বলল, “কেউ তো কিছু করল না জনাব। উনিই ওর ইচ্ছেমত সব কিছু চালাতে পারছেন”।
মৌলানা বলল, “কতদিন আর? আল্লাহর এই দুনিয়ায় সবাইকে একদিন যেতে হয়। ওকেও যেতে হবে। চিন্তার কিছু নেই তো”।
সামশের ভ্রূ কুঁচকে মৌলানার দিকে তাকাল। মৌলানা বলল, “আপনার উপরে আমরা সবাই খুব সন্তুষ্ট। অথচ যে কাজটা আপনার অনেক দিন আগেই করা উচিত ছিল, আপনি সে কাজটা না করে বসে আছেন”।
সামশের বলল, “কী কাজ জনাব?”
মৌলানা বলল, “দেশের শত্রুর হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য কুরবানি চাই। আপনি কাউকেই পেলেন না, যে এই কুরবানি দিতে প্রস্তুত?”
সামশেরের মুখে হাসি ফুটল, “কেউ তো সেই নির্দেশ দেয় নি জনাব। দিলে এত দেরী হত না”।
মৌলানা বলল, “প্রেসিডেন্ট নিজেও কিভাবে ক্ষমতায় এসেছিল, ভুলে গেছেন? আপনি হাত গুটিয়ে বসে থাকলে এ দেশের কী হবে? গোটা পাকিস্তানের মানুষ চায় পাকিস্তান ইন্ডিয়াকে শেষ করে দিক। নিয়াজি

সাহেব তো একবারেই নিস্তেজ হয়ে বসে আছেন। কিছুই করছেন না। এই অবস্থায় দেশের স্বার্থে, কাশ্মীরের স্বার্থে কি আমরাও চুপ করে বসে থাকব?"

সামশের বলল, "জনাব, আপনার আদেশ শিরোধার্য"।

মৌলানা বলল, "আপনারা না পারলে আমাকে বলবেন। আপনারা ভয় পেতে পারেন। এই ভয় কিন্তু এ দেশের জন্য ভাল না"।

সামশের চুপ করে রইল। মৌলানা বলল, "আমাদের পরবর্তী কাজের সময় ঘনিয়ে এসেছে। কাশ্মীরিদের উপর অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার সময় এসে গেছে। স্বয়ং দেশের প্রেসিডেন্টকে যদি আমরা আমাদের অপারেশনে সামিল করতে না পারি, তবে সে প্রেসিডেন্টকে রেখে লাভ নেই"।

সামশের মাথা নোয়াল, "জনাব"।

মৌলানা বলল, "বম্বেতে আপনার লোক কে আছে?"

সামশের অবাক হয়ে মৌলানার দিকে তাকাল, "বম্বে?"

মৌলানা বলল, "অবাক হবার কথা কিছু বলেছি বলে তো মনে হচ্ছে না। বম্বেতে আই এস আইয়ের কে আছে শুধু জানতে চেয়েছি"।

সামশের একটু ইতস্তত করে বলল, "একটা স্লিপার সেল আছে। অ্যাক্টিভ কেউ নেই"।

মৌলানা দুলে দুলে হাসল, "স্লিপার সেলই দরকার। ডিটেলস লাগবে"।

সামশের বলল, "কবে জনাব?"

মৌলানা হাসি মুখে বলল, "এখন"।

সামশের বলল, "আমি এখান থেকে..."

মৌলানা বলল, "ব্যবস্থা করুন। আমাদের কারো হাতে বেশি সময় নেই"।

সামশের রুমাল বের করে ঘাম মুছে আকবরকে ফোন করল। আকবর ফোন ধরে বলল, "জি জনাব"।

সামশের বলল, "মুম্বই ফাইলস অ্যাক্সেস লিঙ্ক লাগবে"।

আকবর অবাক হল, "এখন জনাব?"

সামশের বলল, "এখন। পাঠাও"।

আকবর বলল, "দিওয়ালীর জন্য?"

সামশের বলল, "এত প্রশ্ন কোর না। পাঠাও"।

আকবর বলল, "জি জনাব"।

সামশের ফোন রেখে মৌলানার দিকে তাকাল, "লিঙ্ক এসে যাবে জনাব"।

মৌলানা হাঁক পারল। ঘরের ভেতর থেকে একজনকে ল্যাপটপ নিয়ে আসতে বলল।

সামশেরের দিকে তাকিয়ে মৌলানা বলল, "যত বড় কাজ, তত বড় জায়গা মিলবে জন্নতে। ওরা আমাদের অপেক্ষায় আছে। আমরা ওদের আর অপেক্ষা করাতে পারি না। ঠিক তো?"

সামশের পাংশু মুখে মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক জনাব"।

৪৪

"টেরোরিজমের থ্রেট দু প্রকারের হয়। এক, এক্সটারনাল টেরোরিজম। যে সন্ত্রাসবাদের বীজ পোঁতে বিপক্ষ দেশ। তারা নানাভাবে আমাদের দেশের মধ্যে সমস্যা তৈরী করার চেষ্টা করে যায়। এটা সম্পর্কে আমরা কমবেশি সবাই ওয়াকিবহাল। কিন্তু ইদানীং এক দ্বিতীয় টাইপের টেরোরিজম মাথাচাড়া দিচ্ছে। প্রোপাগান্ডা টেরোরিজম। এর পেছনে থাকা রাজনৈতিক পাকা মাথা। ত্রাস সৃষ্টি করে, মানুষের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে দেওয়া যায় দেশের ভেতরে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কোন সিনেমার কনটেন্ট অপছন্দ হল, মানুষ হই হই করে বেরিয়ে বাস পুড়িয়ে দিল। তারা পাবলিক বাস পোড়ানোতেই থেমে থাকল

না, কোন রকম দয়া মায়া না দেখিয়ে স্কুলবাসকেও টার্গেট করে ফেলল। কোথাও রটে গেল কোন মন্দির বা মসজিদে নিষিদ্ধ মাংস ফেলে রেখে গেছে কেউ। ব্যস! হয়ে গেল। আঞ্চলিক লড়াই লেগে গেল। একটা খুব সাম্প্রতিক ঘটনার কথা বলি। বিহারের একটা গ্রামে জুলাই মাসে রটে গেল, বাইরে থেকে ছেলেধরা আসছে।

দুটি ছেলে, মেডিকাল রিপ্রেজেন্টেটিভের কাজ করতে গ্রামে গ্রামে ঘুরত বাইকে করে। অচেনা মুখ দেখে, তীব্র আতঙ্কে এক গ্রামের মানুষ ছেলেদুটিকে পিটিয়ে মেরে দিল। কেউ একবারও দেখল না, আদৌ একটা বাচ্চাও গ্রাম থেকে নিখোঁজ হয়েছে নাকি। অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর নীতিহীনতায় ভরা এ দেশে মানুষের মনে পরস্পরের প্রতি ঘৃণার বীজ বুনে দেওয়া খুব সহজ কাজ। এই কাজগুলোই ইন্টারনাল টেরোরিজমের মধ্যে পড়ে। কম বেশি প্রায় সব পলিটিক্যাল পার্টি, জ্ঞানত বা না জেনেই এই ধরণের সন্ত্রাসবাদ ছড়াচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, আমরা যেন নিজেদের বুদ্ধি, বিচার দিয়ে সমস্ত কিছু বিবেচনা করে নিজেদের সিদ্ধান্ত নি। নিজেরা কখনও যেন মবে পরিণত না হই। দশটা লোক মিলে একটা লোককে মারছে দেখে মারার দলে আরেকজন না বাড়িয়ে বুঝতে চেষ্টা করি আদতে লোকটাকে কেন মারছে। দেশের আইন কী বলছে? কোন মানুষ কি দোষ না করেও দোষী হতে পারে? আমাদের ভাবার পরিসর, পড়াশুনার পরিসরটা আরও বাড়ানো দরকার। দেশের ভিতরের সন্ত্রাসবাদ, নিজের ভেতরের সন্ত্রাসবাদকে থামাতে না পারলে আমরা কখনও বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ভাবে লড়তে পারব না। তাহলে কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার আগেই আমরা হেরে বসে থাকব"।

বক্তব্য থামালেন তুষার। হল ভরে উঠল করতালিতে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত এক সেমিনারে তাকে ডাকা হয়েছে।

ইরাবতী তুষারের সঙ্গে এসেছেন।

বক্তব্য শেষ করে তুষার ইরাবতীর পাশে বসলেন। ব্রেক টাইম ঘোষণা হয়েছে। লাঞ্চে যাবার জন্য সবাই তাড়াহুড়ো শুরু করেছে।

ইরাবতী বললেন "ওয়েল সেইড"।

তুষার বললেন "থ্যাংক ইউ। তোমার মান রেখেছি তবে?"

ইরাবতী হাসলেন "নিশ্চয়ই। প্রাউড ওয়াইফ তোমার। খিদে পেয়ে গেছে। চল ডিনার হলের দিকে যাওয়া যাক"।

তুষার ইরাবতীকে নিয়ে ডাইনিং হলের দিকে এগোলেন।

একজন ফর্সা সুদর্শন ছেলে তুষারের দিকে এগিয়ে এসে বলল "স্যার, আপনার বক্তৃতা খুব ভাল লাগল"।

তুষার বললেন "ধন্যবাদ। তোমার নাম কী ইয়ংম্যান?"

ছেলেটি বলল "আবদুল ওয়াহাব স্যার"।

তুষার বললেন "কাশ্মীর?"

ছেলেটি বলল "হ্যাঁ স্যার। শ্রীনগর। আপনার স্পিচ আমার খুব ভাল লেগেছে স্যার। ইদানীং নিজের দেশে থেকেও খুব ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। সবাই কেমন সন্দেহের চোখে তাকায়, যেন কাশ্মীরি হয়ে কোন দোষ করে ফেলেছি"।

তুষার ছেলেটির কাঁধে হাত রেখে বললেন "কোন দোষ কর নি। কোন অঞ্চলের মানুষকে আলাদাভাবে ট্রিট করতে হবে এটা দেশের সংবিধানে বলা নেই। বরং উল্টোটাই বলা আছে। তুমি কষ্ট পেও না। এখন একটা অসুস্থ সময় যাচ্ছে। আশা করা যায়, এই সময়টা এসেছে একটা সুস্থ সময়ের প্রিলুইড হিসেবেই। দেখা যাক। আশা করা তো মানা নয়, তাই না?"

আবদুল হেসে বলল "রাইট স্যার। ভাল লাগল আপনার সঙ্গে কথা বলে"।

ডাইনিং রুমে এসে গেছিলেন তারা। তুষার প্লেট নিতে যাবেন, এমন সময় ফোন বাজতে শুরু করল।

তুষার ধরলেন "হ্যালো"।
"স্যার, পীযূষ বলছি"।
"বল"।
"এখন কথা বলা যাবে?"
"শিওর। বল"।
"স্যার, লাস্ট টাইম আমরা ডার্ক নেট থেকে মুম্বইয়ের একটা স্লিপার সেলের কোড ডিকোড করেছিলাম, মনে আছে? আপনি কোন অ্যাকশন নিতে বারণ করেছিলেন? শুধু বলেছিলেন ট্র্যাক রাখতে?"
তুষার বললেন, "হ্যাঁ"।
"স্যার সেলটা নড় চড় শুরু করেছে। ইসলামাবাদ কন্ট্যাক্ট করেছে ওদের"।
তুষার বললেন, "আমি আসছি"।
ফোন রেখে তুষার ইরাবতীকে বললেন, "আমি খেতে পারছি না। আমাকে এখনই অফিসে যেতে হবে। তুমি খেয়ে নাও। আমি আমার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করে নিচ্ছি"।
ইরাবতীর এরকম অভিজ্ঞতা অনেকবারই হয়েছে। তিনি হাসলেন। কিছু বললেন না।

৪৫

"জনাব। রাজা মার্কেট কেসে একটা লিড পাওয়া গেছে"। আকবর নক না করেই সামশেরের চেম্বারে ঢুকে পড়ে বলল।
সামশের বলল, "কী লিড?"
আকবর বলল, "ইমান শেখের দোকানে ব্লাস্টের পরের দিন একটা ছেলে কাজ করতে এসেছিল। আমরা এলাকা তল্লাশি শুরু করার পর থেকে সে কাউকে না বলে চলে গেছে। সিসিটিভি ফুটেজ আছে। দেখবেন?"
সামশের সোজা হয়ে বসল, "দেখাও"।
আকবর সামশেরের কম্পিউটারে বসল। ইমান শেখের দোকানের সিসিটিভি ক্লিপ বের করে পজ করে বলল, "এই যে জনাব। এ"।
সামশের বলল, "গুড। এর হিস্ট্রি কী পাওয়া গেছে?"
আকবর বলল, "কয়েকদিন সুলেমানের দোকানে কাজ করেছে। রোজ সুলেমানের সঙ্গে মসজিদে যেত। যেদিন ব্লাস্ট হয়েছে, সেদিন যায় নি"। সামশের আকবরের দিকে তাকিয়ে বলল, "আর কোন হিস্ট্রি? কী নাম?"
আকবর বলল, "শোয়েব আলী। বাকি কোন হিস্ট্রি পাই নি"।
সামশের বলল, "সুলেমানের দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ আছে?"
আকবর বলল, "না। সুলেমানের দোকানে সিসিটিভি নেই"।
সামশের বলল, "এর খোঁজ বের কর। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ইমান শেখের দোকানে এ কী করতে গেছিল, কেন পালিয়েছে, যেভাবে হোক বের করতে হবে"।
আকবর বলল, "সুলেমানের দোকানের ছেলেগুলোকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যেটা জানা গেছে, এ দোকানে আসার পরে সুলেমানের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছিল। সুলেমান শোয়েবকে পছন্দ করত। তারপর ব্লাস্টের পরের দিনই ছেলেটা রজ্জাকের কাছে চলে যায়। রজ্জাক বলছে ওর কাছে স্যালারি বেশি পাবে বলেই ছেলেটা ওর কাছে গেছিল। কেন চলে গেছে সেটা নিয়ে রজ্জাকও বুঝতে পারছে না"।
সামশের বলল, "স্নিফার ডগ আর তদন্তকারী অফিসারদের দেখে গা ঢাকা দেওয়ার তো একটাই অর্থ হয়। হয় এ ব্লাস্টে জড়িত ছিল, নয় এর অন্য কোন অভিসন্ধি ছিল"।
আকবর বলল, "কিন্তু জনাব ব্লাস্টের দিন ওর না থাকাটা এটাই প্রমাণ করছে..."

সামশের আকবরের কথা সম্পূর্ণ করল, "যে এ ব্লাস্টে জড়িত ছিল। এ দোকানে কী বলেছিল? নিজের সম্পর্কে কিছু বলে নি?"
আকবর বলল, "বলেছিল ও এতিম"।
সামশের শিস দিয়ে উঠল, "দ্যাট সামস আপ এভ্রিথিং। এ ছেলে নিজের পরিচয় লুকিয়ে দোকানে কভার নিয়েছিল। তারপর রজ্জাকের দোকানে..." সামশের ভ্রূ কুঁচকাল। আকবর বলল, "কী জনাব? কিছু একটা স্ট্রাইক করল কি?"
সামশের বলল, "ইমান শেখের দোকানে কাজ করতে যাওয়াটাই এর টার্গেট ছিল। জামিল খানকে ফোন কর। আগে ওকে ধর। বহুদিন কোন যোগাযোগ করছে না। যদি রজ্জাকের দোকানে এই ছেলেটাকে জামিল ঢুকিয়ে থাকে, তাহলে একটা এক্সপ্ল্যানেশন পাওয়া যায়, কিন্তু যদি অন্য কেউ ঢুকিয়ে থাকে, তাহলে সেটাও আমাদের জানতে হবে ছেলেটাকে কে ঢুকিয়েছিল। তুমি জামিলকে জিজ্ঞেস কর তো"।
আকবর জামিলকে ফোন করল। জামিল ফোন ধরল, "জি জনাব"।
আকবর বলল, "জামিল মিয়াঁ, আমাকে একটা ইনফরমেশন দাও, ইমান শেখের দোকানে তুমি কোন চর ঢুকিয়েছো মসজিদ ব্লাস্টের পরে?"
জামিল বলল, "না"।
আকবর বলল, "কনফার্ম কর। উপরওয়ালার কসম নিয়ে সত্যি কথা বল"।
জামিল বলল, "না জনাব, সত্যি বলছি"।
আকবর ফোন রেখে সামশেরকে বলল, "ও সত্যি বলছে জনাব। এ ব্যাপারে ওর মিথ্যে বলার কোন কারণ নেই"।
সামশের আকবরের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার কি মনে হচ্ছে? এ র-এজেন্ট হতে পারে?"
আকবর চিন্তিত মুখে সামশেরের দিকে তাকিয়ে বলল, "র এত দূর চলে আসবে জনাব?"
সামশের বলল, "না আসার কোন কারণ আছে কি? এভাবে লুকিয়ে পড়াটা যথেষ্ট সন্দেহ জনক। সিসিটিভি ফুটেজে পাওয়া ছবি, আর সুলেমান-রজ্জাকের দোকানে যারা যারা ওকে দেখেছে, তাদের বর্ণনা একসঙ্গে করে একটা ক্লিয়ার পিকচার বের করে ফেলো আজকের মধ্যে। থানাগুলোতে ইনফর্ম কর, একে যেখানে দেখবে, আটক করার ইন্সট্রাকশন দাও। দেরী কোর না। এ যেন পালাতে না পারে"।
আকবর মাথা নাড়ল, "জি জনাব। আমি এখনই ব্যবস্থা নিচ্ছি"।

৪৬

পীযূষ বললেন, "লোকেশন থানে স্যার। হোয়াটস অ্যাপ মেসেজ এসেছে পাকিস্তান থেকে"।
তুষার বললেন, "কী মেসেজ এসেছে?"
পীযূষ বললেন, "গরম বাড়ছে। একদিন বিয়ার নিয়ে বসা যাক"।
তুষার হেসে ফেললেন, "একী? চিলড বিয়ার লেখে নি? বিয়ার গরম ভাল লাগে নাকি?"
পীযূষও হাসলেন। বললেন, "স্যার, এটা ওদের কোডের মধ্যে পড়ছে। পাকিস্তান থেকে শুধু একটা জায়গাতেই কি মেসেজ আসছে? অনেক জায়গাতেই আসছে। কিন্তু এই কোডটার মানে হল এবার শীতঘুম থেকে ওঠার সময় হয়ে এল"।
তুষার বললেন, "ঠিক। কাকে পাঠিয়েছে? কী নাম? কী কাজ করে"?
পীযূষ বললেন, "এটা এক কলেজ টিচারের কাছে এসেছে। মহিলার নাম সুনয়না দাভে। এই মহিলা গত বারো বছর ধরে কলেজে পড়াচ্ছেন"।
তুষার বললেন, "কী পড়াচ্ছেন?"

পীযূষ বললেন, "ম্যাথস স্যার"। তুষার সভয়ে বললেন, "ওরে বাবারে। ম্যাথস। ওর ব্যাকগ্রাউন্ড কী বল তো? থানেতেই বাড়ি ছিল?"
পীযূষ বললেন, "স্যার সবই থানেতে। ঠিকানাও"।
তুষার বললেন, "এই স্লিপার সেল মেম্বারের ডিটেলস যখন বেরিয়েছিল, তখন তোমরা কেউ দেখো নি আর কিছু ইনফরমেশন পাওয়া যাচ্ছে নাকি?"
পীযূষ বললেন, "স্যার দেখেছিলাম। উনি এদেশেরই মানুষ। ঠিক কোন আইডিওলজি থেকে এসব করছেন জানি না। জ্যোতির্ময়বাবুর ক্ষেত্রেও তো আমরা একইভাবে পাজলড হয়ে গেছিলাম স্যার। ঠিক কোন কারণে এরা এই কাজে নামছেন, এত রাগ কেন বুকে চেপে ধরে আছেন, আমরা একবারেই অন্ধকারে"।
তুষার বললেন, "সব কিছু ট্র্যাক করা শুরু হয়ে গেছে?"
পীযূষ বললেন, "হ্যাঁ। এমনিতেই ট্র্যাকিং চলছিল, এখন পুরো দমে শুরু হয়ে গেছে"।
তুষার বললেন, "কোন রকম হিন্ট যেন না পায়। ওখানে আমি মাথুরকে..." তুষার থমকে গেলেন। বললেন, "ওহ, মাথুর নেই। ঠিক আছে, ওখানে শ্রীবাস্তব আছে। ওকে বলছি। আচ্ছা পীযূষ, লাস্ট টাইম সায়ক যখন ব্লু ফ্লাওয়ার মিশনের লোকেশনগুলো পেয়েছিল, তার মধ্যে তো সিদ্ধি বিনায়কও ছিল। অমৃতসর ফেল হল, ওরা সিদ্ধি বিনায়ক টার্গেট করবে"।
পীযূষ বলল, "স্যার, সিদ্ধি বিনায়কের সিকিউরিটি আরো টাইট করে দেওয়া হয়েছে"।
তুষার বললেন, "সেটা ঠিক আছে, কিন্তু..."
তুষার চিন্তিত হলেন। পীযূষ বললেন, "কিন্তু কী স্যার?"
তুষার বললেন, "সিদ্ধি বিনায়কের মত জায়গা ওরা টার্গেট নাও করতে পারে। এর কারণ হল, ওরাও জানে এসব জায়গায় সিকিউরিটি আরো টাইট হয়ে গেছে। না না, এভাবে হাওয়ায় গেস ওয়ার্ক করে আমি কোন রকম কনক্লুশনে আসতে রাজি নই। তুমি শ্রীবাস্তবকে কাজ শুরু করতে বলে দাও। ওই সুনয়না দাভের প্রতিটা কাজের এক্সপ্ল্যানেশনসহ ডিটেলস চাই। বাই দ্য ওয়ে, ভদ্রমহিলা হোয়াটস অ্যাপে আর কাকে কাকে মেসেজ পাঠান?"
পীযূষ বললেন, "একটা কলেজ ফ্যাকাল্টিদের গ্রুপ আছে। ওখানে ওয়েব সাইট থেকে কপি করা কোটস বা মেসেজ ইত্যাদি পাঠান"।
তুষার বললেন, "ঠিক আছে। তুমি সেই মেসেজগুলো দেখেছো? মানে কোটগুলো?"
পীযূষ বললেন, "স্যার, দেখেছি। একবারে কাঁচা দাগের ইন্সপিরেশন কোটস ডাউনলোড করে পাঠান। সন্দেহজনক কিছুই নেই স্যার"।
তুষার বললেন, "তবু সেগুলো আমাকে ফরোয়ার্ড করে দাও। বুড়ো বয়সে ওই মেসেজগুলো যদি আমাকে কোনভাবে ইন্সপায়ার করে থাকে, তাহলে তো ভালোই। বাই দ্য ওয়ে, সায়কের লাস্ট লোকেশন কী আছে?"
পীযূষ বললেন, "রাওয়ালপিণ্ডি"।
তুষার বললেন, "আর কোন ভাবে কোন মেসেজ পাঠাতে পেরেছে?"
পীযূষ মাথা নাড়লেন, "না স্যার। পাঠায় নি"।
তুষার বললেন, "ঠিক আছে। তুমি মিশন মুম্বই শুরু করে দাও। তবে মুম্বইটা তুমি দেখলে অখিলকে বাংলাদেশটা বুঝিয়ে দাও। রফিকের সাবস্টিটিউটের খোঁজ এল কিছু?"
পীযূষ বললেন, "আমরা সেটাই অ্যানালিসিস করছি স্যার"।
তুষার বললেন, "আমি আর তিনটে দিন দেখব পীযূষ। যদি দেখি ঢাকা আমাদের আর সেরকম কিছু আউটপুট আসছে না, তাহলে বর্ডার সিকিউরিটি আরো বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের টিমটাকে বাংলাদেশ থেকে উইথড্র করে নেবো"।

পীযূষ বলল, “ওকে স্যার। তাই হবে”।

৪৭

ইঁদুর আছে ঘরটার মধ্যে। জেগে থাকলে কাছে আসে না। একটু রাত হলেই ওদের কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে যায়। রাত ন’টা।

সায়ক রুটি কিনে এনেছিল। দুজনে সেটাই খেল। বীরেন বলল, “আমরা রাজা মার্কেটে যাবো না?”

সায়ক বলল, “গেলেও একবারে ছদ্মবেশে যেতে হবে। তাও এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার তো কোন ইচ্ছেই নেই আমার। আশা করা যায়, তুমি এর মধ্যেই ওদের র‍্যাডারে চলে এসেছো। ওরা তোমাকে নিয়ে সন্দেহ করবে না, তা হয় না। স্লিপার সেলের মত তোমাকেও লুকিয়ে থাকতে হবে”।

বীরেন বলল, “ক’দিন”?

সায়ক বলল, “দিন পনেরো। এই বদ্ধ ঘরে থেকে দম বন্ধ হয়ে যাবে সেটা নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু কিচ্ছু করার নেই। ওরা ধরলে আগে ছাল তুলবে, তারপর জিজ্ঞাসাবাদ করবে। আর সবার আগে তোমার দেশ তোমাকে ডিজ ওন করবে। এটা জানো নিশ্চয়ই”?

বীরেন বলল, “হ্যাঁ। কত বার যে শুনেছি”।

সায়ক বলল, “বার বার শোনা, আর নিজের সঙ্গে সেটা ঘটতে দেখার মধ্যে পার্থক্য আছে। যার জন্য জীবন দিচ্ছো, তারাই তখন বলে দেবে একে আমি চিনি না। বিষয়টা নট এ ম্যাটার অফ জোক বীরেনবাবু। বর্ডারে লড়াই করার মানে তুমি ফ্রন্টলাইনে থাকছো। বুক চিতিয়ে লড়াই করছো। আর এখানে থেকে সর্বক্ষণ তোমাকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে হবে। খুব সহজে মিশে যেতে হবে এখানে। বীরত্ব দেখালেও হবে না। লুকিয়ে থাকো আর যা খবর আসবে, দেশে পাঠাতে থাকো। সিম্পল”।

বীরেন বলল, “সুলেমান ভাল লোক ছিল। এখন ওর জন্য খারাপ লাগছে। আগে জানলে ওকে মসজিদে ঢুকতে দিতাম না”।

সায়ক বলল, “আমরা সবাই ভাল লোক, যতক্ষণ না আমাদের স্বার্থের সংঘাত হচ্ছে। সুলেমান যদি জানতে পারতো তুমি একজন ভারতীয়, তোমার উদ্দেশ্য অন্য, তাহলে ও তোমাকে একই ভাবে ট্রিট করত না। সবার আগে ও পুলিশকে খবর দিত। কিন্তু, অন্যদিকে... হ্যাঁ, সুলেমান ভাল লোক ছিল। আমাদের দু দেশেই এরকম অসংখ্য ভাল মানুষ আছে যাদের মধ্যে মানবিক গুণ আছে। যারা মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখে। দেশভাগের আগে যখন দুটো দেশ এক ছিল, তখনো এরা এত কিছু ভাবেই নি। স্বার্থের সংঘাত হবার সঙ্গে সঙ্গে সব রকম ঝামেলা শুরু হয়ে গেল। ঠিক কোন কারণে, কেন এত শত্রুতা, তার গভীরে গিয়ে কিচ্ছু লাভ নেই এখন। আমাদের লক্ষ্য আলাদা। ঠিক এই সময়েই, আমাদের দেশেও পাকিস্তানি কোন চর আছে। হতে পারে তারা টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের মদতপুষ্ট। তাদের জীবনের একটাই লক্ষ্য। ব্লাস্ট করা। মানুষের ক্ষতি করা। এরা ডেঞ্জারাস এলিমেন্ট। একটার পর একটা ঝড় আসবে, একটা অ্যাটাক করতে না করতে আরেকটা অর্গানাইজেশন আরেকটা অ্যাটাকের জন্য প্রস্তুতি নেবে, আমাদের কাজ হবে তাদের যে করে হোক আটকে যাওয়া”।

বীরেন বলল, “কী করে বুঝব, ওরা কোন অ্যাটাকের প্রস্তুতি নিচ্ছে”?

সায়ক বলল, “যখন বহুদিন কোন বড় অ্যাটাক হবে না। বুঝবে এগুলো ঝড়ের আগের নিস্তব্ধতা। ইমান শেখের ব্যাপারে ওদের তৎপরতা বোঝাচ্ছে ওরা আবার কোন প্ল্যান শুরু করেছে। জামিল...” সায়ক চিন্তিত মুখে বীরেনের দিকে তাকিয়ে বলল, “এই জায়গাটা সেফ। তুমি এখন শুয়ে পড়। আমি বেরোচ্ছি। না ফেরা অবধি এখানেই থাকবে”।

বীরেন অবাক হয়ে বলল, “কখন ফিরবেন?”

সায়ক বলল, “মাঝ রাতেও ফিরতে পারি, কিংবা ভোরে। কয়েকটা ফোন করার আছে”। বীরেন বলল, “আমিও গেলে হত না?”
সায়ক বলল, “একবারেই না। তুমি রেস্ট কর। রেস্ট করাটা দরকার”।
পনেরো মিনিটের মধ্যে সায়ক ছদ্মবেশ নিয়ে তৈরি হয়ে গেল। বীরেনকে বলল, “দরজা বন্ধ করে দাও। কোড হল সাতটা নক”।
সায়ক পাঠানের ছদ্মবেশে বেরোল। বাজারের ব্যস্ততা কমেছে। কোন কোন দোকানে এখনও ভিড় আছে। হাঁটতে হাঁটতে সে একটা পিসিওতে এল। বক্সের ভেতর ঢুকল না। বাইরে বসেই নাম্বার ডায়াল করল। ও প্রান্তে একবার রিং হতেই ফোন ধরল, “হ্যালো”।
সায়ক বলল, “আমার কাছে দুটো বইয়ের পার্সেল এসেছে। দুটোই করাচীর। আরেকটা কিন্তু এখনও আসে নি”।
সঙ্গে সঙ্গে ও প্রান্তে আরেকজন ফোন ধরল, “হ্যাঁ, বল”।
সায়ক বলল, “আরেকটা পার্সেল কিন্তু এখনও আসে নি”।
ও প্রান্ত বলল, “পাঠানো হয় নি। বাড়ির প্রাচীর নিয়ে ঝামেলা লেগেছে তো আবার। এখন দেখা যাক কবে সমস্যা মেটে”।
সায়ক বলল, “ও তো লেগেই থাকে। আমার ছেলের আবার পরীক্ষা আছে। বই না এলে তো বিপদ। একটু তাড়াতাড়ি করলে ভাল হয়”।
“ঠিক আছে। দেখছি। আমি চেষ্টা করছি”।
“ঠিক আছে”। সায়ক ফোন কেটে দিল।
পিসিওর মালিক বলল, “পরীক্ষার বই? আম্রিকা যাবার পরীক্ষা নাকি মিয়াঁ?”
সায়ক বলল, “হ্যাঁ। সেই কবে আসার কথা ছিল, এখনও এল না। কত টাকা হল?”
বিল মিটিয়ে সায়ক হাঁটতে হাঁটতে বাস স্ট্যান্ডে এল। ইসলামাবাদের লাস্ট বাস দাঁড়িয়ে আছে। জনা দশেক লোক হয়েছে। সায়ক বাসে উঠে পিছনের দিকের সিট নিয়ে জানলার পাশে বসল।
ঘড়িতে রাত দশটা পনেরো।
সায়ক চোখ বন্ধ করল। এই সময়টুকু একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।

৪৮
ঢাকা। রাত আটটা।
একটা বন্ধ টেক্সটাইল কারখানার ভিতরের অফিস ঘরে আতর বসে আছে। কয়েকজন মিলে সুমাইমাকে এনে ঘরের ভিতর ঠেলে ফেলল।
সুমাইমাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। মেঝেতে পড়ে তার ব্যথা লাগল, কিন্তু শব্দ হল না।
আতর বলল, “ভেবেছিলি পালিয়ে যাবি? তাই না?”
সুমাইমা আতরের দিকে তাকাল। কিছু বলল না।
আতর বলল, “তুই ঠিক কী চাস বল। বলবি মাগী?”
চিৎকার করে উঠল আতর।
সুমাইমা আতরের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল, “মেরে ফেলবি? রেপ করবি? কর”। আতর বলল, “মারব? এত সোজা? তাহলে তো হয়েই গেল। রফিক সাহেবের থেকে আনন্দ পেয়েছিলি না? আজ তোকে আরো আনন্দ দেওয়ার লোক আসবে। আজ দেখি তোর কেমন সাহস”।
সুমাইমা পাগলার মত হাসতে শুরু করল।

আতর এগিয়ে এসে সুমাইমার গাল পেঁচিয়ে সজোরে একটা চড় মারল, "তোর জন্য আমাদের সব জায়গায় নাম খারাপ হয়ে গেল। এই জন্য তোর পেছনে আমরা এত খরচা করেছিলাম?"
সুমাইমার হাসি থামল না।
আতর রাগী চোখে সুমাইমার দিকে তাকিয়ে চেয়ারে বসল।
হাসতে হাসতে সুমাইমার দু চোখ বেয়ে জল পড়ছিল।
কিছুক্ষণ পর দুজন আতরের ঘরে ঢুকল। একজনের নাম বিলাল, অপরজন ইউসুফ।
ওদের দেখা মাত্র আতর সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল, "আসুন জনাব"।
বিলাল এসে সুমাইমার মাথার চুল ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে তাকে একটা চেয়ারের কাছে নিয়ে এসে বলল, "বল, তোকে কে পাঠিয়েছিল"?
সুমাইমা বিলালকে দেখে আবার হাসতে শুরু করল।
বিলাল আতরের দিকে তাকাল, "ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করিস নি? এতগুলো ডলার কী করতে পাঠানো হয় তোদের?"
আতর ভীত গলায় বলল, "আমরা তো খোঁজ নিয়েছিলাম। জেনেছিলাম ওর বাবা আমাদেরই লোক"।
বিলাল বলল, "খোঁজ নিস নি। খোঁজ নিলে এত বড় অঘটন ঘটত না। যে লোককে গোটা হিন্দুস্তান এতদিন ধরে খুঁজে পেল না, তাকে এই মেয়েটা মেরে ফেলল। ছি"!
আতর মাথা নিচু করে বসে রইল। বিলাল বলল, "এটা আজ রাত আমাদের দুজনের কাছে থাকবে। বাকিরাও দেখুক আমাদের কথা না শোনার ফল না হতে পারে। যা, এটাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা কর"।
আতর দলের ছেলেদের ডাকল। তারা সুমাইমাকে টানতে টানতে নিয়ে বেরিয়ে গেল।
বিলাল বলল, "ইন্ডিয়ান শুয়োরগুলো কোথায় এখন?"
আতর বলল, "জি, একটা গ্রামে লুকিয়েছে জনাব। ওদের ড্রাইভারটাকে আজ সকালেই কব্জা করেছি। ঠিকানাও পেয়ে গেছি"।
বিলাল রেগে বলল, "তাহলে এখানে বসে কী করছিস?"
আতর বলল, "চিন্তা করবেন না জনাব। আজ রাতেই ওদের ব্যবস্থা করছি। আপনারা এখানেই থাকুন। আমাদের উপর ছেড়ে দিন"।
বিলাল বলল, "ওদের জ্যান্ত নিয়ে আসতে পারবি? ইন্ডিয়ান জাসুসগুলোকে আমি নিজের হাতে মারবো"।
আতর বলল, "জ্যান্ত হবে না জনাব। আমাদের সব তো ভাড়াটে সৈন্য জনাব।"
বিলাল বলল, "এতদিন ধরে আমাদের ডলারগুলো নিলি, ট্রেনিং ক্যাম্পের নাম করে। ট্রেনি ছেলেগুলো কোথায়? ভাড়াটে লোক পাঠাচ্ছিস? লজ্জা লাগে না?"
আতর মাথা নিচু করল।
বিলাল আতরের মুখে সজোড়ে চড় কষাল।

#
রাত একটা।
আশরফ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। মাথুর পায়চারি করছিলেন।
গুরপ্রীত এসে বলল, "একটা পুলিশ ভ্যান এসে দাঁড়িয়েছে বাইরের গেটের সামনে"। মাথুর বললেন, "এখনই এসেছে?"
গুরপ্রীত বলল, "হ্যাঁ"।
মাথুর বললেন, "সবাইকে ডেকে এই ঘরে নিয়ে এসো"।
গুরপ্রীত বেরিয়ে গেল।

মাথুর আশরফকে ডাকলেন। আশরফ উঠে বসে বললেন, "কী হল?

মাথুর বললেন, "পুলিশ ভ্যান। পুলিশ এসেছে কেন?"

আশরফ উঠে জানলার কোণ থেকে দেখলেন, প্রথমে একটা পুলিশ ভ্যান ছিল। এখন আরেকটা ভ্যান এসে দাঁড়ালো। আশরফ মাথুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শিট"।

মাথুর বললেন, "এবার কী করবে? এরা এ বাড়ি ঘিরে ফেলবে। লড়াই করবে?"

আশরফ চিন্তিত মুখে আরেকবার বাইরের দিকে নামলেন। হাতে ভারি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ভ্যান থেকে কয়েকজন নামল। আশরফ গুণতে শুরু করলেন।

তারেক ঘরে ঢুকলেন, "ওদিকে তাকিয়ে লাভ নেই। এরা পুলিশ না। অনেকজন আছে। একবারে কোন আলো জ্বালাবার দরকার নেই। আমার সঙ্গে চল"।

গুরপ্রীত তাদের দলের বাকি তিনজনকে ডেকে নিয়ে এসেছিল।

ঘর থেকে বেরিয়ে জানলা বাঁচিয়ে মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে তারা সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামল।

বাইরে থেকে গুলির শব্দ পাওয়া গেল। সোহান রিভলভার বের করল। তারেক বললেন, "একদম এ বোকামি না। ওরা কতজন আছে আমরা জানি না। আমার সঙ্গে এসো"।

লোকজনের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল।

তারেক বললেন, "এরা আর যাই হোক, পুলিশ না। পুলিশ অকারণ গুলি চালাবে না।

তারেক পথ দেখিয়ে বাড়ির কোণের ঘরে নিয়ে গিয়ে মেঝের একটা ঢাকনা খুলে টর্চ মারলেন। বললেন, "চল"।

আশরফ বললেন, "এটা কী? সুড়ঙ্গ?"

তারেক বললেন, "হ্যাঁ। এখন লড়াইয়ের সময় না। গা ঢাকা দেওয়ার সময়। এসো"।

তারেক টর্চ মেরে নিচে নামলেন। এক মানুষ সমান উঁচু একটা সুড়ঙ্গ। বললেন, "একদম শেষে যে নামবে, ঢাকনা বন্ধ করে দিও। আমার সঙ্গে এসো"।

তারেক হাঁটতে থাকলেন। একবারে বদ্ধ সুড়ঙ্গ। দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তবু সবাই সাবধানে তারেককে সামনে রেখে হাঁটতে থাকলেন। প্রায় মিনিট পনেরো হাঁটার পর একটা সিঁড়ি এল। তারেক সন্তর্পণে সিঁড়ি ভেঙে উঠে ঢাকনা অল্প সরিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। সুড়ঙ্গ তাদের বাড়িটার সীমানার বাইরে একটা পরিত্যক্ত মন্দিরের কাছে নিয়ে এসেছিল। মন্দিরটা বাড়ির পেছন দিকে। তারেক ঢাকনাটা পুরো খুলে বাইরে এসে বললেন, "চলে এসো"।

সবাই একে একে বাইরে এলেন। আশরফ বললেন, "এই সুড়ঙ্গের কথা তুমি জানতে?"

তারেক বললেন, "এটা গোপন সুড়ঙ্গ। আমার কলিগ আমাকে দেখিয়েছিল। খুব সম্ভবত রায়টের সময় এই বাড়ির জমিদার আগে থেকেই হয়ত কিছু আঁচ করতে পেরে এটা বানিয়েছিলেন"।

বাড়ির ভেতর থেকে টর্চের আলো দেখা যাচ্ছে। সোহান বলল "স্যার, আমরা ওদের ছেড়ে দেব? আমরা চারজন আছি তো। আপনারা শুধু অর্ডার করুন, বাকিটা বুঝে নিচ্ছি"।

আশরফ বললেন, "একবারেই না। আমাদের এক্সিস্টেন্সটাই লুকোতে হবে এখন। এখানে বসে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

মন্দিরের মধ্যে ঝোপ, জঙ্গল ভর্তি।

চারপাশে ধান ক্ষেত। খুব দূরে গ্রামের আলো দেখা যাচ্ছে।

তারেক ফোন বের করে একটা নাম্বারে কয়েকবার ডায়াল করলেন। ফোন সুইচড অফ বলছে। তারেক বললেন, "মারাত্মক ভুল করে ফেলেছি কাল ড্রাইভারটাকে ছেড়ে দিয়ে। ওর ফোন বন্ধ। তার মানে কোনভাবে ওরা ওর থেকে খোঁজ পেয়েছে"।

আশরফ তুষারকে ফোন করলেন। তুষার ফোন ধরে বললেন, "বল"।

আশরফ সবটা জানালেন। তুষার বললেন, "ওখানেই থাকো। আমি দেখছি"।
তারেক শ্বাস ছাড়লেন, "আমার ভুলের জন্যই এটা হল। আমার উচিত ছিল ড্রাইভারটাকে রেখে দেওয়া। আমি ভাবলাম এখানে আবার ভিড় বাড়বে! ছেলেটা বিশ্বস্ত ছিল"।
আশরফ বললেন, "দে আর ট্র্যাকিং ইউ অলসো। নইলে তোমার ড্রাইভারের খোঁজ ওরা পেত না। তোমার ফ্যামিলি কোথায় আছে?"
তারেক বললেন, "বউ বাচ্চা সব শ্বশুরবাড়ি গেছে। তোমার কেন মনে হচ্ছে ওরা আমার খোঁজ পেয়ে গেছে?"
আশরফ বললেন, "ওদের ইন্টেলিজেন্সকেও খাটো করে দেখছি না বলে মনে হচ্ছে। আমার মনে হয় না তুষার স্যার তোমাকে আর বাংলাদেশে রাখার রিস্ক নেবেন"।
তারেক বললেন, "আমি আর কোথাও যাবো না খান। তাতে মরতে হলে মরব। যে দেশ স্বাধীন করায় আমাদের সব থেকে বড় ভূমিকা ছিল, সে দেশে আই এস আই এসে যা ইচ্ছে করবে, আর আমাদের সেটা মেনে নিতে হবে? এটা সম্ভব?"
মাথুর হতাশ গলায় বললেন, "কত আশা করে এদেশে এসেছিলাম ভাই। কাচ্চি খাবো, ইলিশ খাবো। তা না, মাঝরাতে মাঠের মধ্যে পোড়ো মন্দিরে বসিয়ে রেখেছো"।
আশরফ বললেন, "রুকসার, তারপর প্রথমে ঢাকার সেফ হাউজে ওদের হামলা, এখন এখানে। কোন একটা লিংক মারাত্মক ভাবে কমপ্রোমাইজড হয়ে গেছে, নয়ত ওরা আমাদের শুধু দেখে যাচ্ছিল। বাংলাদেশ কাশ্মীরের ফিল দিচ্ছে। দিস ইজ সিরিয়াস ম্যাটার"।
তারেক হাসলেন, "রফিক মরে গিয়েও আমাদের জ্বালিয়ে যাচ্ছে। এ দেশে সযত্নে ওদের নেটওয়ার্ক ছড়ানো আছে। ট্রেনিং ক্যাম্প ফান্ডিং থেকে শুরু করে ধর্মের নামে পাকিস্তানপন্থীরা এক জোট হয়েছিল বহু আগেই। রানিং গভর্নমেন্টের প্যারালাল অর্গানাইজেশন চালায় ওরা। সময়ে সময়ে সব রিপোর্টই তো পাঠিয়েছি। কখনো খুলে দেখো নি তোমরা? সবাই কাশ্মীর নিয়েই পড়েছিলে নাকি?"
আশরফ বললেন, "তুষার স্যার নিশ্চয়ই দেখেছেন। কিন্তু অবস্থা যে এতটা খারাপ হয়ে আছে, আমি ধারণা করতে পারি নি। দুটো পুলিশের ভ্যান জোগাড় করে সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে এসেছে..."
আশরফের কথা শেষ হতে না হতেই পুলিশের গাড়ির সাইরেন শোনা গেল। তারেক বললেন, "র‍্যাব এসেছে। নকল পুলিশ আর আসল পুলিশের খেলা হবে"।
সোহান বলল, "স্যার, আমরা কি এখনও..."
আশরফ কড়া গলায় বললেন, "হ্যাঁ। দর্শক হয়েই থাকতে হবে"।
বাড়িটার ভেতর থেকে হৈ চৈ আর গোলাগুলির শব্দ শুরু হল। ওরা চুপ করে বসে রইল।

৪৯

সায়ক চলে যাওয়ার পর বীরেন চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইল। তার ছবি এ দেশের সব খানে চলে গেছে? তুষার স্যার বলেছিলেন এরকম পরিস্থিতি আসা সময়ের অপেক্ষা। এরপর তার কাজই হবে নিজেকে যথাসম্ভব লুকিয়ে রাখা। সায়কের মাথার দাম ধরা আছে পাকিস্তানে। সায়ক অকুতোভয় হয়ে ঘুরে বেড়ায়। সায়কের মতো অকুতোভয় হতে কি সে পারবে?
সায়ক বলেছিল ঘুমোতে। সে ঘুমনোর চেষ্টা করল। ঘুম হচ্ছে না। দম বন্ধ হয়ে আসছে। রাত হয়েছে তো। এবার তো সে বেরোতেই পারে। একটু ঘুরে আসবে না হয় বাইরে থেকে? পরক্ষণে মত পাল্টাল। এটা সিসিটিভির যুগ। কখন কোন ক্যামেরায় মুখ ধরা পড়ে যাবে, কে জানে? এ পাশ ও পাশ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল দরজায় নকের শব্দে। তড়িঘড়ি উঠে বসল। দরজা খুলে দেখল ছদ্মবেশী সায়ক দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে ঢুকে সায়ক বলল, "দরজা বন্ধ কর। তুমি সাতটা নক শুনেছিলে?"

বীরেন লজ্জা পেল। ঘুমের ঘোরে খেয়াল করে নি সায়ক কতবার নক করেছে। সায়ক বলল, "ভাগ্য বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তবে সেটার কারণেই এ যাত্রা বেঁচে গেলে। পরের বার এই ভুল কোর না"। বীরেন মাথা নাড়ল, "ঠিক আছে"।

সায়ক পাউরুটি নিয়ে এসেছিল। বলল, "বাথরুম সেরে খেয়ে ফেলো। বেরনোর কথা স্বপ্নেও ভেবো না। যে ভয় পেয়েছিলাম, সেটাই হয়েছে। রজ্জাক তোমার কথা বলে দিয়েছে। ওরা তোমার ছবি মিডিয়ায় দিয়ে দিয়েছে। মনে রেখো, এখন ধরা পড়লে মসজিদ ব্লাস্টের পুরো দায় ওরা তোমার উপর দিয়ে দেবে। ওরা একটা কাঁধ খুঁজছে যার উপর সব দায় ঝাড়তে পারে। ব্লাস্ট করেছে একটা পলিটিকাল পার্টি, আর দোষ দেবে ইন্ডিয়ার উপর"।

বীরেন বলল, "পনেরো দিন এই ঘরে থাকতে হবে?"

সায়ক বলল, "দেখা যাক। এ দেশে ভোট হচ্ছে শুনেছো তো?"

বীরেন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ"।

সায়ক বলল, "এদেশের ভোট হল সব থেকে বড় জোক। কিছুদিন পরেই দেখা যাবে সেনাবাহিনী আবার দেশের দখল নিয়ে নিয়েছে। কোন কারণ নেই, তবু এরা ভোট করবে। তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি। দেখো"।

সায়ক পকেট থেকে রাওয়ালপিণ্ডির ম্যাপ বের করে মেঝেতে রাখল, "দেখে নাও। তোমাকে তোমার চারপাশ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। এতদিনে আশা করি বুঝে গেছো, রাওয়ালপিন্ডি বেশ পুরনো শহর এবং ভীষণ ঘিঞ্জি জায়গা। ঘিঞ্জি এলাকাগুলো আমাদের লুকোবার ক্ষেত্রে যেমন আদর্শ, ধরা পড়ার ভয় এখানেও কোন অংশে কম নেই। এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এই রাস্তাটা ধরে বেশ খানিকক্ষণ হাঁটলে তুমি বাস স্ট্যান্ড পাবে। এটা অটো স্ট্যান্ড। রাওয়ালপিণ্ডিতে আমাদের ইমান শেখ ছিল। এখন নেই। এখন লিটারালি কেউ নেই। কবে হবে, তাও জানি না। কিন্তু কূটনৈতিক দিক থেকে রাওয়ালপিণ্ডির গুরুত্ব খুব বেশি"।

বীরেন বলল, "ইসলামাবাদে আমাদের কেউ আছে?"

সায়ক বলল, "আছে। আপাতত যত কম জানবে, তত ভাল"।

সায়ক ম্যাপটা বীরেনের হাতে দিয়ে বলল, "ভাল করে স্টাডি কর। মাথায় ঢুকিয়ে নাও। শত্রু দেশের অপরিচিত শহরের প্রতিটা কোণ চিনে নিতে হবে। অবশ্য শত্রু ভাবতেই হবে এরকম কোন ব্যাপার নেই। আমাদের কাজ হল, আমাদের দেশের উপরে আসা থ্রেটগুলোর থেকে নিজেদের বাঁচানো"।

সায়ক পকেট থেকে একটা দুটো ছোট ফোন বের করল। বীরেনের হাতে একটা ফোন দিল, "আপাতত থাকুক। দুটো নাম্বারই লোকাল। ভুলেও ওদেশে ফোন করতে যেও না"।

বীরেন বলল, "না না। সেটা মাথায় আছে"।

সায়ক মেঝের উপরে বসল। জল দিয়ে শুকনো পাউরুটি খেতে শুরু করল। বীরেনের মনে হল, সায়কের এভাবে এত কষ্ট করে এদেশে থাকার তো কোন দরকার ছিল না। দেশে থেকে স্বাভাবিক একটা কাজ করলে কী এমন যেতো আসতো? তা না করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এভাবে কাজ করে যাওয়া, দেশের কেউ জানতেই পারছে না একটা ছেলে তাদের জন্য কত বড় আত্মবলিদান দিচ্ছে!

সে ম্যাপটা দেখল। রাজা মার্কেটে থাকার সূত্রে খানিকটা রাস্তা সে চিনেছিল। এবারে আরো ভাল করে ম্যাপটা দেখতে শুরু করল।

গুলির শব্দ বন্ধ হল কিছুক্ষণ পর। আশরফ তুষারকে ফোন করলেন। তুষার ধরতেই বললেন, "স্যার, এনি আপডেট?"

তুষার বললেন, "আমার কাছে এখনও কোন খবর আসে নি। অপেক্ষা কর"।

আশরফ বললেন, "ঠিক আছে স্যার"।

আশরফ ফোন রাখলেন।

মিনিট পাঁচেক পরে তুষার ফোন করলেন, "হ্যাঁ। গো এহেড। তারেককে ফোন দাও"।

আশরফ তারেককে ফোন দিলেন। তুষার বললেন, "আমিন শেখ আছেন ওখানে। র‍্যাবের অফিসার। চেনো?"

তারেক বললেন, "হ্যাঁ স্যার। চিনি"।

তুষার বললেন, "ওদের নিয়ে এদেশে চলে এসো। ওরা সেফ প্যাসেজ দিয়ে দেবে। বাংলাদেশ এখন তোমাদের জন্য একবারেই সেফ নয়। পরের প্ল্যান আমি পরে ভাবব। আপাতত তোমরা কলকাতায় চলে যাও"।

তারেক বললেন, "স্যার, আমি ওদের পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারি। আমার এখানে ঘর সংসার আছে। ওদের রেখে আমি কী করে যাবো?"

তুষার বললেন, "ওদের নিরাপত্তার জন্য আমি কথা বলছি। তুমি কলকাতায় চলে এসো। পরে ওদের না হয় কলকাতায় নিয়ে যাবে"।

তারেক বললেন, "স্যার আমার বউ কোনদিন ঢাকার বাইরে গেলে পরের দিন চলে আসে। ও কী করে কলকাতায় গিয়ে থাকবে? আমি থাকব স্যার। আমি বুঝে নেবো সবটা"।

তুষার বললেন, "ঠিক আছে। তুমি পরে ঢাকায় ফিরবে তবে। কিন্তু এখন কলকাতায় যাবে"।

তারেক বললেন, "ক'দিনের জন্য স্যার?"

তুষার বললেন, "সেটা আমি জানাবো। কলকাতা অফিসে গিয়ে আমাকে রিপোর্ট করবে। ওকে?"

তারেক বললেন, "ঠিক আছে স্যার"।

ফোন কেটে দিলেন তুষার। ওরা জমিদার বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

তারেক বললেন, "ভালোই ছিলাম। এই রফিকের বাচ্চার জন্য সব গেলো। তুমি জানো আশরফ, আমার বউ আমাকে খুব সন্দেহ করে। এই যে বাইরে থাকতে হবে, কত যে জবাব দিতে হবে কে জানে! তুষার স্যারই বলেছিলেন বিয়ে করতে, এখন এসব করলে হয়? আমার সমস্যাটা বুঝতে হবে না?"

আশরফ তারেকের কাঁধে হাত রাখলেন, "চিন্তা কোর না। স্যার তোমার সিকিউরিটির দিকটা দেখেই তোমাকে কলকাতায় যেতে বলেছেন"।

আশরফের সান্ত্বনাবাণীতে কোন লাভ হল না। তারেক মুখ গোমড়া করে রইলেন।

ভোরের আলো ফুটছে। জমিদার বাড়ির দখল নিয়েছে র‍্যাব। হামলাকারীদের মধ্যে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিদের লাশ গাড়িতে তোলা হচ্ছে। র‍্যাবের একজনের গায়ে গুলি লেগেছে। তাকে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

আমিন শেখ তারেককে দেখে এগিয়ে এলেন, "আরে মিয়াঁ, আপনি তো বিরাট মানুষ! আমি তো সব শুনে পুরাই আকাশ থেকে পড়লাম"।

তারেক বললেন, "কিছু বিরাট মানুষ না। আপনি না এলে এই বিরাট মানুষ আর বাঁচত না আজকে। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। এই মালেদের অ্যাড্রেস ট্রেস করতে পারবেন?"

আমিন বললেন, "হ্যাঁ। এক একটা দাগী তো। রসুল, কাটা পাপ্পু, সব ছিল। তবে ওদের এসবের অভিজ্ঞতা নেই, ফলে আমাদের খুব একটা কষ্ট করতে হয় নি। ভাড়াটে সৈন্য পাঠিয়েছিল"।

তারেক চোখ ছোট ছোট করে বললেন, “রসুল? জোনাকি সিনেমা হলে টিকেট ব্ল্যাক করত?” আমিন বললেন, “হ্যাঁ। চেনেন নাকি?”
তারেক বললেন, “কোথায় রেখেছেন? কোন ভ্যানে? নিয়ে আসা যাবে?”
আমিন বললেন, “শিওর”।
আমিন রসুলকে নিয়ে আসতে বললেন। আশরফ তারেককে বললেন, “কী ব্যাপার?”
তারেক বললেন, “এই অ্যাটাকারদের সোর্সের খোঁজ করছি। দেখা যাক”।
রসুলকে বেশ ভাল মারধোর করা হয়েছে। মুখ ফেটে রক্ত পড়ছে। কাঁদতে কাঁদতে এল। তারেক বললেন, “কীরে, চিনতে পারছিস?”
রসুল তারেকের পা ধরে হাউ মাউ করে উঠল, “স্যার, আমাকে বাঁচান স্যার। আমাকে জোর করে এখানে নিয়ে এসেছিল অ্যালেক্স। ও নিজে মরল, আমাকে এবার র‍্যাব মারবে”।
তারেক বললেন, “কোথা থেকে পাঠিয়েছিল তোদের? বল। আমি র‍্যাবের সঙ্গে কথা বলে তোকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব”।
রসুল শিউরে উঠল, “ওরা মেরে ফেলবে স্যার”।
তারেক বললেন, “আমরা কি তোদের ছেড়ে দেব?”
রসুল বলল, “জিয়া টেক্সটাইল কারখানায় আছে ওরা”।
তারেক বললেন, “ঠিকানা বলতে পারবি?”
রসুল বলল, “জি জনাব”। তারেক আশরফের দিকে তাকালেন, “সোর্স পাওয়া গেছে। এবার কী করবে বল? দেশে ফিরবে, না রাজাকার ধরবে? এই সব কুকুরের ভয়ে পালিয়ে যেতে হবে”?
আশরফ বললেন, “তুষার স্যারের পারমিশন ছাড়া আমি কিছু করতে পারব না”।
তারেক বললেন, “বেশ তো, তোমাদের কিছু করতে হবে না। আমি আমিন সাহেবের সঙ্গে যাবো”।
আশরফ আবার তুষারকে ফোন করলেন। তুষার বললেন, “বেরিয়েছো?”
আশরফ বললেন, “স্যার। এ বাড়িতে যারা পাঠিয়েছিল, তাদের একটা সোর্স পেয়েছি। তারেক যেতে চাইছে। কী করব? ধরতে পারলে আমাদের অ্যাডভান্টেজ আছে”।
তুষার বললেন, “দেশটা ভারতবর্ষ হলে আমি কিছুই ভাবতাম না আশরফ। বাংলাদেশ বলেই চিন্তা হচ্ছে। তোমরা কন্ট্রোল রুমে থাকো। বাংলাদেশের টেরোরিস্ট কন্ট্রোল ইউনিট ইজ কোয়াইট গুড। আমি ওদের বলছি। ওরা দেখুক। তোমাদের তো স্পটে যেতেও সময় লাগবে। ততক্ষণে পাখি পালাবে”।
আশরফ বললেন, “আমরা তাহলে ঢাকা ফিরব?”
তুষার একটু থমকে বললেন, “হ্যাঁ। ফেরো। আমি ঢাকার সঙ্গে কথা বলছি। ওই টেক্সটাইল কোম্পানিতে রেড করে যদি কাউকে পাওয়া যায়, ওরা আমাদের হাতে আন অফিসিয়ালি তুলে দেবে। দেখা যাক, ওরা রাজি হয় নাকি”।
আশরফ বললেন, “ওকে স্যার”।
ফোন রেখে আশরফ তারেককে বললেন, “ঢাকায় ফেরার পারমিশন পাওয়া গেছে”।
তারেক একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলেই আমিনকে বললেন, রসুল একটা ঠিকানা দেবে। ওর থেকে ঠিকানাটা নেওয়ার ব্যবস্থা করুন”।
আমিন বললেন, “নিশ্চয়ই”।
তারেক আশরফের দিকে তাকালেন, “লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট”।
#
এক ঘণ্টার মধ্যে ঢাকার টেরোরিস্ট কন্ট্রোল ইউনিট জিয়া টেক্সটাইল থেকে আতরকে আটক করল।

৫১

প্রেসিডেন্ট নিয়াজি তৈরি হচ্ছিলেন। আক্রম এসে বলল, "জনাব, প্রেস এসে গেছে"।

নিয়াজি জিজ্ঞেস করলেন, "ইন্টারন্যাশনাল প্রেস এসেছে?"

আক্রম বলল, "জি জনাব। ইন্টারন্যাশনাল প্রেসও এসেছে"।

নিয়াজি বললেন, "শাকিল, রজ্জাক, আমিনা?"

আক্রম বলল, "এসেছেন জনাব"।

নিয়াজি বললেন, "ঠিক আছে। চল"। ঘর থেকে বেরোলেন নিয়াজি। প্রেস রুমে ভিড় গিজগিজ করছে।

নিয়াজি তার জায়গায় বসে সামনেটা দেখে নিয়ে শুরু করলেন, "আমি এই প্রেস কনফারেন্স ডেকেছি আমাদের দেশের জন্য এক নতুন সকালের লক্ষ্য নিয়ে। এই মুহূর্তে আমাদের দেশ একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আমি জানি, সামরিক শাসন বেশিদিন থাকলে দেশের গণতন্ত্রের প্রতি প্রশ্ন উঠে যায়। এবার পাকিস্তানে আবার গণতন্ত্রের উৎসব শুরু হবে। ভোট হবে আজ থেকে ঠিক পনেরো দিন পর। বারোই অগাস্ট। নব নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসার আগে অবধি আমার দায়িত্ব আমি পালন করে যাব। স্বাধীনতা দিবসে শপথ নেবে এ দেশের নতুন সরকার। দেশের জন্য নতুন সরকারের কাছে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ থাকবে। আশা করব, নব নির্বাচিত সরকার তাদের কাজ ঠিক ভাবে চালাতে পারবেন"।

সামনের সিট থেকে একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক বলল, "স্যার, সম্প্রতি রাওয়ালপিণ্ডির রাজা মার্কেটের মসজিদে যে বিস্ফোরণ হল, সেটা কি এই ভোটের জন্যই কোন ষড়যন্ত্র থেকে করা হয়েছে?"

নিয়াজি বললেন, "আমরা সন্দেহভাজনের একটা ছবি পেয়েছি। হতে পারে এটা ইন্ডিয়া করিয়েছে। আমাদের দেশে ভোটে ঝামেলা করাটা ইন্ডিয়ার অন্যতম কাজের মধ্যে পড়ে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই নাশকতাকারীকে সনাক্ত করার কাজ চলছে"।

"জনাব, মৌলানা হজরতউল্লাহর ব্যাপারে আপনি কী বলতে চান?"

ফ্ল্যাশ লাইটের আলোর ঝলকানিতে প্রশ্নকর্তাকে দেখা গেল না। পাকিস্তানি সাংবাদিক। নিয়াজি বললেন, "মৌলানা এই প্রেস কনফারেন্সে কীভাবে প্রাসঙ্গিক?"

"জনাব, মৌলানা আপনাকে একজন দুর্বল শাসক বলেছেন। আজ সকালেই আমাদের কাছে ওর সাম্প্রতিক ভিডিওটি এসেছে"।

নিয়াজি বললেন, "আমি জানি না মৌলানা কোন প্রসঙ্গে এই কথা বলেছেন। আমি ওর কথা না শুনে এই ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে চাই না"।

ব্রিটিশ সাংবাদিক বলল, "জনাব, ইন্ডিয়া অনেকবারই মৌলানা হজরতউল্লাহর ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জে নালিশ জানিয়েছে। পাকিস্তান কি ইন্ডিয়ার দাবীকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে?"

নিয়াজি বললেন, "এই ব্যাপারে ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমরা একমত নই। আর প্লিজ, এই প্রেস কনফারেন্সটা মৌলানার ব্যাপারে ডাকা হয় নি। আমার আরো কিছু বলার আছে"।

সবাই চুপ করে গেল।

নিয়াজি বললেন, "পাকিস্তানের জনগণ একটা শক্তিশালী সরকার চায়। এমন সরকার, যা দেশকে অর্থনৈতিক এবং সামরিক, দুভাবেই শক্তিশালী করবে। এই প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে আমি জানাতে চাই, পাকিস্তানের নতুন ভবিষ্যতকে আরো উজ্জ্বল করার জন্য আমি একটি দল গঠন করেছি। আমার দলের নাম পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি"।

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মিডিয়ার সবাই একসঙ্গে প্রশ্ন করতে শুরু করল, "জনাব, জনাব, আপনি নিজেও কি ইলেকশনে কমপিট করবেন?"

নিয়াজি বললেন, "এই মুহূর্তে আমার সেরকম কোন ইচ্ছে নেই। দেশের স্বার্থে দেশের একটা প্রজন্মকে আমি দুর্নীতিমুক্ত পাকিস্তান উপহার দিতে চাইছি। তাদের জন্য আমার এই সিদ্ধান্ত"।

"জনাব, এই সিদ্ধান্ত নিতে আপনাকে চিন বা আমেরিকা কোন রকম সাহায্য করেছে?"
নিয়াজি মাথা নাড়লেন, "আমাকে কেউ কোন রকম সাহায্য বা প্রস্তাব দেয় নি। আমার দেশের স্বার্থে আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বার বার বলছি, এর মধ্যে আর কারো কোন ইন্ধন নেই। সমস্ত সিদ্ধান্ত আমার, সবটাই আমার দেশের জন্য। দলের মুখপাত্র হচ্ছেন শাকিল সিদ্দিকি"।
শাকিল সিদ্দিকি প্রেস কনফারেন্স রুমে প্রবেশ করলেন। নিয়াজি তাকে তার পাশের চেয়ারে বসতে নির্দেশ দিলেন। শাকিলকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন আসতে শুরু করল। নিয়াজি স্বস্তির শ্বাস ছাড়লেন। অনেকদিন ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এতদিন পরে একটা সিদ্ধান্তে আসা গেল। এবার আসল লড়াই। প্রেসিডেন্টের খাস খানসামা জাকির এসে জানালো জনগণের ভিড় হয়েছে হাউজের সামনে। তারা তাদের প্রেসিডেন্টকে দেখতে চায়। গোটাটাই নিয়াজির মস্তিষ্কপ্রসূত। তিনি চেয়েছিলেন একই দিনে মিডিয়াকে দেখাতে দেশের মানুষ তাকে কতটা ভালোবাসে।
হাউজের দোতলার ব্যালকনিতে প্রেসিডেন্ট দাঁড়ালেন। জনগণ তাকে দেখে হাত তালি দিয়ে উঠল। নিয়াজির ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল। তবে তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটা বুলেট এসে তার দু চোখের মাঝখানে এসে লাগল। স্নাইপারের নিখুঁত লক্ষ্যভেদ।
প্রেসিডেন্ট নিয়াজি ভূপতিত হলেন।

৫২

বীরেন শুয়ে ছিল। সায়ক খাবার নিয়ে এসে বলল, "ব্রেকিং নিউজ। নিয়াজি ইজ নো মোর"।
বীরেন অবাক হয়ে উঠে বসে সায়কের দিকে তাকিয়ে বলল, "মানে?"
সায়ক বলল, "টার্গেটে ছিলেন। এবার বিদ্ধ হলেন। এর আগেও ওর উপর মার্ডার অ্যাটেম্পট হয়েছিল, তবে এবারে আর ওরা মিস করে নি। দেশটার আরো বারোটা বাজানোর ক্ষেত্রে ওরা একশো ভাগ সফল"।
বীরেন বলল, "কারা মারতে পারে?"
সায়ক বলল, "সবাই। সবার স্বার্থ আছে। কিছুটা হলেও নিয়াজি এ দেশে আইসিসের প্রবেশ আটকানোর চেষ্টা করছিলেন। তারা হতে পারে। মৌলানা হতে পারে। এমন কী যে পদের বলে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, সেই পাকিস্তানি আর্মির কেউও হতে পারে। আমাদের এখন কে হতে পারে সেটা নিয়ে না ভেবে চিন্তা করা উচিত অন্য ব্যাপার নিয়ে। এখন এ দেশে একটা ডামাডোল তৈরি হবে, সব কিছু এদিক ওদিক হবে, এই সুযোগে আমাদের খাঁচা ছেড়ে বেরোতে হবে। চল। খেয়ে নিয়ে তোমাকে ভাল করে সাজিয়ে দিই। বেরনো যাক"।
দুজনেই তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। সায়ক সামান্য টাচ আপ করে বীরেনের বয়সটা খানিকটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "পা টেনে হাঁটবে। পারবে তো?"
বীরেন বলল, "হ্যাঁ"।
সায়ক বলল, "চল এবার"।
দুজনে বেরোল। রাস্তাঘাট এমন কিছু অস্বাভাবিক না। মানুষ জানে এ দেশে এগুলো কোন কিছুই আলাদা নয়। বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে সায়ক ইসলামাবাদের বাসে উঠল। দুজনে বাসের মাঝামাঝি সিট পেল। বাসযাত্রীরা সবাই প্রেসিডেন্টের খুনের ব্যাপারেই কথা বলছিল। সায়কও সমান উৎসাহে কথা বলতে লাগল।
বীরেন চুপ করে বসে রইল। একটা দেশ, যেখানে কথায় কথায় ব্লাস্ট হচ্ছে, রাজনীতিবিদরা খুন হচ্ছে, দেশের অর্থনীতিড় ক্রমাবনতি হচ্ছে, সে দেশের মূল কাজই হল প্রতিবেশী দেশের ক্ষতি করা। কী অদ্ভুত একটা দর্শন এদের।
ইসলামাবাদ ঢোকার আগে বাস দাঁড়িয়ে গেল। রাস্তায় মিছিল নেমেছে। প্রেসিডেন্টের সমর্থকেরা রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। সায়ক ফিসফিস করে বলল, "দিস ইজ দ্য ডিজায়ারড ডামাডোল"।

কিছুক্ষণ পর পুলিশ এসে লাঠি চার্জ করে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে বাস খানিকটা এগোনোর পর আবার আটকালো। আবার খানিকটা এগিয়ে আবার আটকালো। প্রতিবার কারণ একই। সন্ধ্যে নামছে। এক ঘণ্টার রাস্তা তিন ঘণ্টা লাগল। তারা যখন বাস স্ট্যান্ডে নামল, তখন রাস্তায় রাস্তায় প্রতিবাদ তুঙ্গে উঠেছে। সায়ক বাস স্ট্যান্ডে নেমে অটোতে উঠে বলল, "সেক্টর থ্রি, শাহবাজ অ্যাপার্টমেন্ট"।

অটো চালক বলল, "মিয়াঁ, অটো চলছে অসুবিধা নেই, কিন্তু একবার থেমে গেলে, কোথাও অবরোধ হলে কিন্তু কিচ্ছু করার নেই"।

সায়ক করুণ গলা করে বলল, "ভাইজান, আমাদের চাচা খুব অসুস্থ, যে কোন সময় আল্লাহর কাছে চলে যাবেন, আপনি দয়া করে আমাদের নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন"।

অটোচালক সামান্য নরম হয়ে বলল, "কী করবেন ভাইজান, এই তো দেখছেন কী হাল, আমি দেখছি কোন শর্টকাট দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় নাকি"।

পাকিস্তানের অন্যান্য বড় শহরের মত ইসলামাবাদ ঘিঞ্জি নয়, প্ল্যানড শহর। রাস্তা আটকানো হলেও বেশি সময় লাগল না। অটো চালক তাদের চাচাজানের কথা শুনে আর বেশি অধৈর্য হল না। রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ তারা শাহবাজ অ্যাপার্টমেন্টের গেটে নামতে পারল।

অটোচালককে একটু বেশি রুপী দিলে সে রুপী নিয়ে খুশি হয়ে চলে গেল। সায়ক অ্যাপার্টমেন্টের গেটে গিয়ে সিকিউরিটিকে বলল, "জনাব, সাতশো ন' নাম্বারে যাবো। উসমান আলী"।

সিকিউরিটি উসমান আলীর সঙ্গে কথা বলে তাদের এন্ট্রি করিয়ে তবে ছাড়ল। লিফটে উঠে বীরেন বলল, "উসমান আলী কে?"

সায়ক বলল, "তুমি সেদিন জিজ্ঞেস করছিলে ইসলামাবাদে আমাদের কেউ আছে নাকি?"

বীরেন বলল, "আপনিও তো এরকম অ্যাপার্টমেন্ট কিনে থাকতে পারতেন এখানে?"

সায়ক হেসে ফেলল, "একেক জনের একেক রকম কাজ পছন্দ। তুমি পারবে এখানে সারাজীবনের জন্য থেকে যেতে? দেশে যেতে ইচ্ছে করবে না? তাহলে স্যারকে বলতেই পারো"।

বীরেনের তার মফঃস্বলের কথা মনে পড়ে গেল। বাবার কথা মনে পড়তে ফিরতেও ইচ্ছে করে না, অথচ জন্মভূমির কথা ভাবলে মন খারাপ হয়ে যায়।

সায়ক তার কাঁধে হাত রাখল, "ভেবো না। একদিন সবাই বাড়ি যাবে। অতো চিন্তার কিছু নেই"।

সাতশো ন নম্বর ফ্ল্যাটের কলিং বেল বাজাতেই দরজা খুলে গেল। তারা ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকতেই উসমান দরজা বন্ধ করে বলল, "সুখবর আছে। রাতটা থাকতে পারবে। আমার বউ ওর বন্ধুর বাড়ি গিয়ে আটকে গেছে। রাতে ফিরবে না"।

ফ্ল্যাটটা ছোট। তবে গোছানো।

সায়ক বলল, "ঠিক আছে। কিন্তু এই রাতের মধ্যেই তোমাকে আমার শুধু একটা কাজ করে দিতে হবে"।

উসমান বলল, "বস। বস। বসে বল"।

সায়ক বসল। বীরেনকে বসতে বলল।

উসমান বলল, "বল কী করতে হবে?"

সায়ক তার ছোট ফোনটা বের করে ফোনের ইনবক্স থেকে একটা কোড বের করে উসমানকে বলল, "কোড আছে। সিসিটিভি এক্সেসের ইউজার আইডি। আমাকে এই ইউজার আইডির পাসওয়ার্ড হ্যাক করে লাস্ট উইকের ক্লিপ দেখাতে হবে"।

উসমান হেসে ফেলল, "একটা সোজা কাজ যদি নিয়ে আসো। কোথাকার সিসিটিভি?"

সায়ক বলল, "রাজা মার্কেট, ইমান শেখের দোকানের"।

বীরেন চমকে সায়কের দিকে তাকাল।

৫৩

অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিটের অফিসে আতরকে ইন্টারোগেশন চেম্বারে বসিয়ে রাখা হয়েছে। আমিন তারেককে বললেন, "আমরা আতরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই। আপনারা এ ঘর থেকেই সব শুনতে পারবেন"।

তারেক বললেন, "ঠিক আছে। তাই হোক। ওকে নিয়ে যাবার ব্যাপারে কোন নির্দেশ এসেছে?"

আমিন বললেন, "উপর থেকে ইন্সট্রাকশান না এলে আমরা কিচ্ছু করতে পারব না। আমরা ইন্টারোগেশন শুরু করি। তারপর না হয় দেখা যাবে"।

মাথুর বললেন, "ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করা যায়? খুব খিদে পেয়েছে"।

আমিন লজ্জিত হলেন, "ছি ছি, এটা আমার মাথায় রাখা দরকার ছিল। আপনারা বসুন, আমি এখনই ব্যবস্থা করছি"।

আশরফ বললেন, "এই ছেলেটার ব্যাকগ্রাউন্ড চাই অফিসার। কোথায় বাড়ি, কী করে, কোথায় কোথায় গেছিল, সব জানতে হবে"।

আমিন বললেন, "খোঁজ লাগানো হয়েছে। আপাতত ইন্টারোগেশনটা শুরু হোক"।

আশরফ বললেন, "ঠিক আছে। দেখে নিন কিছু জানতে পারা যায় নাকি"।

তারা কন্ট্রোল রুমেই বসলেন। একজন সিনিয়র অফিসার ইন্টারোগেশন চেম্বারে আতরের মুখোমুখি হলেন।

আতরের সামনে বসে অফিসার বললেন, "নাম?"

আতর বলল, "আতর আলী"।

অফিসার বললেন, "জিয়া টেক্সটাইলের ঘরটা পেলি কী করে?"

আতর কেঁদে ফেলল। বলল, "স্যার, আমি কিছু জানি না স্যার। আমাকে ছেড়ে দিন"।

অফিসার উঠে আতরকে জোরে চড় কষালেন। আতর হাউমাউ করে উঠল।

অফিসার আবার শান্ত মুখে চেয়ারে বসে বললেন, "সত্যি কথা না বললে তোর কপালে যে কী দুঃখ আছে, সে সম্পর্কে তোর কোন ধারণা নেই"।

আতর বলল, "স্যার কেন সত্যি বলব না? আমার কোথাও থাকার জায়গা নেই স্যার। ওই কারখানাটা বন্ধ হয়ে আছে, আমি ওখানে ঘুমোতে যেতাম"।

অফিসার ইন্টারোগেশন চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "রসুল বলে ছেলেটাকে ভেতরে পাঠাতে হবে। আতর কিছুই স্বীকার করছে না"।

আমিন রসুলকে ইন্টারোগেশন চেম্বারের ভেতরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

আশরফ বললেন, "এ কিছুই বলছে না, তাই না?"

আমিন বললেন, "হ্যাঁ"।

আশরফ বললেন, "এদের ট্রেনিং এভাবেই হয়। এত সহজে এরা কিছু বলবে না"।

আমিন বললেন, "ট্রেনিং যেভাবেই হোক, জমিদার বাড়িতে এরা ওই অ্যামেচার দলটাকে পাঠাল কেন?"

আশরফ বললেন, "এটাই তো প্যাটার্ন। আসল মাথা কোন দিন যাবে না। এরা ভেবেছিল আমরা সংখ্যায় কম, সহজেই মেরে আসতে পারবে। লোকাল ক্রিমিনালদের টাকা দিয়ে পাঠালেই কাজ হয়ে যাবে ভেবেছিল। যে ক'টা ধরে পড়েছে, কেউ কিছুই জানবে না। এই আতর জানবে। তাও পুরোটা জানবে না। যেটুকু জানবে, আমাদের সেটুকু জানলেই কাজ হয়ে যাবে"।

আমিন চিন্তিত মুখে বললেন, "ঠিক আছে। রসুলকে নিয়ে আসা হচ্ছে। দেখা যাক"।

রসুলকে প্রাথমিক ফার্স্ট এইড দিয়ে নিয়ে আসা হল। ইন্টারোগেশন চেম্বারের বাইরে ওকে দাঁড় করানো হল। আতরকে দেখা মাত্র রসুল বলল, "এই তো। এই ছিল। এই আমাদের পাঠিয়েছিল"।

আমিন বললেন, "একে আগে চিনতিস?"

রসুল বলল, “না স্যার, আগে এলাকায় দেখি নি। গত কাল সকালে আমাকে একজন ফোন করে বলল অনেক টাকা পাওয়া যাবে একটা কাজ করে দিলে। তারপর ওই কারখানায় দেখা করতে বলল। আমি কি অতো কিছু বুঝেছিলাম স্যার”?
আমিন বললেন, “ঠিক আছে। আমি একবার দেখছি। তুই আয় আমার সঙ্গে”।
রসুলকে নিয়ে আমিন চেম্বারে প্রবেশ করলেন। রসুল আতরের সামনে বসে বলল, “কেমন আছেন ভাইজান?” আতর আকাশ থেকে পড়ার ভাব করে বলল, “কে আপনি? আপনাকে তো আমি চিনি না”।
তারেক মনিটরে বসে ছিলেন। বললেন, “উঁহু, আশরফ ঠিক ধরেছো, এই ছেলে পাকা ঘুঘু। রসুল রেকগনাইজ করার পরেও সটান অস্বীকার করা শুরু করেছে। এর থার্ড ডিগ্রি দরকার”।
আশরফ বললেন, “ঠিক আছে। ওকে আমরা নিয়ে যাই। এখানে থাকলে আমাদের মত করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবো না”।
তারেক বললেন, “তুষার স্যারকে ফোন কর। যে কোন প্রেসের কাছে এই ব্যাপারে খবর গেলে প্রচুর ঝামেলা হবে। আতরের এগেইন্সটে রসুলের সাক্ষ্য ছাড়া কোন সলিড প্রমাণ নেই। এদের কনভিন্স করে নিয়ে যাওয়ার থেকে ব্যাপারটা হাই লেভেল থেকে হোক”।
আশরফ তুষারকে ফোন করলেন। তুষার ধরলেন, “বল”।
আশরফ বললেন, “স্যার, উপর মহলে কথা হল? এই ছেলেটাকে আমাদের চাই”।
তুষার বললেন, “হ্যাঁ, কথা হয়েছে। নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অনেকগুলো সমস্যা আছে। ওকে তোমরা আলাদা করে ইন্টারোগেট যাতে করতে পারো তার ব্যবস্থা করছি”।
আশরফ বললেন, “ঠিক আছে স্যার। তাহলেও হবে। সেটা দেখুন”।
আশরফ ফোন রাখতে দেখলেন, আমিন আতরকে মারতে শুরু করলেন। আতর জোরে চিৎকার করছে।
আশরফ চিন্তিত মুখে আতরের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, “আমরা কিছু একটা মিস করে যাচ্ছি কি?”

৫৪
রাত আড়াইটা। মন দিয়ে ইমান শেখের দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ দেখছে সায়ক। দোকানের সিসিটিভি লগ ইন হ্যাক করে উসমান ঘুমিয়ে পড়েছে। সায়কের সঙ্গে বীরেনও জেগে আছে।
ব্যস্ত বাজার। সর্বক্ষণ মানুষের ভিড় লেগে আছে। সায়ক ফাস্ট ফরোয়ার্ড করে দেখছিল।
বড় কালো গাড়িটা দোকানের সামনে দাঁড়ানো দেখে পজ করে বলল, “ওকে, তাহলে জামিল আজকেই এসেছিল”।
বীরেন বলল, “এই গাড়িটা এর আগেও বাজারে দেখেছি”।
সায়ক বলল, “রোয়াব দেখেছো এর? অন্য কোন গাড়ি এভাবে দাঁড় করিয়ে রাখার ক্ষমতা আছে কারো? জামিলের আছে”।
বীরেন বলল, “জামিলের এত ক্ষমতা কী করে হল?”
সায়ক বলল, “পলিটিকাল পাওয়ার আছে। তা সত্ত্বেও এর ইমানকে দরকার ছিল। এখন যেমন রজ্জাককে দরকার। ব্যক্তিগত দরকার যে নয়, তা বোঝাই যাচ্ছে। দেশের বাইরে থেকে আসা টেরোরিজম ফান্ডের ডলার জামিলের মাধ্যমে পাকিস্তানে সারকুলেট হয়। আর রাওয়ালপিণ্ডি থেকে কাশ্মীরের নেটওয়ার্ক ছিল ইমান শেখের কাছে। এখন ভয়ে হোক, ভক্তিতে হোক, রজ্জাককে সেটা করতে হচ্ছে। কিংবা রজ্জাকই দাদাকে খুন করিয়েছে। আমাদের কপাল মন্দ বীরেন, সব কিছু বড্ড তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। অন্তত আর পনেরোটা দিন পরে ব্লাস্টটা হলে তুমি রজ্জাকের গুডবুকে ঢুকে যেতে। ওর থেকে কাশ্মীর লিঙ্কের ব্যাপারে অনেক কিছু জানার ছিল। ইমানের খুনের পর জামিল অন্য নেটওয়ার্ক ইউজ করছে। রজ্জাকও তাই করছে। এই নতুন নেটওয়ার্কটা বের না করলে এ দেশ থেকে কাশ্মীরে টেরর ফান্ডিং বন্ধ করা যাবে না”।

বীরেন বলল, “জামিল এসেছিল কেন?”
সায়ক বলল, “নতুন কনসাইনমেন্টের বুকিং করতে, আবার কী? রজ্জাক এই জন্যই তো তোমাকে রেখেছিল। ও দোকানের হিসেবের কাজ করত। হিসেবের কাজের কেউ না থাকায় কাশ্মীর যেতে পারছিল না। এবার ওর যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। আমার হিসেব বলছে রজ্জাক কাল ভোরে রওনা দেবে এর আগেও তাই করেছিল। ও পাবলিক ট্রান্সপোর্টে যায়। আমাদেরও যেতে হবে”।
বীরেন বিস্মিত হয়ে বলল, “কাশ্মীর?”
সায়ক বলল, “আপাতত আজাদ কাশ্মীর। তারপর কোথায় যাবে দেখতে হবে। আমাকে আরেকটা খবরও নিতে হত। ঠিক আছে, একটু ঘুমিয়ে নাও তুমি। আমরা ভোর পাঁচটায় বেরোব। আমার আরো কিছু কাজ আছে। জেগে থাকবে না। ঘুমনোর চেষ্টা কর। তোমার ঘুমের দরকার আছে”।
বীরেন বলল, “ঠিক আছে”।
বীরেন সোফাতেই চোখ বুজল। আগের দিনের থেকে সামান্য উন্নতি হল উসমানের ফ্ল্যাটে এসে। মেঝে থেকে সোফা।
ভোর সাড়ে চারটেয় তুলে দিল সায়ক। উসমান উঠে পড়েছিল। সায়ককে বলল, “টেক কেয়ার। তোমার জন্য আবার অ্যাপার্টমেন্টের সিসিটিভি সার্ভার হ্যাক করতে হবে আমায়”।
সায়ক বলল, “সিকিউরিটি এন্ট্রি খাতাটা ভুলো না”।
উসমান হাসল, “একবারেই না। চিন্তা কোর না বীরেন, আবার দেখা হবে। তখন ভাল করে খাওয়া দাওয়া করা যাবে। সায়ক আমায় এত খাটালো এবার, তোমাদের ঠিক করে খাওয়াতেই পারলাম না”।
বীরেন বলল, “না না ঠিক আছে”।
সায়ক বলল, “রাস্তায় দেখা হলে চিনবে না। কোথায় খাওয়াবে হে?”
উসমান বলল, “নিশ্চয়ই খাওয়াবো। দেখা যাক সেটা কবে হয়”।
বীরেনের আরেকবার টাচ আপ করে দিল সায়ক।
দুজনে লিফটে নিচে নামল যখন তখন ভোর পাঁচটা। অবশ্য ভোর বলা ভুল। সূর্য ওঠে নি।
বেসমেন্টের পার্কিং-এ একটা বাইক প্লাস্টিক দিয়ে ঢাকা ছিল। প্লাস্টিক সরিয়ে বাইকটা স্টার্ট দিয়ে সায়ক বলল, “বসে পড়”। বীরেন সায়কের পেছনে বসে বলল, “এটা কি উসমানের বাইক?”
সায়ক বলল, “চোরাই বাইক”।
বীরেন অবাক হয়ে বলল, “মানে?”
সায়ক বলল, “চোর বাজার থেকে কিনে উসমানের কাছে রেখেছিলাম। আজকের মত কোন দিনের জন্যই”।
বীরেন বলল, “এরকম আরো বাইক আছে আপনার?”
সায়ক বলল, “আপাতত নেই। লাগবে হয়ত পরে”।
বীরেন চাপে পড়ে গেল। ধরা পড়লে তো মেরে ফাটিয়ে দেবে লোকজন। নাকি এদেশে এসব বাইক চুরি স্বাভাবিক ব্যাপার? কে জানে!
যে রাস্তা দিয়ে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে তারা বাসে ইসলামাবাদে এসেছিল, সেই একই রাস্তা দিয়ে রাওয়ালপিন্ডি এল। ভোরে অবরোধ হয় না। তবে গত রাতের বিক্ষোভের নিদর্শন রাস্তায় পড়ে ছিল। ছেঁড়া পতাকা, টায়ার পোড়া, কোন কিছুই বাদ নেই।
রাজা মার্কেট এখন একবারে ফাঁকা। সবে কয়েকটা দোকান খুলেছে। সায়ক একটা দূরত্বে বাইক দাঁড় করিয়ে রাস্তার কোণের চায়ের দোকানে বসল। এখান থেকে ইমান শেখের দোকান বেশ খানিকটা দূরে, আবার লক্ষ্যও রাখা যায়।
সকাল সকাল গরম চা খেতে বেশ ভাল লাগছিল বীরেনের। তাদের মফঃস্বলের চায়ের দোকানের কথা মনে পড়ে গেল। বন্ধুরা মিলে তারা দোকানে বসে আড্ডা মারত।

পাঁচটা পঁয়ত্রিশ নাগাদ একটা টয়োটা গাড়ি দাঁড়াল ইমান শেখের দোকানের সামনে। রজ্জাক গাড়িটায় ওঠা মাত্র সায়ক চায়ের দোকানের টাকা মিটিয়ে বাইকে উঠল। বীরেন বাইকে উঠলে সায়ক বলল, "অদ্ভুত ব্যাপার। এখান থেকে চায়ের দোকান বেশি দূরে ছিল না। ইমান তো হেঁটে চলে যেত। এ গাড়ি করল যে?"
গাড়িটা বাস স্ট্যান্ডের দিকে গেল না। ইসলামাবাদের দিকে চলতে শুরু করল। একটা দূরত্ব রেখে সায়ক বাইক চালাতে লাগল। বীরেন বলল, "রজ্জাক মুজফফরাবাদ যাচ্ছে না? তাহলে কোথায় যাচ্ছে?"
সায়ক বলল, "সেটাই তো দেখতে যাচ্ছি হে"। বীরেন বলল, "যদি গাড়িতেই মুজফফরাবাদ যায়, তাহলে আমরা কি বাইকেই যাব?"
সায়ক হেসে ফেলল, "দেখাই যাক না"।
গাড়ি মুজফফরাবাদের দিকে না ঘিরে ইসলামাবাদ শহরের রাস্তায় ঢুকল। সেক্টর ওয়ানের সেন্ট্রাল পার্কের পাশে একটা বড় বাড়ির সামনে দাঁড়াল।
সায়ক বাইক দাঁড় করাল না। গতি কম করল।
বীরেন দেখল বাড়িটা থেকে একজন চারজন লোক পরিবৃত হয়ে একজন বয়স্ক মানুষ বেরোলেন। সায়ক হঠাৎ করেই বাইকের গতি বাড়িয়ে রজ্জাকের গাড়িটা পেরিয়ে পরের চার মাথার মোড়ের পাশে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, "তোমার সকালে ওঠা সার্থক বীরেন। কাকে দেখলে জানো?"
বীরেন বলল, "কাকে?"
সায়ক বলল, "দ্য ওয়ান এন্ড ওনলি মৌলানা হজরতউল্লাহ"।
বীরেন চমকে উঠল।

৫৫

"বল আতর। কেমন আছো?" আতরের সামনে বসে বললেন তারেক।
একটা গোপন বাড়িতে আতরকে নিয়ে আসা হয়েছে। আতরকে দেখে বিন্দুমাত্র মনে হওয়া সম্ভব নয় তার মনের মধ্যে কী চলছে। তারেকের প্রশ্নের উত্তরে আতর সেই একই বাধা বুলি বলল, "ভাল আছি স্যার। আমাকে ছেড়ে দিন না স্যার। আমি কিচ্ছু জানি না"।
তারেক বললেন, "দেখ ভাই, আমরা তো মানুষ। মানুষ মানে কী?"
আতর অবাক হয়ে বলল, "কী স্যার"?
তারেক বললেন, "মানুষ মানে হল হি ইজ মরটাল। মরতে হবেই। তাই না?"
আতর চোখ মুখ শক্ত করে বলল, "জি"।
তারেক বললেন, "এবার তোকে আই এস আই যে কোন ক্যাম্পে গিয়ে যত খুশি ট্রেনিংই দিক না কেন, আমি ঠিক করেছি, মরার আগে তোকে এমনভাবে বাঁচিয়ে রাখব যে তোর জীবনের উপর সমস্ত রকম ভক্তি শ্রদ্ধাই চলে যাবে। বুঝলি?"
আতর বলল, "স্যার আমি কিছু জানি না। বলছি তো বার বার"।
তারেক সোহানকে দেখিয়ে বললেন, "এই ছেলেটা কে জানিস? সোহান রশিদ। ইন্ডিয়ান আর্মি গেরিলা বাহিনী। নিজেরা যেমন অত্যাচার সহ্য করতে পারে, তেমনি তোদের মত ক্রিমিনালদের অত্যাচার করার এক লক্ষ উপায় ধরণের বই লিখে ফেলতে পারে। সোহান, ওকে একটা ডেমো দাও"।
সোহান একটা চামচ নিয়ে আতরের ডান চোখে ঢুকিয়ে দিল। আতর আর্তনাদ করে উঠল। তারেক বললেন, "দেখ আতর, তুই তো মরবিই। কিন্তু তুই আমাদের চিনিস না। নদীর পাশে কিংবা গোপন কোন ট্রেনিং ক্যাম্পের প্রোডাক্টদের পেট থেকে কীভাবে পেট থেকে কথা বের করতে হয়, আমরা জানি। তোর উপর আমার বিন্দুমাত্র মায়া নেই। তোকে মরতেই হবে। তার আগে তুইই আমাদের বলে যাবি, তুই টেক্সটাইল কারখানায় বসে কী করতিস"।

আতরের মুখ রক্তে ভরে যাচ্ছিল। আর্তনাদ করতে করতে আতর বলল, "পাকিস্তান থেকে দুজন এসেছে। ওদের কথাতেই হচ্ছে। আমি আর কিছু জানি না স্যার। বিশ্বাস করুন"।
তারেক বললেন, "কোথায় গেছে তারা?"
আতর বলল, "জানি না স্যার"। তারেক ইশারা করলেন। সোহান একটা বড় কাঁচি দিয়ে আতরের ডান কান কেটে দিল। আতর হড় হড় করে বমি করে ফেলল। তারেক বললেন, "সবে শুরু। বল কোথায় গেছে"। আতর বলল, "সুমাইমাকে নিয়ে গেছে ওরা। মেরে দেবে। মেরে দেবে। সুমাইমার উপর ওদের খুব রাগ। ওদের বসকে মেরেছে সুমাইমা। মেরে দেবে ওরা সুমাইমাকে। আমাকে এবার ছেড়ে দিন স্যার। মেরে ফেলুন। মারুন"।
তারেক বললেন, "কোথায় আছে? ওরা। ক'জন? বল, নইলে তোকে জ্যান্ত অবস্থায় কাটতে শুরু করব"।
আতর বলল, "মগবাজারে আছে। রুম নাম্বার একশো তেরো। দুজন। সেভেন স্টার মুনলাইট হোটেলে। ওমানের পাসপোর্ট স্যার। আমাকে মেরে দিন একবারে স্যার। মারুন"।
তারেক বললেন, "তুই মরবি কেন? তোকে এত তাড়াতাড়ি আমরা মারতে পারি? প্রথমেই বলে দিলে কিছু হত না। এবার যেটা হচ্ছে, সেটা তোর নিজের দোষেই হচ্ছে"।
আতর কাঁদতে থাকল। তারেক আশরফকে বললেন, "দুটো আই এস আইয়ের পাখি মগবাজারে আছে। ও বলছে ওরা নাকি সুমাইমাকে নিয়ে গেছে। সুমাইমা কে?"
আশরফ বললেন, "রুকসার হতে পারে। অন্য কেউ হতে পারে। কী করব, শুভকে দেখতে বলব?"
তারেক বললেন, "শুভ কি পারবে? ওরা অলরেডি ওকে চেনে। শুভকে দেখলে সাবধান হয়ে যেতে পারে। এই অপারেশনে আমি যাবো"।
আশরফ বললেন, "আর যদি এটা ট্র্যাপ হয়?"
তারেক বললেন, "এর পরেও মিথ্যে বলবে?"
আশরফ বললেন, "এদের পক্ষে সব সম্ভব। আমার মনে হয় আমিন সাহেবকে বলা দরকার। এই কেসগুলো ওরা ঠিক ঠাক সামলাতে পারে"।
তারেক বললেন, "আই এস আইয়ের ব্যাপারে আমি কী করে আমিনকে বিশ্বাস করব খান?"
মাথুর বললেন, "না। তারেক ঠিক বলেছে। যদি বিশ্বাস করাও যায়, তাহলেও অনেকগুলো ঝামেলা আছে। তারেকের সঙ্গে আমরাও যাবো। গুরপ্রীত আর সোহান চলুক। দুজনের জন্য আমরা চারজন"।
আশরফ বললেন, "ধরলেও নিয়ে আসবে কী করে?"
মাথুর বললেন, "আগে দেখা যাক আতর সত্যি বলছে নাকি"।
তারেক বললেন, "একটা রিস্ক আমাকে নিতেই হবে। আমি ওই হোটেলে চেক ইন করছি। তারপর দেখছি একশো তেরোতে কেউ থাকে নাকি। ব্যাক আপ হিসেবে তোমরা হোটেলের কাছে থাকবে। ডান?"
আশরফ বললেন, "ডান। তাই হোক"।

৫৬

তুষার সবে ঘুম থেকে উঠেছিলেন, তার ফোন বেজে উঠল। ধরলেন, "হ্যালো"।
"কদম কদম বড়ায়ে যা, খুশি কে গীত গায়ে যা"।
সায়ক। তুষার বললেন, "আপডেট দাও"।
সায়ক বলল, কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়েছে স্যার"।
তুষার ভ্রূ কুঁচকালেন, "মানে?"
সায়ক বলল, "রজ্জাক কনসাইনমেন্ট নিয়ে কাশ্মীর যাবে ভেবেছিলাম, দেখা গেল মৌলানাকে নিয়ে এয়ারপোর্টে গেল। সম্ভবত, মৌলানাকে রজ্জাকের কোন রিলেটিভের কভারে যাচ্ছে"।

তুষার বললেন, “কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কখন জানা যাবে?”
সায়ক বলল, “উসমানকে বলেছি। দেখা যাক”। তুষার বললেন, “মৌলানা অন্য নামে যাবে, তবে রজ্জাকের নাম সম্ভবত পালটাবে না। বের করা সহজ হওয়া উচিত। নিয়াজির অ্যাসাসিনেসনের পরের দিন মৌলানা দেশ ছাড়ছে। সিমস ইন্টারেস্টিং”।
সায়ক বলল, “মৌলানার হিট লিস্টে নিয়াজি ছিল”।
তুষার বললেন, “কোন ফটো তোলা গেছে?”
সায়ক বলল, “হ্যাঁ স্যার। পীযূষকে পাঠিয়ে দিয়েছি”।
তুষার বললেন, “গুড। বীরেনকে নিয়ে আমি চিন্তায় আছি সায়ক। মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে ওকে এখনই পাঠানো ঠিক হয় নি”।
সায়ক বলল, “বীরেন ইজ গুড স্যার। ভেরি গুড। ও পারবে। ওকে কয়েক দিন লুকিয়ে রাখতে হবে। আমি সে ব্যবস্থা করছি। আপনি ভাববেন না। অনেক দিন পর আজ আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারলাম”।
তুষার বললেন, “ওকে। টেক কেয়ার”।
ফোন রেখে তুষার রাইটিং প্যাড বের করে বড় বড় করে লিখলেন, “মৌলানা হজরতউল্লাহ দেশ ছাড়ল। কেন? ও যদি নিয়াজিকে মারার নির্দেশও দেয়, তাহলেও ওর দেশ ছাড়ার দরকার ছিল না। তাহলে ওর অন্য কোন প্ল্যান আছে? কী সেই প্ল্যান?”
তুষারের ফোন আবার বেজে উঠল। মুম্বই থেকে শ্রীবাস্তব ফোন করছেন। ধরলেন তুষার, “বল শ্রীবাস্তব। সুনয়না দাভের আপডেট দাও”।
শ্রীবাস্তব বললেন, “অলমোস্ট সেম রুটিন স্যার। ভদ্রমহিলা একা থাকেন। সকালে উঠে মর্নিং ওয়াকে যান। ফিরে ন’টার সময় কলেজের জন্য বেরিয়ে যান। কলেজ থেকে ফেরার সময় দয়াসাগর আশ্রমে গিয়ে দর্শন করে রাত আটটায় বাড়ি ফেরেন”।
তুষার বললেন, “ওকে। আর কিছু নেই?”
শ্রীবাস্তব বললেন, “আর রাতে ফুড ডেলিভারি অ্যাপ থেকে খাবার আনান”।
তুষার বললেন, “কোন রেস্তোরাঁ থেকে আনান?”
শ্রীবাস্তব বললেন, “সেটা তো দেখি নি স্যার। খোঁজ নিচ্ছি”।
তুষার বললেন, “কী খাবার আনান সেটাও দেখবে”।
শ্রীবাস্তব একটু থমকে গিয়ে বললেন, “ঠিক আছে স্যার”।
তুষার ফোন রেখে লিখলেন, “দয়াসাগর আশ্রম। সুনয়না দাভে দয়াসাগর আশ্রম। দয়াসাগর বাবা... প্রচুর ফলোয়ার। গোটা দেশে। অরিজিন কী? লোকটা কোথাকার?”
তুষার পীযূষকে ফোন করলেন। পীযূষ ফোন ধরেই বললেন, “হ্যাঁ স্যার, মৌলানার ছবি পেয়ে গেছি”।
তুষার বললেন, “আমাকে পাঠাও। আরেকটা ব্যাপারে খোঁজ নিতে হবে। দয়াসাগর আশ্রম। এই দয়াসাগরবাবার অরিজিন কী? কোথাকার লোক? কী করে? এত বাবা হয়ে গেছে চারদিকে, কে যে ঠিক আর কে যে ভণ্ড, কিছুই তো বোঝার উপায় নেই হে!”
পীযূষ বললেন, “দশ মিনিট সময় দিন স্যার”।
তুষার বললেন, “ঠিক আছে”।
দশ মিনিট লাগল না, পাঁচ মিনিটের মাথায় ফোন করে পীযূষ বললেন, “স্যার, দয়াসাগরের ডিটেলস তো বের করা চলছে, তার আগে আপনাকে আরেকটা কথা জানিয়ে রাখি। কিছুদিন আগে লখনউতে ইন্সপেক্টর তরুণ শর্মা আর কনস্টেবল বিজয় প্রধান দয়াসাগরের ডিউটি করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। এদের এখনও কোন ট্রেস পাওয়া যায় নি”।
তুষার সোজা হয়ে বসে বললেন, “ইনভেস্টিগেশন হয় নি?”

পীযূষ বললেন, “ইনভেস্টিগেশন চলছে বলা হচ্ছে। কী চলছে, শুধুই কাগজে কলমে চলছে কি না, এ সব বের করছি। নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কোন কারণও তো নেই”।
তুষার বললেন, “ক’টা আশ্রম আছে এর?”
পীযূষ বললেন, “দেশের সর্বত্র। যেখানে পাচ্ছে, সেখানেই আশ্রম খুলে ফেলছে। একবারে ফ্রাঞ্চাইজি ব্যবসার মত”।
তুষার বললেন, “মুম্বই আশ্রমটাই এর মেইন ব্রাঞ্চ?”
পীযূষ বললেন, “হ্যাঁ”।
তুষার বললেন, “ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিটেলস, কে কে এখানে টাকা দেয়, ফান্ডিং ডিটেলস, সব বের কর তো। আজকে পারবে”?
পীযূষ বললেন, “চেষ্টা করছি স্যার”।
তুষার ফোন রাখলেন। রাইটিং প্যাডে “দয়াসাগর” লিখে নামটা বড় করে গোল করলেন।

৫৭
রাত আটটা।
ঢাকা, মগবাজার।
সুমাইমা বিছানায় নগ্ন হয়ে পড়ে আছে। তার ঠোঁটের কোণ বেয়ে রক্ত পড়ছে।
আতরের খবরটা এসেছে। দুজনে তাড়াতাড়ি তৈরি হচ্ছিল।
বিলাল বলল, “এটাকে কী করবি?”
ইউসুফ বলল, “পড়ে থাক। ওদের পুলিশ যা পারে করুক”। বিলাল হেসে উঠল, “কী আর করবে? পাকিস্তানিদের মত আনন্দ তো আর দিতে পারবে না”।
বিলালও হেসে উঠল। দুজনে হোটেলের রুম থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে নিচে নামতে রিসেপশনে গিয়ে বলল, “আমরা ঘুরে আসছি। চাবি নিয়ে গেলাম”।
রিসেপশনের ছেলেটা বলল, “ঠিক আছে”।
হোটেল থেকে বেরিয়ে বিলাল চাবিটা ড্রেনে ফেলে হেসে উঠল, “আমরা আর ঘুরে আসব না। তোরা পাগলের মত খুঁজে মর”।
ইউসুফও হেসে উঠল।
দুজনে ট্যাক্সিতে উঠে বসল।
#
রাত দশটা। সেভেন স্টার মুনলাইট হোটেলের রিসেপশনে গিয়ে তারেক বললেন, “রুম হবে?”
“হ্যাঁ হবে”।
“ফার্স্ট ফ্লোরে হলে সুবিধা। হাঁটুতে ব্যথা আছে”।
“জি জনাব। দিচ্ছি’।
একশো এক নাম্বার রুমের চাবি নিয়ে ঘরে ঢুকে তারেক আশরফকে ফোন করলেন, “হ্যাঁ খান, আমি হোটেলে চেক ইন করেছি”।
আশরফ বললেন, “একশো তেরোতে কেউ আছে?”
তারেক তার রুম থেকে বেরোলেন। একশো তেরোর সামনে গিয়ে দেখলেন তালা ঝুলছে। বললেন, “তালা দেওয়া”।
আশরফ বললেন, “শিট। তাহলে কী হবে?”
তারেক বললেন, “আমার তালা খুলতে দু মিনিট লাগবে। খুলব?”

আশরফ বললেন, “খোল”।
তারেক চারদিকে দেখলেন। করিডরে কেউ নেই। হোটেল করিডোরে কোন সিসিটিভি নেই। পকেট থেকে একটা তার বের করে তালা খুলতে চেষ্টা করলেন। দুবার হল না। তৃতীয়বার তালা খুলে গেল। ঘরে ঢুকে দেখলেন সুমাইমা কাতরাচ্ছে। তারেক বাথরুমের দরজা খুললেন। কেউ নেই। সুমাইমার কাতরানি বাড়ছিল। তাড়াতাড়ি একটা চাদর দিয়ে সুমাইমাকে ঢেকে জলের বোতল নিয়ে সুমাইমার চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে বললেন, “শুনতে পাচ্ছো?”
সুমাইমা কোন সাড়া দিল না। তারেক বললেন, “আশরফ। মেয়েটাকে সম্ভবত রেপ করে ফেলে রেখে গেছে। রক্তে ভাসছে বিছানা। আমি আমিনকে ডাকছি। আমার হাতে আর কোন উপায় নেই”।
আশরফ বললেন, “হু। ডাকতে হবে। ইনহিউমান শোনাচ্ছে, তবু বলব মেয়েটার একটা ছবি পাঠাও। নিডস আইডেন্টিফিকেশন”।
তারেক সুমাইমার ছবি তুলে আশরফকে পাঠালেন।
আশরফ ছবি দেখে বললেন, “গুড গড! এই মেয়েটাই রুকসার! একে বাঁচাতে হবে তারেক। অ্যাট এনি কস্ট। নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা কর। এখনই। আমরা আসছি”।
তারেক বললেন, “আমি দেখছি”।
তারেক দৌড়তে দৌড়তে রিসেপশনে দিয়ে হোটেল তোলপাড় করে দিলেন কয়েক মিনিটের মধ্যে। প্রায় একই সময়ে অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে আমিনও এসে উপস্থিত হলেন। হোটেলের বাইরের ভিড়কে সরিয়ে সুমাইমাকে নার্সিং হোমে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হল।
রিসেপশনের ছেলেটাকে আমিন ধমক দিলেন, “আইডি চেক করে হোটেল দিস নি?”
ছেলেটা ঘাবড়ে গিয়ে বলল, “আই ডি দিয়েছিল স্যার”।
আমিন বললেন, “দেখা”।
আই কার্ডের ফটো কপি খুঁজে বের করল ছেলেটা। আমিনের হাতে দিল। আমিন ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, “এগুলো জাল। মেয়েটাকে নিয়ে ঢুকেছিল আর তোরা মেয়েটার আই কার্ড নিস নি? এসব চলে এই হোটেলে?”
ছেলেটা মাথা নিচু করল। আমিন বললেন, “মালিককে ডেকে পাঠা। হোটেল সিজ করার ব্যবস্থা করছি”।
তারেক মাথুর এবং আশরফের কাছে এসে বললেন, “রফিক শেরাটনে উঠেছিল আর এই দুজন যদি আই এস আইয়ের লোক হয়, তাহলে এরকম হোটেলে কেন উঠেছে?”
আশরফ বললেন, “লুকিয়ে থাকার জন্য। এসব জায়গায় লুকোনো সহজ”।
তারেক বললেন, “শুধু কি তাই? অন্য কোন মতলব নেই তো?”
মাথুর বললেন, “পাখি তো পালিয়েছে। ঘরটা আরেকবার ভাল করে খুঁজে দেখাই যায়”।
তারেক বললেন, “চল”।
আমিনকে বলে তারা একশো তেরো রুমে ঢুকলেন। বিছানার চাদরের মধ্যে রক্ত, একটা বাজে গন্ধ আসছে ঘরটা থেকে। তিন জনই নাকে রুমাল চাপা দিলেন। আশরফ ওয়ার্ডরোব খুললেন। ওয়ার্ডরোবে কিছু নেই। তন্ন তন্ন করে ঘরের প্রতিটি কোণ খুঁজে ডাস্টবিন থেকে একটা ট্রেনের টিকেট পাওয়া গেল। দুজনের চট্টগ্রাম থেকে ঢাকার টিকিট।
আশরফ বললেন, “চট্টগ্রাম থেকে এসেছিল। চট্টগ্রামে কী থাকতে পারে?”
তারেক বললেন, “অনেক কিছুই থাকতে পারে। ক্যাম্প তো থাকতেই পারে। ক্যাম্প থাকা অদ্ভুত কিছুই নয়। দুর্গম জায়গুলোতে, যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামে ওদের ক্যাম্পের খবর আমার কাছে আছে। অবাক হবার কিছু নেই”।
আশরফ বললেন, “আমাদের দেরী হয়ে গেল মাথুর। আতরের খবরটা পেয়েই ওরা পালিয়েছে”।

রশিদ আর শাহিদ তাদের ঘরে বসে টিভি দেখছিল।
বাশার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে বলল, "চাচাজান ফোন করেছেন। কথা বলবেন"।
রশিদ টিভি বন্ধ করে দিল। বাশার দরজা বন্ধ করে ফোন স্পিকারে দিল।
ওপাশ থেকে মৌলানার গলা ভেসে এল, "আমরা খুব কঠিন সময়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের মানুষেরা কষ্টের মধ্যে আছে। এই সময় যদি আমরা আমাদের মানুষের পাশে না দাঁড়াতে পারি, তাহলে আর কী লাভ হল? পাকিস্তানের তখতে কে বসবে, তার সিদ্ধান্তও আমরাই নিতে পারবো ইনশাল্লাহ, যদি এই অপারেশনটা সফল হয়"।
রশিদ বলল, "চাচাজান, আপনি শুধু সময় আর জায়গা বলুন। বাকিটা আমি দেখছি"।
মৌলানা বলল, "মুম্বই"।
রশিদ বলল, "মুম্বইয়ে কোথায় করতে হবে?"
মৌলানা বলল, "আমি জায়গা বলব না। তোরা জায়গা ঠিক কর। যেখানে প্রচুর লোক থাকবে, সেখানে তোরা দিওয়ালী খেলবি। যত বেশি জোরে শব্দ হবে, তত তাড়াতাড়ি সবাই শুনতে পাবে"।
রশিদ বলল, "কবে?"
মৌলানা বলল, "পরশু সোমবার। সব থেকে বেশি লোক বেরোবে। ওই দিন"।
রশিদ বলল, "ঠিক আছে চাচাজান। আমরা তৈরি"।
মৌলানা বলল, "একটা কনট্যাক্ট পাঠাচ্ছি। শুধু জামা পরলেই তো হবে না, জামায় গয়নাও পরতে হবে। গয়নার ব্যবস্থা করা হয়েছে"।
মৌলানা ফোন কেটে দিল।
বাশার বলল, "একটা ছেলে পাওয়া গেছে। এখানের বস্তিতে থাকে। ওকে পাঠানো যেতে পারে"।
রশিদ বলল, "ছেলে ঠিক হয়ে গেছে। আমি আর অন্য কাউকে নেবোই না"। শাহিদ বলল, "কী রে বাশার, সত্যি করে বল তো, ওটা কি তোর ছেলে?"
বাশার রাগী চোখে শাহিদের দিকে তাকাল।
শাহিদ এগিয়ে এসে বাশারের পেটে লাথি মারল, "কাকে চোখ দেখাচ্ছিস তুই?"
বাশার খানিকটা দূরে ছিটকে পড়ল।
শাহিদ বলল, "আমরা যা বলব, তাই মুখ বুজে সহ্য করবি। নইলে তোর সব নাম আমরা খারাপ করে দিয়ে যাবো"।
বাশার কাতরাচ্ছিল। রশিদ বলল, "আগেও তোকে বলেছি, এবার শেষ বারের মত বললাম, আমাদের কাজে বাধা দিতে এলে এর ফল ভাল হবে না। কাল রাতে ছেলেটাকে আমাদের কাছে দিয়ে যাবি। গয়না কোথায়?"
বাশার বলল, "আজ চলে আসবে। কাজটা কিন্তু তোমরা ঠিক করছো না। যখনই বাচ্চাটাকে পাওয়া যাবে না, আমাকে মিসিং রিপোর্ট করতেই হবে আশ্রমের তরফ থেকে। পুলিশের র‍্যাডারে আমি চলে যাবো"।
রশিদ বলল, "বাচ্চা অনেক কারণে হারাতে পারে। তুইই যে সেটা করেছিস, তার কোন প্রমাণ যাতে না থাকে, সেভাবে ব্যবস্থা করবি। গয়নার কনট্যাক্ট এসেছে?"
বাশার তার ফোন দেখল। বলল, "হ্যাঁ। এসেছে"।
রশিদ বলল, "ব্যবস্থা কর। যা"। বাশার খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে গেল। রশিদ দরজা বন্ধ করল।
শাহিদ বলল, "চাচাজান কিন্তু এখনই লোকেশন বলল না। আমরা ঠিক করব মানে?"

রশিদ বলল, "মানে এমন কোন লোকেশনে করতে হবে যেখানে কেউ সিকিউরিটির কথা ভাববেই না। ব্লাস্ট হওয়া নিয়ে কথা। এদেশে তো লোকের অভাব নেই, যেখানেই ব্লাস্ট হবে সেখানেই লোক মরবে"।
শাহিদ বলল, "চাচাজান জানত, বাশার কিছুতেই পারবে না। তাই আমাদের পাঠিয়েছে"।
রশিদ বলল, "আমার তো ইচ্ছা করছে বাশারের গায়েই জ্যাকেটটা পরিয়ে দিয়ে রিমোট অন করে দি। জেনানা কোথাকার"। শাহিদ হেসে উঠল, "যা বলেছো, জেনানাই বটে"।
রশিদের ফোন বেজে উঠল, রশিদ দেখল প্রাইভেট নাম্বার থেকে ফোন এসেছে। সে ধরল, "হ্যালো"।
"রাত আটটায় ফাস্টেস্ট ফুড অ্যাপে গ্রেট ফুড শপ থেকে তিনশো ছিয়াত্তর টাকার পাওভাজি অর্ডার করতে হবে। গয়না চলে যাবে। আর কাউকে কিছু বলতে হবে না"।
এক মহিলা কণ্ঠ কথাটা বলে ফোন কেটে দিল।
রশিদ অবাক হয়ে শাহিদের দিকে তাকাল, "গয়নার কন্ট্যাক্ট চাচাজান বাশারকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু এ তো আমাকেই ফোন করল"!
শাহিদ বলল, "চাচাজান যা চাইবে, তাই হবে। আমরাই শুধু শুধু অধৈর্য হচ্ছিলাম।
রশিদের চোয়াল শক্ত হল, "এবার শুধু অকাল দিওয়ালির অপেক্ষা"।

৫৯

"এই মুহূর্তের সব থেকে বড় খবর হল, মৌলানা হজরউল্লাহকে পাকিস্তান ছেড়ে যেতে দেখা গেছে। জিয়া ইন্টারন্যাশনাল বিমানবন্দর সূত্রে খবর, মৌলানাকে নাম ভাঁড়িয়ে পাকিস্তান থেকে পালাতে সাহায্য করা হয়েছে। গোটা পৃথিবী যখন প্রেসিডেন্ট নিয়াজির খুনের খবর হতচকিত হয়ে গেছে, ঠিক তখনই এই ছবিগুলো আমাদের নড়ে চড়ে বসতে বাধ্য করে। ঠিক কী কারণে প্রেসিডেন্টের হত্যার পরের দিনই মৌলানাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হল? পাকিস্তান বরাবর দাবী করে এসেছে মৌলানা তাদের দেশে নেই, অথচ এই ছবিগুলো তার প্রমাণ দিচ্ছে না। ইন্ডিয়া এই ছবিগুলো দেখে দাবী করছে, প্রেসিডেন্ট নিয়াজির খুনের পেছনে মৌলানা হজরতউল্লাহই দায়ী। অন্যদিকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর দাবী, পাকিস্তানের টালমাটাল পরিস্থিতি তৈরি করতে ইন্ডিয়া এই কাজটা করেছে"।
সি এন এনে বার বার খবরটা দেখাচ্ছে। সামশের খবরটা দেখে আকবরকে ডাকল। আকবর এসে বলল, "খবরটা দেখেছি জনাব। কী করে মৌলানার ছবি বেরিয়ে গেল, আমরা এখনও ক্লু লেস"।
সামশের আকবরের দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল, "এরপর নিশ্চয়ই কারা মৌলানাকে মাসকটে পাঠিয়েছে, মিডিয়া সে খবরও পেয়ে যাবে?"
আকবর বলল, "জনাব, এটা তো আর আগের সময় নয় যে আমরা যেভাবে খুশি অপারেট করতে পারবো। এটা মোবাইল ফোনের যুগ। এই সময়ে আমাদের কিচ্ছু করার নেই। আমরা না চাইলেও খবরগুলো এভাবেই সারকুলেট হয়ে যাবে। মৌলানাকে বার বার বলা হয়েছিল আমরা তার চেহারা পাল্টে দেব। উনি কিছুতেই শোনেন নি। কারো সন্দেহ হলে সেটা কী করে আপনি আটকাতে পারবেন?"
সামশের বলল, "উনি চেহারা পালটাবেন না, আর এবার নতুন জেনারেল আমার মাথা টার্গেট করবেন"।
আকবর বলল, "ভোট হবে না জনাব?"
সামশের বলল, "আর হয়? এবার জেনারেল সিদ্দিকি প্রেসিডেন্ট হবেন। উনি বিকেলে মিটিং ডেকেছেন। আমাকেই টার্গেট করবেন"।
আকবর বলল, "মিডিয়ায় লিকের ব্যাপারটা বাদ দিলে আমার মনে হয় জেনারেল সিদ্দিকি খুশি হবেন আমাদের সামনের অপারেশনের ব্যাপারে শুনলে। মৌলানা ওঁকে পছন্দও করেন। জেনারেল সিদ্দিকির সঙ্গে মৌলানার সম্পর্ক ভাল"।
সামশের বলল, "সেটা ঠিক। আচ্ছা, মৌলানা আবার মুম্বইকেই টার্গেট করছেন কেন? এবার নতুন কোন শহর হলে কী অসুবিধা হত"?

আকবর বললেন, "স্যার, আমার মনে হয় মুম্বই হল এই চেইন অফ ব্লাস্টের ফার্স্ট শহর। ছাব্বিশ এগারোর পর ইন্ডিয়া মুম্বইতে অনেক বেশি সিকিউরিটি বাড়িয়ে দিয়েছিল। ইনক্রিসড সিকিউরিটি ওদের অনেক বেশি কমফোর্ট জোনে নিয়ে যাচ্ছে। মৌলানা যদি মুম্বইতেই সেটা আবার রিপিট করে, ওরা হতচকিত হয়ে যাবে"।
সামশেরের মুখে হাসি ফুটল, "দ্যাটস ট্রু। মুম্বই সেল একটিভেট হয়েছে?"
আকবর বলল, "জি জনাব"।
সামশের বলল, "নিয়াজির ব্যাপারে মৌলানাই ঠিক। নিয়াজি ইন্ডিয়াকে সেভাবে সিরিয়াসলি নেনই নি। উল্টে আমাদের পার্টনারদের ক্ষতি করেছেন। পাকিস্তানের অনেক আগে সিদ্দিকিকে প্রয়োজন ছিল। আচ্ছা, রাওয়ালপিণ্ডি ব্লাস্টের কোন আপডেট আছে"?
আকবর বলল, "পি আর পি করেছে জনাব। পাক্কা খবর। ইলেকশন ঘোষণা হবার আগেই পি আর পিকে ব্যান করে দিয়েছিলেন নিয়াজি। ওরাই করেছে"।
সামশের ভ্রূ কুঁচকে বলল, "তাহলে রজ্জাকের দোকানের ছেলেটা পি আর পির ছিল?"
আকবর বলল, "না জনাব। ওর ব্যাপারে কোন খবর নেই"।
সামশের রেগে গেল, "এভাবে বললে কী করে হয়? খবর নেই মানে কী? খোঁজ নাও। রজ্জাকের দোকানে কাজ করার আগে ছেলেটা সুলেমানের দোকানে কাজ করল। ব্লাস্টের দিন মরল না ওখানে থাকা সত্ত্বেও। পরের দিন রজ্জাকের দোকানে কাজ করতে এল। যেই মুহূর্তে আমরা বাজার ঘিরে দিলাম, ছেলেটা বেপাত্তা হয়ে গেল। পি আর পির ব্লাস্টের সঙ্গে যদি এই ছেলেটার কোন যোগাযোগ না থাকে তাহলে সামথিং ইজ মোর ফিসি। দুপুরে আমাদের ছেলেদের ডাকো। আমাকে এই ছেলেটা যে কোন প্রকারে হাজির করতে দিতে হবে। অ্যাট এনি কস্ট"।
আকবর বলল, "জি জনাব"।

৬০

গোপন বাড়িতে আতরের চিকিৎসা চলছে। কানে ব্যান্ডেজ পরিয়ে দিয়েছে। চোখের ডাক্তার এসেছেন। অদ্ভুতভাবে আতর এখন কান্নাকাটি করছে না। চুপ করে আছে।
তারেক আতরের কাছে গিয়ে বলল, "সুমাইমাকে তুইই রুকসার নাম দিয়ে শুভর কাছে পাঠিয়েছিলি?"
আতর বোবা চোখে তারেকের দিকে তাকাল। তারেক বললেন, "তুই কিন্তু জানিস না তোর কী হাল করতে পারি। যেটা করেছি, সেটা ডেমো। একটা চোখ গেছে, এবার বাকিটাও বের করে নেওয়া হবে। বল বল"।
আশরফ বললেন, "আমি বলছি। আতর বলুক ভুল বলছি নাকি। শুভর উপরে ওদের অনেক দিনের নজর ছিল। ওরা কোনভাবে জেনে গেছিল শুভ কী কাজ করে। ওদের উপর নির্দেশ এল শুভর সঙ্গে রুকসারের আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্য। ওরা জানত একটা সময়ে শুভর রুকসারকে দরকার পড়তে পারে। তাই তো?"
আতর এবার কাঁদতে কাঁদতে বলল, "রুকসার আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ওর কাজ ছিল শুভকে মিসলিড করা। ও রফিকসাবকে মেরে দিয়ে পালিয়ে গেছিল। ওকে পাওয়া না গেলে বিলাল আর ইউসুফ আমাকেই মেরে দিত"।
তারেক ভীষণ রেগে গেলেন, "পাওয়া যাওয়ার পর এই হাল করলি তোরা?"
আতর বলল, "আমি করি নি স্যার। আমার কাজ ছিল ওকে খুঁজে নিয়ে আসা। ওরা ওকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে কী করল, আমরা কী করে জানব?"
তারেক বললেন, "ওর নাম সুমাইমা?"
আতর বলল, "আমাদের তাই বলেছিল"।
তারেক বললেন, "ও কেন তোদের কাছে এসেছিল?"

আতর বলল, “অনেক টাকা পাওয়া যায় স্যার। ওরা খুব গরীব”।
তারেক বললেন, “তারপর তোরা ট্রেনিং দিয়ে পাঠিয়ে দিলি। শয়তানের বাচ্চা যত। তোকে বাঁচিয়ে রাখছি ভেবে নিজের উপর ঘেন্না হচ্ছে আমার”।
আশরফ তারেককে বললেন, “পাশের ঘরে চল”।
তারেক বেরোলেন। মাথুরকে ডেকে নেওয়া হল।
আশরফ বললেন, “সুমাইমাকে ওরা ট্রেইন করে পাঠিয়েছিল শুভর কাছে। সুমাইমা শেষ মুহূর্তে রফিককে মেরে দেয়। কেন মারবে? ওর তো আলাদা কোন অর্গানাইজেশন ছিল না। থাকলে পালিয়ে যাবার পর আবার আতরের পাল্লায় পড়ত না।”
তারেক বললেন, “রফিককেই শুধু মারে নি। তবসসুমকেও মেরেছে। খুনের ধরণ দেখে বোঝা যায়, রাগের মাথায় মেরে চলে গেছিল। আমাদের ওর জ্ঞান ফেরার জন্য অপেক্ষা করতে হবে”।
আশরফ বললেন, “বাংলাদেশে আই এস আইয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ লিংক ম্যান আতর । ওকে কি আমরা ফেলে যাবো?”
তারেক বললেন, “তুষার স্যারের সঙ্গে কথা বল। কারগোতে তুলে নিয়ে চল। ওর আরো প্রপার ইন্টারোগেশন বাকি আছে। মে বি তুষার স্যারের সামনে বসলে আরো অনেক কিছু বলবে”।
আশরফ তুষারকে ফোন করলেন। তুষার ফোন ধরে বললেন, “বল”।
আশরফ বললেন, “স্যার, এই আতরকে নিয়ে যেতে পারলে ভাল হয়। আমার মনে হয়, ও অনেক কিছু জানে। দিল্লিতে না নিয়ে গেলে হবে না”।
তুষার বললেন, “তুমি জানো তোমাদের ওখানে থাকার জন্য আমাকে কত জায়গায় ফোন করে করে রীতিমত ভিক্ষা করতে হচ্ছে? দিল্লি একবারেই পছন্দ করছে না ব্যাপারটা। তোমাদের জন্য ঢাকার সঙ্গে আরও কত কত ব্যাপারে সমঝোতা করতে হবে তোমাদের কোন আইডিয়া আছে?”
আশরফ বললেন, “স্যার, আমার মনে হয় আতরকে দিল্লিতে প্রয়োজন পড়বে”।
তুষার বললেন, “ঠিক আছে। আমি দেখছি কী করা যায়”।
আশরফ বললেন, “স্যার, রুকসারের জ্ঞান ফেরে নি। আমরা ওকে কোন ইন্টারোগেশন করব না? ওকে পাঠিয়েছিল আই এস আই, শুভকে ডবল ক্রস করতে। উল্টে ও রফিককে খুন করে দিল”।
তুষার বললেন, “কী খবর ওর?”
আশরফ বললেন, “ডাক্তাররা বলছেন আটচল্লিশ ঘণ্টা না গেলে কিছু বলা যাবে না। ওরা ওর সঙ্গে পশুর মত বিহেভ করেছে”।
তুষার বললেন, “পশুর মত কথাটা বোল না। পশুরা মানুষদের থেকে অনেক ভদ্রসভ্য। ওই দুজন আই এস আই এজেন্টের খোঁজ পেলে?”
আশরফ বললেন, “ছবি পেয়েছি। ওরা খোঁজ করছে। পেলে জানাবে”।
তুষার বললেন, “হোপফুলি পাবো। পুরো কনফিডেন্ট হতে পারছি না ও দেশটা ইন্ডিয়া নয় বলে। আমি কথা বলছি ঢাকার সঙ্গে। রুকসারের সঙ্গে ওরা দুজন যা করেছে, অন্তত তার জন্য ওদের কোর্ট মার্শাল হওয়া উচিত”।
আশরফ বলল, “রুকসারের জ্ঞান ফিরুক। কথা বলে যদি কিছু জানা যায়, আপাতত সে আশাতেই থাকি”।
তুষার বললেন, “আই নিড দোজ বাস্টার্ডস আশরফ। যেখানেই থাকুক, খুঁজে বের কর। ওদের যদি কোন মিশন থাকে, তার ব্লু প্রিন্ট এদের কাছেই থাকবে”।
আশরফ থমকে গিয়ে বললেন, “ঠিক স্যার”।

ইসলামাবাদ।
সন্ধ্যা সাতটা।
সেক্টর ওয়ানের সেন্ট্রাল পার্কের বেঞ্চে বসে সায়ক মৌলানার ছেড়ে যাওয়া বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল, "রজ্জাকের পদোন্নতি হয়েছে তাহলে। ক্যুরিয়র বয় থেকে সরাসরি মৌলানার ভদ্র সভ্য নকল ছেলে। মৌলানার নাম হয়েছে আসগর আলম। বাপের চিকিৎসা করার জন্য ছেলে তাকে ওমান নিয়ে যাচ্ছে। এবার কথা হল মৌলানা ওমানে কেন গেল?"
বীরেন বাড়িটা দেখছিল। বিকেল থেকে প্রায় দু ঘণ্টা পার্কেই বসে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বসে আছে সায়ক। এই বাড়িটাতেই তাহলে তাদের দেশের অন্যতম মোস্ট ওয়ান্টেড লোকটা লুকিয়ে ছিল? আর পাঁচটা বাড়ির মতই একটা বাড়ি। সেক্টর ওয়ানে সব বাড়িই এক রকমের। ইসলামাবাদের অন্যতম পশ এলাকা। ধূসর রঙের দেড়তলা বাড়ি সার দিয়ে দাঁড়িয়ে। শহরটাকে সুদৃশ্য করে সাজিয়ে রাখেছে পাকিস্তান সরকার।
সায়ক বলল, "সম্ভবত বাড়িতে কেউ নেই। আমাদের একটা চান্স নিতে হবে বীরেন"।
বীরেন বলল, "বাড়িটায় ঢুকব?"
সায়ক বলল, "হ্যাঁ। রাস্তার ক্যামেরাটা অন্য দিকে আছে। বাড়িটাকে ওরা র‍্যাডারে রাখতে চায় না বলে রিস্ক নেয় নি। আমাদের এই সুযোগটাই নিতে হবে। বাদাম খাবে?"
বীরেন বলল, "না না"।
সায়ক বলল, "চল"।
দুজনে পার্ক থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করল। বাড়িটার সামনে এসে সায়ক কলিং বেল বাজাল। বীরেন বলল, "ফাঁকা আছে না?"
সায়ক কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তাদের দুজনকে অবাক করে বাড়ির দরজা খুলে গেল। এক মধ্যবয়স্ক লোক দরজা খুলে বলল, "বলুন"।
সায়ক বলল, "ইসমাইল সাহেবের বাড়ি এটাই?"
লোকটা বলল, "হ্যাঁ। বলুন"।
সায়ক বলল, "আমি ওর সঙ্গে একটা ব্যাপারে কথা বলতে চাইছিলাম"।
লোকটা বলল, "ভিতরে আসুন"।
লোকটা দরজা ছেড়ে দাঁড়াল। সায়ক হঠাৎ বীরেনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আরে খান সাব, আপনার ফোনটা তো অটোতে রেখে এসেছেন"?
বীরেন অবাক হয়ে সায়কের দিকে তাকাল।
সায়ক বলল, "চলুন চলুন। দেখে আসি"।
বীরেন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। সায়ক তাকে একপ্রকার ঠেলে বের করে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করে বলল, "চল। পা চালাও"।
বীরেন পিছনের দিকে তাকাল। দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। সে বলল, "আপনি ইসমাইল না কী নাম বললেন, তাকে চেনেন?"
সায়ক বলল, "না। হাঁটতে থাকো"। বীরেন আরেকবার পিছনে তাকাল। একজন লম্বা মত লোক বাড়িটা থেকে বেরোল। সে বলল, "একজন বেরিয়েছে বাড়িটা থেকে"।
সায়ক বলল, "শিট। বাসে উঠে পড়"।
বাস স্ট্যান্ডে একটা ভিড় বাস এসে দাঁড়িয়েছে। দুজনে বাসে উঠে যথাসম্ভব বাসের ভেতরের দিকে গিয়ে দাঁড়াল। সায়ক জানলা দিয়ে ঝুঁকে দেখল।
না কেউ আসছে না। বাস চলা শুরু করতে সে শ্বাস ছাড়ল।

বাসটা পরের স্টপেজে দাঁড়ালে দুজন নামল। সায়ক বলল, "অনেক দিন পর এরকম একটা মিসফায়ার করলাম। বাড়িটায় লোক ছিল। অদ্ভুতভাবে ছিল। অতক্ষণ ধরে লক্ষ্য করলাম, তবু কাউকে দেখতে পেলাম না তখন?"
বীরেন বলল, "ইসমাইলটা কে?"
সায়ক বলল, "কেউ না। দরজা খুলে দেওয়ায় হতভম্ব হয়ে নামটা বললাম। যখন ও বলল ভেতরে যেতে, তখন বুঝলাম ইসমাইল বড় কথা না। ওর কোন সন্দেহ হয়েছে। ভেতরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করত। ভুল হয়ে গেল হে বীরেন, এ বাড়িটায় এখন ঢোকা যাবে না। ওরা সতর্ক হয়ে গেল"।
অটোয় উঠে সায়ক বলল সিটি বাস স্ট্যান্ডে যাবে। বীরেন বাইরের দিকে তাকাল। অত্যাধুনিক একটা শহর ইসলামাবাদ। সায়কের কাছ থেকে শুনেছে বিদেশী প্ল্যানার আনিয়ে অনেক খরচা করে এই শহরটা বানিয়েছে পাকিস্তান। কিন্তু তাতে কী লাভ হল? সেই তো মৌলানার মত নরপিশাচদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠল শেষ মেশ।
সিটি বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে রাওয়ালপিণ্ডির বাসে উঠল তারা। একদিন পেরোতেই দেশ নিয়াজির হত্যাকাণ্ড ভুলে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এখানেও অস্বাভাবিক কিছু নেই।
সায়ক চিন্তিত মুখে বসে রইল। এত বড় ভুল হয়ে গেল তার? বাড়িটায় লোক ছিল, সে কিছুতেই বুঝতে পারল না?

৬২

প্রেসিডেন্ট হাউজে জেনারেল সিদ্দিকি পরিবার নিয়ে প্রবেশ করেছেন। নিয়াজির খাস খানসামা জাকিরকে কাজে বহাল রাখা হয়েছে।
রিডিং রুমে সিদ্দিকি বসে স্কচ খাচ্ছিলেন। জাকিরকে দেখে বললেন, "তোমার মন খারাপ জাকির?"
জাকির বলল, "এভাবে গুলি চলবে এ হাউজে, ভাবতে পারি নি জনাব"।
সিদ্দিকি বললেন, "রাইট। তোমার কী মনে হয়? কারা এই কাজ করতে পারে?"
জাকির সতর্ক হল। বহুবার এমন হয়েছে, পূর্বসূরীকে খুন করেই উত্তরসুরি তার পদে আসীন হয়েছেন। সে বলল, "আমি হাউজের কাজ দেখি জনাব। আমি তো কাউকে চিনি না"।
সিদ্দিকি বললেন, "তা ঠিক। এটা তুমি ঠিক বলেছো। তা নিয়াজি সাহেব কি তোমার সঙ্গে রাজনীতির আলোচনা করতেন?"
জাকির মাথা নাড়ল, "না জনাব। সেরকম কিছু কোনদিন করেন নী"।
সিদ্দিকি বললেন, "তাহলে? কী আলোচনা করতেন?"
জাকির বললেন, "খাস কিছুই না। স্বাভাবিক কথাবার্তা হত"। ফোন বাজল। জাকির ফোন ধরে কথা বলে বলল, "সামশের আলি সাহেব এসেছেন। উনি বললেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল"। সিদ্দিকি বললেন, "হ্যাঁ। ওকে নিয়ে এসো"।
জাকির বেরিয়ে গেল। সামশের ঘরে ঢুকলে দরজা বন্ধ করে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।
সামশের বলল, "আপনি ডাকার সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছি জনাব"।
সিদ্দিকি বললেন, "জেনারেল নিয়াজি অ্যাসাসিনেশনের তদন্তের দিকে গোটা দুনিয়া তাকিয়ে আছে সামশের। কী বলব তাদের?"
সামশের সিদ্দিকির দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, "আপনি যেমন বলবেন, তেমন রিপোর্ট দেব জনাব"।
সিদ্দিকি গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন, "এই সময়টা আমার এই পোস্টে হানিমুন পিরিয়ড হতে চলেছে। আমাকে কেউ কিছু বলবে না, সবাই শুধু দেখবে আমি কী করি। আপনিই বলুন, আমরা আর আমি কী বলতে

পারি?”
সামশের বলল, “সেটাও আপনিই জানেন জনাব”।
সিদ্দিকি বললেন, “আপনার উপর জাসুসি করার জন্য নিয়াজি আপনার অফিসে দুজন লোক পাঠানোর তোরজোড় করছিলেন, এটা আপনি জানেন?”
সামশের বললেন, “জি না জনাব”।
সিদ্দিকি বললেন, “তাহলে আমি আপনার উপর কীভাবে ভরসা করব সামশের? আপনার উপর জাসুসির খবরই আপনি জানেন না, তাহলে আমি কী করে আপনাকে ভরসা করব?”
সামশের বলল, “এই মুহূর্তে আমার অফিসে কোন লোকই ঢুকতে পারে নি আমার উপর নজরদারী করার জন্য, এই ব্যাপারটাই আপনাকে আমার উপর ভরসা দেবে জনাব”।
সিদ্দিকি হাসলেন। বললেন, “আমি জানার আগে ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া মৌলানার ব্যাপারে জেনে গেল, এই ব্যাপারটাকে আপনি কী করে ব্যাখ্যা দেবেন?”
সামশের বলল, “মোবাইল ফোনের যুগ জনাব। আলোর থেকেও দ্রুতবেগে খবর পৌঁছে যায়”।
সিদ্দিকি বললেন, “গুড। আপনি প্রস্তুত হয়েই এখানে এসেছেন তাহলে। ঠিক আছে। আপনি আপনার আপডেট দিন। এমন কিছু আপডেট দিন, যেটা আমি শুনতে চাইবো”।
সামশের বলল, “মৌলানা সহি সলামাত ওমানে পৌঁছে গেছেন জনাব”।
সিদ্দিকি বললেন, “ব্যাস? আর কিছু না?”
সামশের বলল, “উনি আমাদের উপর শুধু ওকে পৌছনোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এর পর আমাদের সঙ্গে ওর প্রয়োজনমত যোগাযোগ করে নেবেন বলেছেন”।
সিদ্দিকি বললেন, “বাহ। আর আপনি সেটা মেনে নিলেন? আপনার নাম খারাপ করে লোকটা চলে গেল, আর আপনি জানেন না লোকটার প্ল্যান কী, কী করতে চায়?”
সামশের মাথা নিচু করল।
সিদ্দিকি বললেন, “দিস ইজ আটার ফেইলিউর, ইউ নো। এভাবে কাজ করলে আপনার থাকা আর না থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না”।
সামশের অস্থির হয়ে উঠল, “জনাব, অপারেশন ব্লু ফ্লাওয়ার অ্যাক্টিভেট করেছেন মৌলানা”।
সিদ্দিকি এবার খুশি হলেন, “এই তো। দেখেছেন, ঠিক ঠাক চাপ না দিলে কোন কথা বেরোয় না?”
সামশের বলল, “মুম্বইয়ের স্লিপার সেল অ্যাক্টিভেট করা হয়েছে”।
সিদ্দিকি বললেন, “গুড। এন্ড?”
সামশের বলল, “সুখবর যে কোন দিন আসতে পারে”।
সিদ্দিকি বললেন, “আপনি জানেন না কোন দিন আসবে?”
সামশের বলল, “না জনাব”।
সিদ্দিকি বললেন, “ঠিক আছে। ইউ মে গো নাও”।
সামশের উঠে দাঁড়ালেন।
।
৬৩
বিকেল পাঁচটা।
সুনয়নার পিছু নিয়েছেন শ্রীবাস্তব। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সুনয়না প্রথমে লোকাল ট্রেনে উঠে দাদর স্টেশনে নামলেন। সুনয়নার পরনে শাড়ি। সঙ্গে একটা মাঝারি সাইজের লেডিস ব্যাগ।
দাদর স্টেশনের বাইরে থেকে বাস ধরলেন তিনি। বাসে একটা স্টপ যাওয়ার পরেই বাস থেকে নেমে গিয়ে গ্রেট ফুড শপ নামের একটা ছোট রেস্তোরায় প্রবেশ করলেন।

রবিবার বলে রেস্তোরাঁয় লোক কম। শ্রীবাস্তব দূরত্ব রেখে বসলেন। ওয়েটার মেনু কার্ড দিল। শ্রীবাস্তব ধোসা নিলেন। দেখলেন সুনয়না পাওভাজি নিয়েছেন। শ্রীবাস্তব তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলেন। সুনয়না খেয়ে নিয়ে হাত ধুতে গেলেন। হাত ধুয়ে তার ব্যাগটা টেবিলে রেখে বেরিয়ে যেতেই একজন ওয়েটার এসে ব্যাগটা রেস্তোরাঁর কিচেনের ভেতরে নিয়ে গেল।

শ্রীবাস্তব দেরী করলেন না। তিনি রেস্তোরাঁর কিচেনের ভিতর প্রবেশ করলেন। দেখলেন, যে ওয়েটার ব্যাগটা নিয়ে যাচ্ছিল, সে অন্য দরজা দিয়ে বেরোতে যাচ্ছে। শ্রীবাস্তব চিৎকার করলেন, "সবাই যেখানে আছেন, দাঁড়ান। ক্রাইম ব্রাঞ্চ। স্ট্যান্ড বাই প্লিজ"।

ওয়েটারটা দাঁড়াল না। ব্যাগ নিয়ে দৌড়তে শুরু করল। শ্রীবাস্তব ছেলেটাকে ধাওয়া করলেন। ছেলেটা গলিতে ঢুকে যেন মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে গেল।

শ্রীবাস্তব চারদিকে তাকালেন, কোথাও নেই। যেন কর্পূরের মত উবে গেল ছেলেটা।

শ্রীবাস্তব দেরী না করে সঙ্গে সঙ্গে তুষারকে ফোন করলেন। তুষার ধরলেন, "বল"।

শ্রীবাস্তব সবটা বললেন। তুষার বললেন, "একা গেছিলে?"

শ্রীবাস্তব বললেন, "হ্যাঁ স্যার"।

তুষার বললেন, "এটাই ভুল হয়েছে। আমি সুনয়না দাভেকে অ্যারেস্ট করার কথা মুম্বই পুলিশকে বলে দিচ্ছি। ওকে আটক করুক"।

শ্রীবাস্তব বললেন, "আর ওই ব্যাগে কী থাকতে পারে?"

তুষার বললেন, "সুনয়না দাভেকে তোমাদের অফিসে নিয়ে বসাও। দেখো কিছু বলে কি না"।

শ্রীবাস্তব ফোন রাখলেন। রেস্তোরাঁয় ফিরে গিয়ে বললেন, "মালিক কে? এই রেস্তোরাঁর মালিক কে?"

ওয়েটাররা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে বলল, "মালিক নেই স্যার। উনি দেশের বাড়ি গেছেন"।

শ্রীবাস্তব বললেন, "যে ছেলেটা পালালো, ও কবে থেকে কাজ করছে এখানে"?

"তিন দিন স্যার। সবে জয়েন করেছে"।

শ্রীবাস্তব চেয়ারে বসলেন। মাথা কাজ করছে না। ছেলেটা যেন জানত তিনি তাকে ধরবেন। কেমন চোখের নিমেষে হারিয়ে গেল। ছেলেটা এই তিন দিনেই এই অঞ্চলটা রপ্ত করে নিয়েছে? নাকি আরো আগে থেকেই আসা যাওয়া করেছে?

সিগারেট ধরালেন শ্রীবস্তব। বললেন, "রেস্তোরাঁর শাটার বন্ধ কর। সবাই এখানে এসে দাঁড়াও"।

ছেলেগুলো তার কথা শুনল।

শ্রীবাস্তব বললেন, "দেখো, ন্যাশনাল সিকিউরিটির ব্যাপার। তোমাদের আজীবন জেল হতে পারে। যা প্রশ্ন করব, ঠিক ঠাক উত্তর দেবে। ঠিক আছে?"

একজন মাঝ বয়স্ক লোক বলল, "স্যার, এরা কী করবে? কিচ্ছু জানে না এরা। আমায় বলুন"।

শ্রীবাস্তব ভ্রূ কুঁচকালেন, "সামনে এসো"।

লোকটা সামনে এল। শ্রীবাস্তব বললেন, "বল"।

লোকটা বলল, "স্যার, সাতদিন হল আমাদের মালিক আসছে না। ফোনেও পাচ্ছি না। তিন দিন আগে এই ছেলেটা আমাদের মালিকের একটা চিঠি নিয়ে আমার কাছে এসে বলল মালিক পাঠিয়েছে। আমি দোকানের হিসেব দেখি স্যার। মালিকের হাতের লেখা খুব ভাল করে চিনি। আমি দেখলাম উনি লিখেছেন জরুরি কাজে দেশের বাড়ি যাচ্ছি। এই ছেলেটাকে কাজে লাগাতে হবে। আমি তারপরেও মালিকের ফোন ট্রাই করেছি। পাই নি। কিন্তু উনি যেহেতু ছেলেটাকে কাজে লাগাতে বলেছিলেন, আমি ওকে কাজ দিয়েছিলাম"।

শ্রীবাস্তব বললেন, "চিঠিটা আছে?"

লোকটা একটা চিঠি এগিয়ে দিল। শ্রীবাস্তব বললেন, "ছেলেটার আই কার্ড জমা নিয়েছিলে?"

লোকটা বলল, "না স্যার। আমি ভেবেছিলাম এখন কাজে লেগে যাক, পরে মালিক এলে উনিই সব নিয়ে নেবেন"।
শ্রীবাস্তব বললেন, "এখানে এখন যারা আছে, তারা তাদের আই কার্ডের ফটো আমাকে হোয়াটস অ্যাপ... না। হোয়াটস অ্যাপে না, আই কার্ড গুলো নিয়ে আমাকে দাও। আমি ছবি তুলে নিচ্ছি। এই তিন দিনে ওই ছেলেটার সঙ্গে কারো কথা হয়েছে? কোথায় থাকে কিছু বলেছে?"
লোকটা বলল, "ছেলেটা কারো সঙ্গেই কথা বলত না স্যার। যা কাজ বলতাম, সব করত। কিন্তু কাজের বাইরে একটা বাড়তি কথা বলত না"।
শ্রীবাস্তব চিন্তিত হলেন। এ লক্ষণ একবারেই সুবিধার নয়!
রেস্তোরাঁ থেকে বেরোতেই তার ফোন বেজে উঠল। সুনয়না দাভে আটক হয়েছেন। তাকে তাদের স্পেশাল ব্রাঞ্চে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

৬৪

আগের বদ্ধ ঘরটাতে ঢুকে বীরেনের এবারে আর অতো কষ্ট হল না। বরং মনে হল এটা চেনা জায়গা। সায়ককে সে কথা বলতে সায়ক হাসল, "এটাই হয়। আমারও একই জিনিস হত। সবটাই তো অভ্যাস, তাই না? মায়ের পেটের মত অপরিসর জায়গাতে সন্তান বড় হয়। অথচ তার সব থেকে বেশি নিশ্চিন্ত এবং নিরাপদ স্থান ওটাই। মৌলানাদের মত কীটেদের যেমন নিরাপদ স্থান জঙ্গীঘাঁটিগুলো। আমার তো ইচ্ছে করছে, ওই বাড়িটায় কয়েকটা গ্রেনেড ফেলে দিয়ে আসি। ইমান সেখ খুন হবার পর ইসলামাবাদের সব কমফোর্ট জোন পাল্টাতে হয়েছে আমায়। অদ্ভুত ধরণের হাত পা বাঁধা অবস্থায় থাকতে হয় আমাদের। কিছু করতে হবে না, শুধু যেন কোনভাবে ধরা পড় না"।
বীরেন বলল, "আমরা দুজন রাতের দিকে ওই বাড়িটায় আরেকবার যেতে পারি"?
সায়ক মাথা নাড়ল, "একবারে না। আমরা কিছু করতে পারি না। একটা কাজ ছাড়া। আগেও করেছি"।
বীরেন বলল, "কী কাজ?"
সায়ক চিন্তিত মুখে বলল, "সি আই একে জানানো যেতে পারে। মৌলানার ক্ষেত্রে ওরা কতটা অ্যাক্টিভ হবে, বুঝতে পারছি না। মৌলানা আমাদের দেশের ক্ষেত্রে বিরাট থ্রেট। আমেরিকার ক্ষেত্রে অতোটা না। আর যতক্ষণ না ওদের কোন ক্ষতি হচ্ছে, ওরা কিচ্ছু করে না"।
বীরেন বলল, "মৌলানা কিছুই করে নি আমেরিকার?"
সায়ক বলল, "টু বি স্পেসিফিক, আফগানিস্তানে গোলমাল তৈরির সময় এসব মৌলানাকে আমেরিকাই তৈরি করেছিল। তুমি সি আই একে ধোঁয়া তুলসীপাতা ভেবো না। আফগানিস্তানে একটা সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের সরাসরি মদত ছিল। সেখানে ঝামেলা তৈরি করতে আমেরিকা এদের মত অসংখ্য সন্ত্রাসবাদীদের ডিরেক্ট ফান্ডিং করতো। নাইন ইলেভেনের পর এরা বুঝতে পারে দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পোষার ফলাফল কী হতে পারে। আমেরিকা কেন, অনেকেই এসব কাল সাপ পুষে চলেছে। কখন যে এরা আদর করে ছোবল মেরে দিয়ে যাবে, সেটা যারা সাপগুলো পুষছে, তারা বুঝতে পারে না। পাকিস্তান যেমন। দিব্যি একটা দেশ ছিল। কাশ্মীরকে বড় করে দেখাতে গিয়ে এদের আর্থিক স্থিতিশীলতাই বিগড়ে গেছে। কতবার লোডশেডিং হয় দেখেছো? কিসসু নেই দেশটার। অথচ এদের একটাই কাজ। অন্ধভাবে ভারতের ক্ষতি করে যেতে হবে। আজব ব্যাপার"।
বাইরে থেকে একটা হই হই শব্দ ভেসে এল। সায়ক বলল, "ঘরে থাকো। আমি দেখে আসছি"।
বীরেন বলল, "ভয়ের কিছু আছে?"
সায়ক বলল, "জানি না। দেখছি"।

সায়ক দরজা খুলে বেরোল। মিনিট খানেকের মধ্যে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে বলল, “বাজারে সেনা ঢুকেছে। তোলা তুলছে”।
বীরেন বলল, “সেনাই তো এখন রক্ষক। ওরা এসব করছে কেন”?
সায়ক বলল, “এখন মাৎস্যন্যায় চলবে এ দেশে। ভোট অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে গেছে। যে যেভাবে পারবে তাণ্ডব চালাবে। তা বলে ওদের ইন্টেলিজেন্স একবারে এলোমেলো হয়ে যাবে না। আমি একটা দিনই চান্স নিয়েছি। আর রিস্ক নেওয়া যাবে না। তবে মৌলানা বড় খোঁচাচ্ছে হে বীরেন। ব্যাটা অকারণে দেশ ছাড়ে না। আর একটা ব্যাপার, রজ্জাক কি কিছু জানবে?”
বীরেন বলল, “রজ্জাক ফিরে এসেছে? ও তো মৌলানার সঙ্গে চলে গেলো?”
সায়ক বলল, “আমার যদি খুব একটা ভুল না হয়, তবে রজ্জাক এতক্ষণে ওর দোকানে ফিরেও এসেছে। রজ্জাক তো একটা মাধ্যম ছিল। রজ্জাককে আটকে রাখবে না। এতক্ষণে দোকানেও বসে গেছে”।
সায়ক ফোন বের করে উসমানকে ফোন করল। উসমান ফোন ধরতে সায়ক বলল, “প্রোজেক্ট রিপোর্ট কি জমা পড়ে গেছে জনাব?”
উসমান বলল, “মেইল চেক করি নি। দেখে জানাবো”।
সায়ক বলল, “জলদি করলে ভাল হয় জনাব। আমার অনেকগুলো কাজ বাকি”।
উসমান বলল, “ফোনটা কিছুক্ষণ হোল্ড করুন জনাব”।
সায়ক বলল, “জি জনাব”।
মিনিট খানেক পরে উসমান বলল, “প্রোজেক্ট রিপোর্ট জমা পড়ে গেছে জনাব”।
সায়ক ফোন রেখে বীরেনকে বলল, “যা ভেবেছিলাম। রজ্জাক ফিরে এসেছে। এবার”?
বীরেন অবাক হয়ে সায়কের দিকে তাকিয়ে বলল, “এবার কী?”
সায়ক বলল, “তৈরি হও। আজ রাতে অপারেশন রজ্জাক। কিছু করার নেই। এটুকু ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে”।
বীরেন বলল, “তুষার স্যারের পারমিশন?”
সায়ক বলল, “বললে দেবেন ভেবেছো? আমি একটু ভেবে নিই। ততক্ষণে তুমি চোখ বুজে নাও”।
বীরেন কিছুই না বুঝে মাথা নাড়ল, “আচ্ছা’।

৬৫

সুমাইমার জ্ঞান ফিরেছে। তারেককে নিয়ে আশরফ কেবিনে প্রবেশ করলেন। সুমাইমা আশরফকে দেখে হাসল। আশরফ অবাক হয়ে বললেন, “তুমি এখনও হাসছো?”
সুমাইমা বলল, “আপনাদের কেমন বোকা বানিয়েছিলাম, ভাবতেই হাসি পেয়ে গেলো”।
আশরফ বসলেন। বললেন, “আমাদের বোকা বানালে ঠিক আছে। আতরকেও বোকা বানালে কেন? আর রফিককে?”
সুমাইমার চোখ জ্বলে উঠল, “রফিক আমার টার্গেট ছিল স্যার। অন্যেরা কেন মারবে? রফিককে আমিই মারতাম। আমাকে মারতেই হত। আমার দিদা আর মাকে যার জন্য সারাজীবন নরক যন্ত্রণায় কাটাতে হল, আমার জীবনটাই যার জন্য শেষ হয়ে গেল, তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়? আপনিই বলুন”।
তারেক বললেন, “দিদা?”
সুমাইমা বলল, “পাকিস্তানী বাহিনী আমার দিদাকে তুলে নিয়ে গেছিল। দিদাকে ওরা মারে নি। আধমরা করে ফেলে রেখে গেছিল। কুমারী অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল। বাচ্চা ফেলতে পারে নি। কোন মতে এক অনাথ আশ্রমে জায়গা পেয়েছিল। আমার মা আশ্রমেই বড় হয়ে ওঠে। মাকে বিয়ে করেন অনাথ আশ্রমের এক

শিক্ষক। পরে যখন উনি জানতে পারেন আমার মা ধর্ষণের ফলে সৃষ্ট সন্তান, মাকে উনি ত্যাগ করলেন। আমার পাঁচ বছর বয়সে আমার মা পাগল হয়ে গেল"।
আশরফ তারেকের দিকে তাকালেন। তারেক বললেন, "অবাক হবার কিছু নেই খান। এ দেশের অলিতে গলিতে পাকিস্তানিদের এমন অত্যাচারের কাহিনি পাবে"।
আশরফ সুমাইমার দিকে তাকালেন, "তারপর তুমি আতরের গ্রুপের খোঁজ পেলে। রফিকের কাছে পৌঁছতে শুভকে ব্যবহার করলে। আনবিলিভেবল। দুটো ঘুঘু দেশের ইন্টেলিজেন্সকে তুমি একা বোকা বানিয়েছো রুকসার"।
সুমাইমা হাসতে হাসতে বলল, "আমিও আমার মায়ের মত এবার পাগল হয়ে যাবো স্যার। আমার কাজ তো হয়ে গেছে। যে জন্য আমি এই পৃথিবীতে এসেছিলাম, যার জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করেছি সেই রফিককে আমি নিজের হাতে মেরেছি। ওর আর্তনাদ শুনে পাশের ঘর থেকে তবসসুম ছুটে এসেছিল, আমি ওকেও ছাড়ি নি। ঠিক করি নি বলুন?"
সুমাইমা অদ্ভুত চোখে তাকাল।
আশরফ বললেন, "আর যে দুজন তোমাকে অত্যাচার করল, ওদের কোন ডিটেইল দিতে পারবে?"
সুমাইমা বলল, "দিতে পারি। একটা শর্তে"।
আশরফ বললেন, "কী শর্তে?"
সুমাইমা বলল, "আমি ওদের নিজের হাতে মারব"।
আশরফ বললেন, "তুমি জানো তুমি কী বলছো?"
সুমাইমা বলল, "জানি। আপনি আমায় কথা দিন স্যার"।
আশরফ বলল, "আমি কী করে এরকম কথা দেবো রুকসার? এটা ইন্ডিয়া না। এখানে আমি কেউ না"।
সুমাইমা বলল, "আতর কিন্তু একটা এজেন্ট শুধু। ও আরেকজনের সঙ্গে ফোনে কথা বলে। তার কথা শুনেই আতর সব কাজ করে"।
আশরফ বললেন, "কে সে? দেখেছো?"
সুমাইমা বলল, "না। দেখি নি। তবে ওর নাম সেভ করা আছে 'বস' বলে। বাংলায় কথা বলে"।
আশরফ তারেকের দিকে তাকালেন। তারেক মাথা নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আশরফ বললেন, "ওদের দুজনের ডিটেলস দাও সুমাইমা। আমি চেষ্টা করে দেখব তোমার দাবি মেটাবার"।
সুমাইমা হাসল, "চেষ্টা? ঠিক আছে। তাই করবেন না হয়। এ দেশের লোকজনের স্মৃতি বড় কম স্যার। ভীষণ কম। এদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ ভুলেই গেছে পাকিস্তান এদের সঙ্গে ঠিক কী কী করেছে। এরপরেও এরা এদের হয়ে কাজ করে। এই লজ্জা রাখবার জায়গা কোথায়? ওদের দুজনের নাম বিলাল আর ইউসুফ। ঢাকাতেই থাকবে। গাজীপুরে"।
আশরফ বললেন, "ঠিকানা বল"।
সুমাইমা ঠিকানা বলল।
আশরফ কেবিন থেকে বেরিয়ে তুষারকে ফোন করে সবটা বললেন। তুষার বললেন, "এখনও এই মেয়েটাকে বিশ্বাস করা যায় কি?"
আশরফ বললেন, "মিথ্যে বলবে না স্যার। অন্তত এই অবস্থায়। আমিন সাহেব..."
তুষার বললেন, "আমাকে অ্যাড্রেসটা পাঠাও। আমি দেখছি"।
তুষার ফোন কাটলেন। আশরফ তুষারকে ঠিকানা পাঠালেন। কিছুক্ষণ পর তুষার ফোন করলেন। আশরফ ধরলেন, "হ্যাঁ স্যার"।
তুষার বললেন, "এই ঠিকানাটা ঢাকার একজন প্রভাবশালী লোকের আশরফ। এক্স মিনিস্টার জাহির! কনফার্ম না হয়ে কিছু করা সম্ভব না। আমাদের এই অপারেশনে জড়িয়ে পড়াটাও সম্ভব না"।

আশরফ বললেন, "আমাদের এই রিস্কটা নিতেই হবে স্যার। এই দুজনকে দরকার। যে কোন মূল্যে। কিছুতেই ছাড়তে পারব না"।
তুষার চুপ করে গেলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "উপরমহলে জানাতে হবে। আমি দেখছি কী করা যায়"।

৬৬

বলরামকে রশিদদের ঘরে নিয়ে এসে একটা বল দেওয়া হয়েছে। এক গাদা চকলেট আর খেলনা দেওয়া হয়েছে। বলরাম ঘরের মধ্যে একা একা খেলছে।
বাশার বিধ্বস্ত অবস্থায় বসে আছে। অনেক চেষ্টা করেও বাশার স্বাভাবিক হতে পারছে না। রশিদ বলল, "সব ট্রেনিং ভুলে গেছিস তুই বাশার। কিচ্ছু মনে রাখিস নি। চাচাজান যদি জানে, তোর কপালে দুঃখ আছে"।
বাশার বলল, "ছেলেটাকে আমি নিয়ে এসেছিলাম। ওকে অন্য কাজে লাগানো যেতো"।
রশিদ বলল, "স্বয়ং উপরওয়ালার কাজ করছে। এর থেকে বড় কাজ আর কী হতে পারতো? আমরা কেন আছি? আমাদের কেন পাঠানো হয়েছে? তার জন্যই তো। আমরা বলরামের জন্য দুয়া করব। বিধর্মী হলেও ওকে জেনো জন্নতে পাঠানো হয়, তার জন্য উপরওয়ালার কাছে আর্জি জানাবো"।
বলরাম দৌড়তে দৌড়তে বাশারের কাছে এসে বলল, "কাল আমরা কোথায় ঘুরতে যাবো গুরুজী?"
রশিদ বলল, "অনেক জায়গায় যাবো বাচ্চা। আমরা কাল খুব ঘুরব, মজা করব। কাল দিওয়ালী হবে। আমরা বাজি ফাটাবো কাল"।
বলরাম আনন্দে লাফ ঝাঁপ দিতে লাগল। রশিদ বলল, "চকলেট খা ব্যাটা। এই শাহিদ, বলরামকে চকলেট খাওয়া"। শাহিদ একটা চকলেটের মোড়ক খুলে বলরামের দিকে চকলেট বারটা এগিয়ে দিল। বলরাম মেঝেতে বসে পড়ে চকলেট খেতে লাগল। রশিদ বলল, "কাল আমরা চারজন বেরোব। আমি, রশিদ, বাশার আর বলরাম"।
বাশার চমকে উঠে বলল, "আমি কেন যাবো? আমাকে তো সবাই চিনে ফেলবে!"
রশিদ বলল, "তোকে কেউ চিনবে না। তোর সে ব্যবস্থা করেই তোকে নিয়ে যাবো। তুই না গেলে বলরামকে কে সামলাবে?"
বাশার বলল, "সেটা ওকে নেওয়ার সময় মনে রাখার দরকার ছিল"।
রশিদ বাশারের মাথায় আলতো চাপড় মেরে বলল, "তোকে এখানে কেন রাখা হয়েছে বাশার? আমাদের জন্য রাখা হয়েছে। আমাদের খিদমত খাটার জন্য রাখা হয়েছে। তুই এখানে থেকে আমরা যা যা বলব, তার প্রতিটা কথা শুনে চলবি। নইলে তোর কপালে অশেষ দুঃখ আছে"।
বাশার বলল, "তোমরা যেভাবে বলেছো, তার সব কথাই শুনেছি। ওকে সামলানোর সমস্যাটার কথা আগে জানলে এখন এই সব প্রশ্নই আসত না"। বাশারের ফোন বাজছিল।
বাশার দরজা খুলে দিল। এক আশ্রমিক একটা ব্যাগ দিয়ে গেল।
বাশার ব্যাগটা নিয়ে এসে টেবিলের উপর রাখল। রশিদ বাশারকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল, "সর সর। তুই এসব বুঝবি না। আমাকে দেখতে দে"।
রশিদ ব্যাগ খুলতেই তার মুখে হাসি ফুটল, "এই তো। জ্যাকেটের জুয়েলারি চলে এসেছে। বেটা বলরাম, এদিকে এসো বেটা"।
বলরাম চকলেট খেতে খেতে রশিদের কাছে এল।
রশিদ শুধু জ্যাকেটটা বলরামকে পরিয়ে দিয়ে বলল, "বাহ, দিওয়ালির গিফটটা ভাল হয়েছে না বেটা?"
বলরাম আনন্দ পেল। জ্যাকেটটা পরে ঘরের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল। রশিদ বাশারকে বলল, "দেখেছিস, তোরই শুধু দুঃখ হচ্ছে। বলরাম কত আনন্দ পেয়েছে দেখ"।

শাহিদ বলল, "ভাই আমার ইন্ডিয়ায় এসে সত্যি সত্যি সাধু বনে গেছে। এত মহিলা ভক্ত হয়ে গেছে, জীবনটাই তো পালটে গেছে ভাইয়ের"।
বাশার বলল, "আমি আর কী বলব? তোমরা আমাদের কথা শুনবে না। ঠিক আছে, তাই হোক, আমি আমাদের স্বার্থে বলরামকে কুরবানি দিতে প্রস্তুত। জায়গা ঠিক হয়েছে?"
রশিদ বলল, "চাচাজান বলে দিয়েছে যে কোন জায়গায় করা যায় রে বাশার। আমি চাইলে তোর আশ্রমেও করতে পারি"।
বাশার চমকে উঠল। রশিদ জোরে হেসে উঠে বলল, "আমি জানতাম তুই ঘাবড়ে যাবি। চিন্তা করিস না। মুম্বইয়ের লোক যেখানে বেশি ভিড় করে, আমরা সেখানেই দিওয়ালী করব কাল। যা তুই, তোর বলরামকে নিয়ে বেরো এখন। আমি আর শাহিদ বলরামের নতুন জ্যাকেটটা আরো ভাল করে ডিজাইন করে দি। এসো বেটা, জ্যাকেটটা দাও"।
বলরাম জ্যাকেটটা খুলতে রাজি হল না। রশিদ বলল, "কীরে বাশার, বল"।
বাশার একবার বলতেই বলরাম জ্যাকেট খুলে দিল। রশিদ বলল, "দেখলি এবার, কেন তোকে কাল নিয়ে যেতে চাইছি"?
বাশার রশিদের কথার উত্তর না দিয়ে বলরামকে কোলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
#
ইন্টারোগেশন রুমে সুনয়না দাভে চুপ করে বসে আছেন। শ্রীবাস্তব তার সামনে বসতেই সুনয়না বললেন, "আমাকে আমার ল ইয়ারের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হোক"।
শ্রীবাস্তব বললেন, "সব দেওয়া হবে ম্যাডাম। তার আগে বলুন, আপনি রেস্তোরাঁয় ব্যাগটা ফেলে গেছিলেন কেন?"
সুনয়না শান্ত চোখে শ্রীবাস্তবের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওহ, ব্যাগটা আমি রেস্তোরাঁয় হারিয়েছি? দেখেছেন? আমি ওটার জন্য থানায় যাচ্ছিলাম, মিসিং ডায়েরী করব বলে"।
শ্রীবাস্তব বললেন, "ম্যাম, সময় নষ্ট করবেন না। যেটা জানতে চাইছি, সত্যি সত্যি বলুন"।
সুনয়না বললেন, "কী সত্যি জানতে চাইছেন আমাকে খুলে বলুন"।
শ্রীবাস্তব চিন্তিত মুখে সুনয়নার দিকে তাকালেন। একে ভাঙা খুব কঠিন হবে।

৬৭

রাত এগারোটা। সায়ক বীরেনকে নিয়ে রজ্জাকের গাড়ির পার্কিং এর কাছে অপেক্ষা করছিল। বীরেন বলল, "রজ্জাক কি আদৌ কিছু বলবে?"
সায়ক মাথা নাড়ল, "কিচ্ছু জানি না। আসুক"।
এ জায়গাটা অন্ধকার। বাজারের পিছন দিক। নোংরাও। রজ্জাকের গাড়ি ছাড়া আর কারো গাড়ি নেই। রজ্জাকের দোকান বন্ধ করতে সময় লেগে যায়। স্বাভাবিকভাবেই আর কারো গাড়ি থাকে না। সায়ক অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল।
গলি পেরিয়ে রজ্জাককে আসতে দেখে গাড়ির আড়ালে চলে এল। বীরেন সায়কের পাশে বসে পড়ল।
হঠাৎ রজ্জাকের আর্তনাদ ভেসে এল। সায়ক "শিট! শিট", বলে দৌড়তে শুরু করল। বীরেন সায়কের পেছনে ছুটল। মাটিতে রজ্জাক পড়ে আছে। রজ্জাককে ছুরি মেরেছে কেউ। রক্তে মাটি ভেসে যাচ্ছে। সায়ক বিষণ্ণ মুখে মাটিতে বসে পড়ে বলল, "আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। খবরটা বেরিয়ে গেছে। মৌলানা সাক্ষী রাখবে না। তবে আমাদের মত এ পার্কিং এ অপেক্ষা করছিল না। দোকান থেকে পিছু নিয়েছিল। ফাঁকা জায়গা দেখে স্ট্যাব করে দিয়েছে"।

রজ্জাক কাতরাতে কাতরাতে বিস্ফারিত চোখে বীরেনের দিকে তাকিয়ে কোনমতে তার কোমরে রাখা গাড়ির চাবির দিকে ইশারা করে চোখ বুজল। বীরেন চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে গেল। জীবন তাকে আর কত এরকম ভয়াবহ দৃশ্যের সম্মুখীন করবে? সায়ক বীরেনের হাত ধরে টানল, "চল। লোক এসে যাবে। আর দেরী না। আমার মনে হচ্ছে গাড়িতে কিছু আছে। চল"।

ঘোরের মধ্যে বীরেন সায়কের সঙ্গে রজ্জাকের গাড়ির কাছে গেল। সায়ক গাড়ি আনলক করে বলল, "উঠে বস"।

বীরেন গাড়িতে উঠে বসতে সায়ক গাড়ি স্টার্ট দিল। বাজার পেরিয়ে হাইওয়েতে এসে গাড়ির ড্যাশ বোর্ড খুঁজতে শুরু করল। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজার পর বিরক্ত গলায় বলল, "কিসসু নেই। দেখি ডিকিতে"।

গাড়ি থেকে নেমে ডিকি খোলা হল। ডিকিতেও কিছু নেই। হতোদ্যম হয়ে সায়ক বলল, "একটা বিতিকিচ্ছিরি দুঃস্বপ্ন ছাড়া তাহলে আর কিছুই পেলাম না আমরা?"

বীরেন বলল, "কিছু পাওয়া গেল না?"

সায়ক বলল, "তুমিও একবার দেখো তো"।

বীরেন মোবাইলের টর্চ জ্বালিয়ে দেখতে শুরু করল। স্টেপনি ছাড়া ডিকিতে কিছু নেই। আরো কিছুক্ষণ দেখার পর সায়ক ড্রাইভিং সিটে বসে বলল, "চল। এ গাড়িতে কিছু নেই"। বীরেন হতোদ্যম হয়ে গাড়ির পিছনের সিটে বসল। সায়ক বলল, "আবার এ গাড়ি কোথাও একটা ছেড়ে রেখে যেতে হবে"।

বীরেনের চোখ পড়ল ড্রাইভারের সিটের পেছনে একটা ছোট পকেট আছে। সে তাড়াতাড়ি সেই পকেটে হাত ঢোকাতে তার হাতে একটা গিফট বক্স উঠে এল। সে উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল, "এটা কী?"

সায়ক গাড়ি দাঁড় করাল। বলল, "দেখি"।

বীরেন বক্সটা সায়কের হাতে দিল। সায়ক তড়িঘড়ি বক্সটা সিটের উপর উপুড় করল। বাক্স থেকে বেশ কয়েকটা একশো ডলার বিল বেরোল। এক জোড়া ভারতীয় ভোটার এবং আধার কার্ড। একটা কাগজে কাশ্মীর থেকে মুম্বই দয়া সাগর আশ্রমে যাবার রুট ম্যাপ আর আশ্রমের বেশ কয়েকটা টিকেট। সায়ক অবাক চোখে রুট ম্যাপটা দেখে বলল, "দয়াসাগর বাবার আশ্রমের রুট ম্যাপ ইসলামাবাদে? হোলি শিট! এই আশ্রমটা তো মুম্বইতে! মৌলানার সঙ্গে এই আশ্রম..."

সায়ক ফোন বের করল। উসমানকে ফোন করল। উসমান ঘুম ঘোরে ফোন ধরে বলল, "হ্যাঁ স্যার। অফিসের কাজে রাতে ফোন করছেন? আমার বউ রাগ করছে"।

সায়ক বলল, "এস ও এস। আই রিপিট, এস ও এস টু মেইন ব্রাঞ্চ। দয়া সাগর। যে ক'টা রিপোর্ট পেলাম, সবক'টায় মাছের গন্ধ লেগে আছে। এস ও এস। নাও"।

উসমান বলল, "কপি"।

ফোন কাটল সায়ক। বীরেন বলল, "আমি কিছু বুঝলাম না। মাছ মানে"?

সায়ক বলল, "ফিসি। উসমান তুষার স্যারকে জানাক। এই আশ্রমটার কথা ওরা কোন দিন বলে নি। এখানে রুট ম্যাপ দিয়েছে কেন? ভোটার আই কার্ড আর আধার কার্ড আছে। এর অর্থ ওদের লোকজন এই আশ্রমে যাচ্ছে? এটা কি একটা আশ্রয়ের জায়গা? কিছুই তো ঠিক লাগছে না হে বীরেন"। বীরেন বলল, "গাড়িটার ব্যবস্থা করতে হবে। পুলিশ পেলে ঝামেলা হবে"।

সায়ক চিন্তিত গলায় বলল, "রাইট। মনে করানোর জন্য থ্যাংকস। উফ, এই মুহূর্তে আমার দয়াসাগর আশ্রমে যাওয়ার দরকার ছিল"।

এলোমেলো ভাবতে ভাবতে গাড়ি স্টার্ট দিল সায়ক।

৬৮

রাত দেড়টা।

পীযূষ দয়াসাগর আশ্রমের ডিটেলস পাঠিয়েছিলেন। তুষার সেটাই দেখছিলেন। তার ফোন বেজে উঠল। প্রাইভেট নাম্বার দেখাচ্ছে। তুষার তড়িঘড়ি ফোন তুললেন, "ইয়েস"।

"স্যার। এস ও এস। সায়ক। আমাকে শুধু বলল আপনাকে জানাতে দয়াসাগর। মাছের গন্ধ লেগে আছে"।

তুষার বসে ছিলেন। উসমানের কথা শুনে চেয়ার থেকে উঠে বসলেন, "রিয়েলি? সায়ক এটা বলেছে"?

উসমান হাই তুলল, "হ্যাঁ স্যার। ঘুমোতেই দিল না"।

তুষার বললেন, "ঠিক আছে। টেক কেয়ার উসমান"।

ফোন কেটে গেল।

তুষার চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থেকে শ্রীবাস্তবকে ফোন করলেন। শ্রীবাস্তব ধরলেন, "হ্যাঁ স্যার"।

তুষার বললেন, "সুনয়না দাভে কিছু বলল?"

শ্রীবাস্তব হতাশ গলায় বললেন, "কিচ্ছু না স্যার। এমন মুখ করে বসে আছে, কিছুই জানে না। ব্যাগের কথা বলায় বলল ব্যাগটা ভুলে ফেলে গেছে। এখন সেটার জন্য ডায়েরি করতে যাচ্ছিল, আমরা নাকি আটক করেছি। একে মহিলা, তায় কলেজ ফ্যাকাল্টি। ঠিক কোন জায়গাটা দিয়ে এগোব বুঝতে পারছি না স্যার। আয়েষাকে বললাম একবার জেরা করতে। ওকেও কিছু বলল না"।

তুষার বললেন, "ওকে। আমি কাল সকালে আসছি। দয়াসাগর আশ্রমের সব গেটে নজরদারী শুরু করে দাও। সিসিটিভি নেটওয়ার্ক অ্যাক্টিভেট করে দাও। ড্রোণের ব্যবস্থা কর। যে গাড়ি ঢুকবে বেরোবে, সব ক'টাকে ফলো কর। আশ্রম থেকে গাড়ি বেরোলে একটা ডিসট্যান্স থেকে ফলো করবে। সন্দেহজনক কিছু হলেই আটক করো। টেক স্টেপ। যা হবে আমি বুঝে নেবো মুম্বই পুলিশের সঙ্গে। আমি না মুম্বই না যাওয়া অবধি এভাবে চল। যদি তার আগে কিছু হয়, তোমার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে স্টেপ নেওয়ার। না হলে আমি গিয়ে রেইডের ব্যবস্থা করছি"।

শ্রীবাস্তব বললেন, "ওকে স্যার"।

তুষার ফোন রাখলেন। পীযূষের ডকুমেন্ট বলছে, দয়াসাগর বাবার কোন ব্যাক গ্রাউন্ড নেই। এ দেশে কোন জায়গায় জন্ম, কেউ জানে না। অথচ এত বড় ধর্মগুরু হয়ে গেল। এ দেশে সব সম্ভব? কোন প্রমাণ ছাড়া দয়াসাগরের আশ্রম রেইড করতে গেলে ভয়াবহ কাণ্ড হতে পারে। আগুন জ্বলবে।

সাধু সবাই হতে পারে না। অপরাধীরা এই ছদ্মবেশ, আর মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে মারাত্মক সব অপরাধ করতে পারে। পরে যখন এদের কাজের কথা বাইরে আসে, তখন মানুষের চোখ থেকে ধর্মের মুখোশটা খুলে যায়। সমস্যা হল, ধর্মান্ধ মানুষ এতটাই বেশি এই উপমহাদেশে, এত কিছুর পরেও এই সব অসাধু লোকগুলোর সমর্থক থেকে যায়। আজমল কাসভের মত ছেলেদের ব্রেইন ওয়াশ করা কত সহজ হয়ে যায়।

স্টাডি টেবিলেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তুষার। ভোর পাঁচটায় ঘুম ভাঙল। তৈরি হয়ে ইরাবতীকে তুলে দিলেন, "আমি মুম্বই যাচ্ছি। টেক কেয়ার"।

ইরাবতী উঠে বসলেন, "আমাকে একবার বলবে না?"

তুষার বললেন, "আর্জেন্ট। এখনই বেরোতে হবে"।

ইরাবতী বললেন, "ফ্লাইটের ব্যবস্থা?"

তুষার বললেন, "হয়ে গেছে"।

ইরাবতী বললেন, "ঠিক আছে। সাবধানে যেও"।

তুষার হাসলেন। গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল।

গাড়িতে ওঠা মাত্র ফোন এল। আশরফ। বললেন, "বল"।

আশরফ বললেন, "স্যার, কথা হল? এরপর পাখি পালিয়ে যাবে তো"।

তুষার বললেন, "কথা হয়েছে। ঢাকা নজর রাখছে"।

আশরফ বললেন, "স্যার, আতরও কিন্তু স্বীকার করেছে, ওর বস ছিল ওই পলিটিকাল লিডার। মানে ভাবুন জাস্ট, এ দেশের একটা বিরোধী পলিটিকাল দলের নেতা, পাকিস্তানকে ডিরেক্ট হেল্প করছে, আর আমরা সব জেনেও কিছু করতে পারবো না"।
তুষার বললেন, "আমাদের কিছু করারও নেই। ঢাকা আমাদের দেশ নয় আশরফ। তুমি ভুলে যাচ্ছো। আমাদের নিজেদের বর্ডার ঠিক রাখতে হবে। আমি বি এস এফকে বলে দিয়েছি। বাংলাদেশ বর্ডারের সিকিউরিটি তিনগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ইনফিল্ট্রেশন আটকানো হবে"।
আশরফ বললেন, "তাহলে আমাদের এত পরিশ্রম জলে গেল স্যার?"
তুষার হাসলেন, "কিচ্ছু জলে যায় নি। আজকের নিউজপেপার দেখো। মাননীয় পাকিস্তান প্রেমী পলিটিকাল লিডার এক্সপোজ হয়ে গেছেন। ফ্রন্ট পেজে খবর বেরোবে"।
আশরফ উল্লাস করে উঠলেন, "ইউ আর গ্রেট স্যার"।
তুষার হাসলেন। বললেন, "ফেরো এবার। আতরকে নিয়ে এসো। আমি ঢাকাকে বলে রেখেছি। আতরের ক্লিয়ারেন্স ঢাকা দিয়ে দেবে। সোহানকে বল আতরকে দিল্লিতে ডিপোজিট করতে। তোমাকে আর মাথুরকে আমি মুম্বইতে দেখতে চাই। আজ বিকেলের মধ্যে। কপি দ্যাট?"
আশরফ বললেন, "কপি স্যার। আপনি যা বলবেন। মুম্বইতে কী হল আবার? আপনি কি মুম্বইতে?"
তুষার বললেন, "যাচ্ছি। সামথিং ইজ ভেরি ফিশি দেয়ার। ছেড়ে রাখা যাবে না"।
আশরফ বললেন, "ফিশি? কোন ব্যাপারটা স্যার?"
তুষার বললেন, "দয়াসাগর আশ্রম। এই বাবার কোন পাস্ট রেকর্ড খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আশরফ"।
আশরফ বললেন, "গোটা দেশে একটার পর একটা আশ্রম খুলছে এই দয়াসাগর বাবা। এত ভক্ত এরা পায় কোত্থেকে স্যার?"
তুষার ম্লান হাসলেন, "ধর্মান্ধতা থেকে পায়। যাকে ঈশ্বর রূপে পুজো করবে, তার কিছু না জেনে মানুষ অন্ধভাবে বিশ্বাস করছে। যতদিন না এ দেশের মানুষের এটুকু বোধ বুদ্ধি হবে, দেশের সিকিউরিটির থ্রেট ততদিন থাকবে। লিভ ইট, চলে এসো, মুম্বইতে দেখা হবে"।
আশরফ হাসলেন, "ওকে স্যার"।

৬৯

সকাল সাতটা।
বলরামকে নিয়ে বেরিয়েছে তিনজন। গাড়ি চালাচ্ছে বাশার। বাশারকে দেখে চেনার উপায় নেই যে সেই দয়াসাগর। তাকে একবারে অন্যরকম লাগছে।
বলরাম ঘুমোচ্ছে পেছনের সিটে। রশিদ বলল, "আজ দিনটা দারুণ। সকাল সকাল ইন্ডিয়ার বরবাদি দেখবে পাকিস্তান। এই বাশার। বলরামকে ঘুম থেকে তোল। জ্যাকেটটা পরিয়ে দে"। বাশার বলল, "আরেকটু ঘুমোক। দেরী আছে এখনও"।
শাহিদ বলল, "তা বলে লোকজনের মাঝখানে জ্যাকেট পরাবি নাকি? আমিই তুলে দিচ্ছি। পেছনে পুলিশ জিপ কেন?"
বাশার বলল, "টহল গাড়ি। ওরকম অনেক গাড়ি ঘুরে বেড়ায়। ভয়ের কিছু নেই"।
শাহিদ বলরামকে ঠেলল। বলরাম ঘুম থেকে উঠে কাঁদতে শুরু করল। বিরক্ত হয়ে বাশার বলল, "বললাম পরে তুলতে"।
বলরাম বলল, "আমি কোথায়?"
রশিদ বলল, "আরে বাচ্চা, আমরা পার্ক দেখতে যাচ্ছি। কত ঘুরবো সারাদিন"।
বাশার বলল, "আমি আছি তো"।

গুরুজীর গলা শুনে বলরাম খানিকটা শান্ত হল।
রশিদ বলল, "দেখেছিস কত ভালবাসে গুরুজীকে?"
শাহিদ বলল, "হ্যাঁ। গুরুজী নিজের হাতে কুরবানি দেবে আজ"।
দুজনে বাজেভাবে হেসে উঠল।
শাহিদ বলল, "পুলিশের গাড়ি এখনো আছে। কী করব?"
বাশার বলল, "বলছি তো। অসুবিধা নেই। এ শহরে সারাক্ষণ এরকম গাড়ি ঘুরে বেড়ায়"।
বলরামকে জানলার পাশে বসানো হয়েছে। বাশার লুকিং গ্লাসে বলরামকে দেখল। সে কিছুক্ষণ গাড়ি চালিয়ে রাস্তার বাঁ দিকে গাড়ি দাঁড় করাল। খানিকটা দূরত্বে পুলিশের জিপটাও দাঁড়িয়ে গেল।
রশিদ বলল, "কী হয়েছে?"
বাশার বলল, "পেট ব্যাথা করছে। বাথরুম যাবো"।
রশিদ বলল, "শোন বাশার। একদম চালাকি করবি না। এখানেই গুলি করে পুঁতে দেবো"।
বাশার গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। রশিদ সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নামল, "কী হল?"
বাশার বলল, "তোমরা যাও। আমি পারছি না"।
রশিদ রেগে গেল, "মানে? পারছিস না মানেটা কী? চাচাজানকে বলব তুই পারছিস না?"
বাশার বলল, "চাচাজান আমাকে এখানে সেট আপ করতে পাঠিয়েছিলেন। আমি করেছি। আমার যা যা করার কথা আমি সব করেছি। কিন্তু চাচাজান আমাকে এই কাজটা করতে বলেন নি। এটা তুমি আর শাহিদ আমার উপর হিংসে করে জোর করে করাতে চাইছো। আমি এটা পারবো না"। রশিদ বাশারের মুখ পেঁচিয়ে ঘুষি মারল। রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে গেল। বাশার ছুটে এসে রশিদকে প্রত্যাঘাত করল।
বাশার যে রশিদকে মারতে পারে, শাহিদ ভাবতে পারে নি। সে বলরামকে জোরে করে জ্যাকেটটা পরিয়ে গাড়ি থেকে নেমে বাশারকে মারতে শুরু করল। বাশার এবার ছাড়ল না। প্রাণপণে এলোপাথাড়ি হাত চালাতে শুরু করল।
গাড়ির ভেতরে বলরাম কাঁদতে শুরু করেছে। রশিদ আর শাহিদ কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাশারকে রাস্তায় শুইয়ে দিল। রশিদ বাশারের কলার চেপে ধরল, "রাস্তা থেকে তুলে তোকে চাচাজান এখানে পাঠিয়েছে, আর সেই তুই নিজেকে কী ভাবছিস এখন? উপরওয়ালা ভাবছিস? চল"।
বাশারকে শক্ত হাতে তুলে গাড়িতে নিতে যেতে বাশার রশিদের হাত ছাড়িয়ে দৌড়তে শুরু করল। হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের জিপটা থেকে জনা পাঁচেক পুলিশ নেমে বাশারের পথ জুড়ে দাঁড়াল। রশিদ চমকে সেদিকে তাকাল। তার কোমর থেকে রিভলভার বের করতে গেল, একটা গুলি এসে তার হাতে লাগল। রাস্তায় ছিটকে পড়ল সে। বাশার দু হাত তুলে দাঁড়াল। সে আত্মসমর্পণ করতে চায়। শাহিদ দৌড়ে গাড়িতে উঠতে গেল, তার পায়ে গুলি এসে লাগল।
গাড়ির ভেতর থেকে বলরাম তারস্বরে কাঁদছিল। বাশার পুলিশের দিকে তাকিয়ে বলল, "বাচ্চা। প্লিজ ওকে বাঁচান"।
রশিদ রাগী গলায় বলল, "গদ্দার!"
বাশার হঠাৎ করে পকেট থেকে ছুরি বের করে রশিদের গলায় চালিয়ে দিল। রশিদ রাস্তায় পড়ে গেল। পুলিশ বাশারের পায়ে গুলি করল। বাশার কাতরাতে কাতরাতে রাস্তায় পড়ে গেল।
শ্রীবাস্তব দৌড়ে গাড়ির ভেতর গিয়ে দেখলেন বলরামের গায়ে বোম ভর্তি জ্যাকেট। তিনি বাশারের কাছে ছুটে গিয়ে বললেন, "ডেটোনেটর কোথায়?"
বাশার শাহিদকে দেখালো। শাহিদ পকেটে হাত দিয়ে ডেটোনেটর বের করতে গেল। শ্রীবাস্তব রিভলভার তাক করলেন শাহিদের দিকে। শাহিদ বাশারকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে শুরু করল...
সোমবার সকালে মুম্বই আরো এক ভয়াবহ ব্লাস্টের হাত থেকে বাঁচল।

#
ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট সিদ্দিকির চেম্বারে চুপ করে বসে রয়েছে সামশের। সিদ্দিকি বললেন, "দিল্লি ফোন করেছিল"।
সামশের থমথমে মুখে সিদ্দিকির দিকে তাকিয়ে বলল, "সরি জনাব"।
সিদ্দিকি বললেন, "ইস্তফাপত্রটা সেক্রেটারির কাছে দিয়ে যাবেন। আপনাকে স্যাক করা উচিত ছিল। একটা কারণে করলাম না। যাই হোক, প্রেসিডেন্ট নিয়াজি অ্যাসাসিনেশন কেসে আপনার নাম উঠে আসায় আপনাকে আটক করা হতে পারে। ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া প্রায় সবই জেনে গেছে অফিসার। আমার কিছু করার নেই। আমেরিকান প্রেশার আফটার অল"।
সামশের বলল, "আমি সহযোগিতা করব"।
সিদ্দিকি বললেন, "ইউ মে গো নাও"।
সামশের মাথা নিচু করে সিদ্দিকির চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেল।
একটা শব্দ তার কানে যেতে একবার থমকে দাঁড়িয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল।
শব্দটা হল, "স্কাউন্ড্রেল"।

৭০
সুনয়না দাভে ইন্টারোগেশন চেম্বারে বসে ছিলেন। তুষার তার সামনে বসে বললেন, "কেমন আছেন?"
সুনয়না বললেন, "আমাকে এভাবে আটকে রেখে দেওয়ার কারণটা জানতে পারি?"
তুষার হালকা গলায় বললেন, "রশিদকে বাশারই মেরে দিয়েছে। শাহিদ ধরা পড়েছে"।
সুনয়না অবাক হবার ভান করে বললেন, "মানে? এরা কারা?"
তুষার বললেন, "আপনি এদের চিনতে পারছেন না দেখে খুব ভাল লাগছে। আপনি অবশ্য বেশ ভাল চেষ্টা করেছেন। অনেক ভাল ভাল আসামীর থেকে আপনার রেজিস্টেন্স লেভেল ভাল মিসেস দাভে। ইউ আর গুড। ভেরি গুড। আপনি যাদের চিনতে পারছেন না, তারা হল আপনার ব্যাগের প্রাপকরা"।
সুনয়না বললেন, "আমাকে আমার উকিলের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হোক। এভাবে আটক করা অনৈতিক"।
তুষার বললেন, "কোথাকার উকিল? এদেশের না পাকিস্তানের? ইসলামাবাদে আপনার জন্য উকিলের ব্যবস্থা করতে বলে দেবো?"
সুনয়না রাগী গলায় বললেন, "হোয়াট ননসেন্স! আমাকে এভাবে আটকে রেখে আজেবাজে কথা বলছেন কেন? আপনি আমার মত একজন সম্মাননীয় নাগরিককে এভাবে আটকে রেখে দিতে পারেন না। একবার আমাকে বাইরে বেরোতে দিন, বাকিটা আমি বুঝে নেবো।"
তুষার সুনয়নার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বললেন, "একটা লোকের গল্প শুনবেন ম্যাডাম? লোকটার নাম অচিন্ত্য রানে। টাকার বিনিময়ে লোকটা উপকূলে ভিন দেশের নৌকোগুলোর আসার খবর চাপা দিয়ে দিয়েছিল। কত টাকা পেয়েছিল জানা নেই, তবে দেশের ইতিহাসে এই লেভেলের বিশ্বাসঘাতক খুব কম এসেছিল। লোকটাকে ধরার আগেই তার স্ত্রীকে নিয়ে লোকটা বেপাত্তা হয়ে গেছিল। আমাদের ইন্টেলিজেন্সের থেকে অবশ্য পালিয়ে যাওয়া এত সহজ হয় নি। তার স্ত্রীর ফোনে যখন ইসলামাবাদ থেকে মেসেজ আসে, তা দুর্ভাগ্যবশত আমাদের র‍্যাডারে ধরা পড়ে যায়। দেখুন তো ম্যাডাম, এই মেসেজটা চিনতে পারছেন কিনা। কী যেন ভাষাটা... গরমে বিয়ার খাবার না কী যেন... ফোন থেকে ডিলিট করে দিলেও আমাদের আইটির ছেলেদের ওই মেসেজটা বের করতে খুব বেশি হলে দশ মিনিট লাগবে। একবার চেষ্টা করবো নাকি?"

সুনয়না দাভে তুষারের দিকে রাগী চোখে তাকিয়ে বললেন, "একটা রশিদ বা শাহিদ ধরে আনন্দ করছিস তোরা? লাভ নেই। তোদের সব ক'টাকে শেষ করবে ওরা"।

তুষার শিস দিয়ে উঠলেন, "দ্যাটস ইট। বাকিটাও বলে ফেলুন"।

সুনয়না দাভে বললেন, "আমি কিচ্ছু বলব না। আমি কিছু জানি না"।

তুষার বললেন, "ওই যে লোকটা, অচিন্ত্য রানে... ধরা পড়েছে। উলটো করে বেঁধে রেখে স্পেশাল ট্রিটমেন্ট চলছে। আপনি চাইলে আপনাকে ওর সেলে নিয়ে যেতে পারি। দেখতে চান হাজব্যান্ডকে?"

সুনয়না আর্তনাদ করে উঠে বললেন, "আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। উনি অনেক দিন আগে সুইসাইড করেছেন"।

তুষার হাসলেন, "স্বামীর ভুল কাজটাকে বয়ে চলেছেন ম্যাডাম? কোন দরকার ছিল? আপনি নিজেও জানেন আপনার স্বামী ভুল কাজ করেছিল দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। আপনি চেষ্টা করুন, আপনি পারবেন। ভুল পথে থেকে কারো কোন লাভ হচ্ছে না"।

সুনয়না ভেঙে পড়লেন। কাঁদতে শুরু করলেন।

তুষার কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে ইন্টারোগেশন রুম থেকে বেরিয়ে শ্রীবাস্তবকে বললেন, "দিনরাত বসিয়ে রেখে জেরা করে যাও। বলবে মনে হচ্ছে। প্রয়োজনে রাজসাক্ষী হবার লোভ দেখাও। বাশার কেমন আছে?"

শ্রীবাস্তব বললেন, "বেটার"।

তুষার বললেন, "সবক'টা আশ্রম সিজ করার কাজ কত দূর হল?"

শ্রীবাস্তব বললেন, "আজকের মধ্যে হয়ে যাবে। বাশারকে দিয়ে ইউপির ইন্সপেক্টর খুনের কনফেশনটাও করিয়ে নেওয়া হয়েছে। মিডিয়াতে দয়াসাগরবাবার সম্পর্কে ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে"। তুষার বললেন, "বলরামের মায়ের হাতে ছেলেটাকে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা কর। এটা দরকারি। ঠিক আছে। আমি আরেকবার ইন্টারোগেশন রুমে যাবো"।

শ্রীবাস্তব বললেন, "শিওর স্যার"।

তুষার ইন্টারোগেশন রুমে প্রবেশ করেন। পকেট থেকে ফোন বের করে একটা নাম্বার ডায়েল করলেন। ও প্রান্ত থেকে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে ফোন ধরল সামশের, "হ্যালো"।

তুষার ফোন স্পিকারে রেখে বললেন, "কেমন আছেন আপনি? চিনতে পারছেন? আপনার খবরটা এই মাত্র পেলাম মিস্টার আলি, খুব খারাপ লাগল। আমি নিশ্চিত, আপনার থেকে যোগ্য অফিসার পাকিস্তান কোনদিন পায় নি।"

সামশের বলল, "কে বলছেন?"

তুষার বললেন, "তুষার রঙ্গনাথন। ভিয়েনায় দেখা হয়েছিল। একসঙ্গে কফি খেয়েছিলাম। আপনি তো বলেছিলেন যে কোন সময় ফোন করতে পারি। এখন দেখছি ভুলেই গেছেন"।

সামশের কৃত্রিমভাবে হাসল, "ওহ, হ্যাঁ হ্যাঁ। অনেক দিন আগের কথা। কেমন আছেন আপনি"?

তুষার বললেন, "ভালোই আছি। শুনুন না, সুনয়না দাভে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। বলবেন?"

সামশের আকাশ থেকে পড়ল, "কে ইনি?"

তুষার বললেন, "তেমন কেউ না। তবে ওর বিয়ারটা নষ্ট হয়ে গেছে বুঝলেন?"

সামশের বলল, "কী বলছেন আপনি? আমি কিছু বুঝতে পারছি না জনাব"।

তুষার সশব্দে হেসে উঠে ফোন কেটে দিলেন।

সুনয়না কান্না বন্ধ করে তুষারের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তুষার বললেন, "টিচারদের আমাদের দেশে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয় ম্যাডাম। আপনি এ দেশের ছাত্রদের শিক্ষা দেন। যে ছাত্রদের পড়ান, তাদের প্রতি

বিন্দুমাত্র সহানুভূতি আসে নি কোন দিন? আজ যদি ব্লাস্টটা হত, আপনার কোন ছাত্র মারা যেত, আপনি খুশি হতেন? ব্যক্তিগত স্কোর সেটল করার জন্য মানুষ হয়ে মানুষকে এভাবে মেরে ফেলা উচিত?"

সুনয়না মাথা নিচু করে বসে রইলেন।

তুষারের ফোন বাজছিল। তুষার দেখলেন আশরফ ফোন করছেন। ধরলেন, "হ্যাঁ, বল"।

আশরফ বললেন, "এসে গেছি স্যার। বাইরে অপেক্ষা করছি"।

তুষার দেখলেন কাঁচের ও প্রান্তে আশরফ আর মাথুর অপেক্ষা করছেন। অনেকদিন পর পরিচিত মুখ দুটো দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তুষার...

#

ইসলামাবাদ।

সেক্টর ওয়ানের পার্কে একজন ভিখারি চুপ করে বসে আছে। একটা বাড়ির সামনে একটা বড় গাড়ি এসে দাঁড়াল। বাড়িটা থেকে চারজন লোক গাড়িতে উঠল। তাদের হাতে দুটো ব্যাগ।

একজন পাঠান ভিখারির বাটিতে কিছু রূপী দিয়ে বলল, "আস্তানায় ফিরে যাও। রাতেই মুজফফরাবাদ রওনা হতে হবে। এ বরযাত্রী সেদিকেই যাচ্ছে"।

ভিখারি মাথা নাড়ল, "ঠিক আছে"।

পাঠানবেশী সায়ক বেঞ্চে বসল। হাতে রাখা কাগজটা খুলল। কাগজে বড় বড় করে হেডলাইন হয়েছে, "আই এস আই চিফ সামশের আলি প্রেসিডেন্ট নিয়াজির খুনে যুক্ত? আমেরিকান মিডিয়ার নিউজে উত্তাল বিশ্ব"।

ভিখারি সেজে থাকা বীরেন হাঁটতে হাঁটতে পার্কের বাথরুমের দিকে রওনা দিল।

এবার সাজ পাল্টে রাওয়ালপিণ্ডি যেতে হবে তাকে।

তাদের কাজ শেষ হয় না। তাদের কাজের শুধু শুরু হয়...

#

অনেক দিন পরে কলেজ গেল মিনি।

নিয়মিত একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যেতে হয় তাকে। কাউন্সেলিং হয়। নার্ভের ওষুধ খেতে হয়। বাড়িতে মাঝে মাঝে জ্যেঠুর ঘরে গিয়ে বসে সে।

চুপ করে বসে থাকে। জ্যেঠুর কথা মনে পড়লে চোখে জল চলে আসে।

একটা লোক শুধু একটা ভুল আদর্শের জন্য তার এত বড় ক্ষতি করে দিতে পারল?

এতটাই ঠুনকো হয় রক্তের সম্পর্ক?

কলেজে মেহজাবিন তার পাশে বসে ছিল। দুটো ক্লাস করার পর মেহজাবিন বলল, "মাঠে গিয়ে বসবি? তোর সঙ্গে কত কথা বলার আছে"!

মিনি বলল, "চল"।

তারও ক্লাস করতে ভাল লাগছিল না।

মাঠে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের ছেলে মেয়েরাই গল্প করে। তারা একটা কোণ দেখে বসল। মেহজাবিন বলল, "তোকে কোন প্রশ্ন করতেও ভয় লাগে। আমার মাথাতেও ইনজুরি করেছিল ওরা। বাবা খুব ভয় পেয়ে গেছিল"।

মিনি বলল, "তারপরে?"

মেহজাবিন বলল, "তারপরে বেশ কয়েকদিন বাবাই আমাকে কলেজে নিয়ে আসতো। একটুর জন্য বড় কোন ইনজুরি হয় নি। তুই ঠিক আছিস তো?"

মিনির কান্না চলে আসছিল। অনেক কষ্টে সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "হ্যাঁ রে, ঠিক আছি"।

মেহজাবিন চারদিকে তাকিয়ে বলল, "সব জায়গায় সব কথা বলা যায় না। আবার কিছু কিছু কথা আছে, যেগুলো না বলাই হয়ত ভাল। আমরা যত কম জানি, তত ভাল"।
মিনি বুঝতে পারল না। বলল, "মানে?"
মেহজাবিন হাসল, "থাক। তোকে নজর রাখার জন্য কেউ আছে তো? ওরা কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার লোক না। এখনও হয়ত টার্গেট করে রেখেছে"।
মিনি বলল, "কী আর করা যাবে বল? আমাদের ভবিষ্যৎ তো আর আমরা ঠিক করতে পারব না"।
মেহজাবিন বলল, "সেদিনের পর থেকে আমারও আর কোন কিছু ঠিক লাগছে না। কতবার তোর বাড়িতে খোঁজ নেব ভেবেছি, নিতে পারি নি। তারপর যখন সব জানলাম..."
মেহজাবিন চুপ করে গেল।
মিনি বলল, "হয়েছে। ঠিক আছে। যা হয়েছে তার জন্য আর সব সময় ভয়ে সিঁটিয়ে থাকব না। তুইও থাকিস না। ওরা তো এটাই চায়, আমরা যেন ভয়ে সিঁটিয়ে থাকি। তাই না?"
মেহজাবিন বলল, "ওরা খুব ভয়ংকর রে। খুব"।
মিনি বলল, "তা আর আমার থেকে ভাল কে জানবে বল? ওদের লক্ষ্য পূরণের জন্য ওরা যে কোন সীমা পার করতে পারে। এটা ওদের কাছে কোন ব্যাপারই না। মাথা নিচু করে তাকানোর দিন শেষ হয়েছে। এবার এগোতে হবে"।
মেহজাবিন বলল, "তোর ফুচকা প্রিয় ছিল। এখন খেতে ইচ্ছা করে না?"
মিনি বলল, "বাবা এনে দেয়। আগের মত আর যাওয়া হয় না। তবে এখন আবার যাব। ভয়ে ঘরে বসে থাকার কোন মানে হয় না, এটা আমি বুঝেছি"।
দুজনে মিলে আরো কিছুক্ষণ কথা বলার পর মিনি বলল, "চল একটা সিনেমা দেখে আসি। কতদিন দেখা হয় না"।
মেহজাবিন ইতস্তত করে বলল, "যাবি?"
মিনি বলল, "চল"।
দুজনে কলেজ থেকে বেরোল। বাসে উঠল।
বাসে বসার জায়গা পাওয়া গেল। সিনেমাহলের স্টপ এলে দুজনে বাস থেকে নামল। মিনি ব্যাগ থেকে টাকা বের করে বলল, "আমি টিকিট কাটছি"।
মেহজাবিন হাসল, "ঠিক আছে। পরের দিন আমি কেটে দেব"।
মিনি বলল, "বেশ"।
তারা এগোচ্ছিল, এমন সময় চারটে ছেলে প্রায় তাদের গায়ে এসে পড়ল। গায়ে পড়েই পরক্ষণে "সরি, সরি, কিছু মনে করবেন না", বলে বাজে ভাবে হাসল।
মিনি কয়েক সেকেন্ড দেখল। চারটে ছেলে।
মিনিট দুয়েক লাগল, চারটে ছেলেই মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ওড়নাটা ঠিক করতে করতে মিনি বলল, "চল, টিকিট কাটা যাক"।
মেহজাবিন হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "এটা কী করে করলি?"
মিনি হাসল, "সেলফ ডিফেন্সের ক্লাস করছি দু মাস হল। এখন আর অত সহজে ওরা তুলে নিয়ে যেতে পারবে না। বললাম তো তোকে, মাথা নিচু করে তাকানোর দিন শেষ হয়েছে। এবার এগোতে হবে। এই তুই তোর এত বড় হাঁ-টা বন্ধ কর প্লিজ। কী ভয়ঙ্কর লাগছে"।
মেহজাবিনের মুখের হাঁ তবু বন্ধ হল না। মিনি হাসতে হাসতে টিকেট কাউন্টারের দিকে এগোল...